রামমোহন রায় ও মূর্ত্তিপূজা

শ্রীঅমরচন্দ্র ভ

('মুক্তির পথ', 'মুসলমান ভক্তবৃন্দের ভগবানে নির্ভর'
ও 'মহাত্মা যিশুর পুণ্যকাহিনী' প্রণেতা)

প্রথম সংস্করণ

পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজ, ঢাকা
২২শে আগষ্ট, ১৯৩৭
৬ই ভাদ্র, ১৩৪৪

মূল্য আট আনা

প্রকাশক—
শ্রীঅমরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য,
পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজ, ঢাকা।

প্রিণ্টার—
শ্রীহেমচন্দ্র সরকার,
হরিনাথ প্রেস, ঢাকা।

নিবেদন

ইংরাজী ১৯৩৩-৩৪ সালে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের শতবার্ষিক স্মৃতি-তর্পণ ভারতবর্ষের নানা স্থানে বিবিধ প্রণালীতে সম্পন্ন হয়। ঐ সময়ে কৃতজ্ঞতা ও ভক্তি দ্বারা প্রণোদিত হইয়া আমি উক্ত মহাত্মার ইংরাজী ও বাঙ্গালা গ্রন্থাবলী হইতে তাঁহার সাকার ও নিরাকার উপাসনা-বিষয়ক উক্তিসমূহ সংগ্রহ করি, এবং সে সকল অবলম্বনে 'রামমোহন রায় ও মূর্ত্তিপূজা' বিষয়ে ঢাকাস্থ 'পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজ'-মন্দিরে দুইটি বক্তৃতা করি। ঐ দুই বক্তৃতা সংশোধিত ও কিঞ্চিৎ পরিবর্দ্ধিত করিয়া এক্ষণে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা হইল।

সাকার ও নিরাকার উপাসনা বিষয়ে রামমোহন রায়ের প্রায় সমুদয় উক্তিই বর্ত্তমান গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে। এই আলোচনায় (একটি স্থল ব্যতীত) ইংরাজী উক্তিসকলের মূল উদ্ধৃত করা হয় নাই; কেবল মর্ম্মানুবাদ দেওয়া হইয়াছে। বাঙ্গালা উক্তিসমূহের মধ্যেও সকলগুলির মূল দেওয়া হয় নাই। শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে লিখিত বাঙ্গালা বর্ত্তমান যুগে সুখপাঠ্য হইবে না, এই বিবেচনায়, যে সকল উক্তি অপেক্ষাকৃত প্রাঞ্জল এবং যেগুলি অন্য কারণে পাঠকগণের হৃদয়গ্রাহী হইবার সম্ভাবনা, কেবল সেইগুলি উদ্ধৃত করিয়া, অবশিষ্ট উক্তিগুলির মর্ম্ম আধুনিক বাঙ্গালায় দেওয়া হইয়াছে। রামমোহন রায়ের নিজ বাক্যসকল ও শাস্ত্রীয় বচনসমূহ বড় অক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছে। আলোচিত প্রত্যেক উক্তির সঙ্গে (এলাহাবাদ পাণিনি কার্য্যালয় হইতে যথাক্রমে ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে ও ১৩১২ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত) রামমোহন রায়ের ইংরাজী ও বাঙ্গালা গ্রন্থাবলীর পত্র-সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে, যাহাতে অনুসন্ধিৎসু পাঠক তাহার পূর্ব্বাপর সম্বন্ধ স্বয়ং দেখিতে পারেন। ইংরাজী গ্রন্থাবলীকে

'W' ও বাঙ্গালা গ্রন্থাবলীকে 'গ্র' এই সাঙ্কেতিক চিহ্ন দ্বারা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

গ্রন্থখানিতে ব্রহ্মোপাসনাই যে সত্য উপাসনা এবং উহাই যে মানবের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের পক্ষে অশেষ কল্যাণের হেতু, তাহা যথাসাধ্য প্রদর্শিত হইয়াছে; সুতরাং ব্রহ্মোপাসনার নিয়ম-প্রণালী কি, এবং বর্ত্তমান যুগের ব্রহ্মোপাসকদের ধর্ম্মবিষয়ক মতবিশ্বাসই বা কিরূপ, তাহা জানিতে কোনো কোনো পাঠকের কৌতূহল হইতে পারে। এই কৌতূহল চরিতার্থ করিবার উদ্দেশ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় পরিশিষ্টরূপে ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্যসকল এবং ব্রহ্মোপাসনা সম্বন্ধীয় কতকগুলি প্রাথমিক জ্ঞাতব্য বিষয় সন্নিবেশিত হইল। দ্বিতীয় পরিশিষ্টে আরাধনা ও প্রার্থনার এক একটি দৃষ্টান্ত এবং একটি প্রার্থনা-সঙ্গীত ও একটি সংস্কৃত ব্রহ্মস্তোত্রও দেওয়া হইল। আশা করি, এ সকল হইতে নূতন উপাসক উপাসনা বিষয়ে কিছু সহায়তা পাইতে পারেন। স্তোত্রটি মহানির্ব্বাণ তন্ত্র হইতে গৃহীত এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত।

ব্রহ্মোপাসকদের জাতকর্ম্ম, নামকরণ, ধর্ম্মদীক্ষা, বিবাহ, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি পারিবারিক ধর্ম্মানুষ্ঠানসকলের প্রণালী কিরূপ, কোনো পাঠক জানিতে ইচ্ছা করিলে, ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রকাশিত তদ্বিষয়ক গ্রন্থাদি পাঠ করিবেন।

সর্ব্বশেষে বক্তব্য এই যে, পরম শ্রদ্ধাভাজন আচার্য্য শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, এম্-এ, মহাশয় এই গ্রন্থের ভূমিকাটি লিখিয়া দিয়া আমাকে চিরকৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজ, ঢাকা
৯ই আগষ্ট, ১৯৩৭

শ্রীঅমরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

ভূমিকা

শ্রদ্ধেয় অমরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের এই পুস্তকখানি নানা দিক্ দিয়া অতিশয় সময়োপযোগী হইয়াছে। যাঁহারা ব্যাকুলভাবে ধর্ম্মের তত্ত্ব নির্ণয়ের জন্য উৎসুক, যাঁহারা মূর্ত্তিপূজা বিষয়ে হিন্দুশাস্ত্রের সর্ব্বোচ্চ তত্ত্ব-গ্রন্থ সকলের মীমাংসাগুলিকে যুক্তির সাহায্যে বুঝিতে ইচ্ছুক, যাঁহারা যুগ-প্রবর্ত্তক রামমোহন রায়ের চিন্তাধারার ও বিচার-প্রণালীর সহিত পরিচিত হইতে কুতূহলী, তাঁহারা সকলেই এই পুস্তক পাঠে উপকার ও আনন্দ লাভ করিবেন। নানা প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত বাদপ্রতিবাদ-সূত্রে নানা গ্রন্থে রামমোহন রায়ের যে সকল উক্তি ও মীমাংসা বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছিল, অমর বাবু সে সকলকে নিজের একটি সুচিন্তিত প্রণালীতে বিভক্ত ও সুবিন্যস্ত করিয়া অতিশয় সহজবোধ্য ও সুখপাঠ্য করিয়া দিয়াছেন।

এই পুস্তকখানি শাস্ত্র ও যুক্তি উভয়ের সহযোগে এমন ভাবে লিখিত হইয়াছে যে, ভারতবর্ষের অন্যান্য ভাষায় ইহার অনুবাদ হইলে সমগ্র হিন্দুজাতির উপকার হইবে। রামমোহন রায়ের অনেক চমৎকার উক্তি কেবল তাঁহার বাঙ্গালা গ্রন্থাবলীতেই পাওয়া যায়। সাকার ও নিরাকার উপাসনা সম্বন্ধীয় ঐরূপ সমুদয় উক্তি এই পুস্তকে সংগৃহীত হইয়াছে। প্রাদেশিক ভাষাসকলে এই পুস্তক অনুবাদিত হইলে তত্তৎ-প্রদেশবাসিগণ সে সকলের স্বাদ গ্রহণ করিতে পারিবেন।

প্রচলিত প্রথাসকলের মধ্যে যাহা যুক্তিযুক্ত ও যাহা অযৌক্তিক, রক্ষণ-শীল লোকেরা অবিচারে উভয়ের সমর্থন করেন, উন্নতিশীলেরা বিচারপূর্ব্বক

যাহা যুক্তিযুক্ত কেবল তাহাই গ্রহণ করিতে এবং যাহা অযৌক্তিক তাহা বর্জ্জন করিতে চেষ্টা করেন। এই কারণে যুগে যুগে রক্ষণশীল ও উন্নতিশীলদের মধ্যে স্বভাবতঃ নানা তর্ক-বিতর্ক উপস্থিত হয়। এরূপ তর্ক-বিতর্ক অন্যায় বা অনিষ্টকর নয়; বরং সত্যনির্ণয় ও মঙ্গললাভের জন্য তাহা একান্ত আবশ্যক। কিন্তু এই উদ্দেশ্য সফল হইতে হইলে উভয় পক্ষের কতকগুলি গুণ থাকা প্রয়োজন। এ দেশে এক শতাব্দী পূর্ব্বে, এমন কি পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বেও, এরূপ তর্কে লিপ্ত উভয় দলের লোকেরা নীতিমত্তা, সংযম, শ্রদ্ধাশীলতা প্রভৃতি গুণের সমাদর করিতেন। কিন্তু এখন যেন নূতন এক যুগ আসিয়া পড়িয়াছে। এ যুগে ঐ সকল গুণের আদর নাই। এ যুগকে সর্ব্ববিষয়ে শিথিলতার যুগ বলা যাইতে পারে। ব্যক্তিগত জীবনে "যাহা ভাল লাগে ও যাহাতে আমোদ পাওয়া যায়", এবং সমষ্টিগত জীবনে "যাহাতে দল বাঁধা যায় ও বিপক্ষ দলের সঙ্গে লড়িবার সুবিধা হয়" এই দুই সহজ পদ্ধতি অবলম্বনই যেন এ যুগের বিশিষ্টতা।

দেশের কল্যাণকামিগণ দেশকে এই শিথিলতা হইতে মুক্ত করিবার জন্য ব্যাকুল। তাঁহারা দেশবাসীকে বলিতেছেন—(১) সাবধানে ও দৃঢ়পদে চিন্তার পথে চলিয়া সত্যকে স্পষ্টরূপে জান ও তাহারই অনুসরণ কর; (২) লোকপ্রিয় হওয়া নয়, সত্যের অনুসরণ করাই মনুষ্যত্বের পথ; (৩) চরিত্র ও সংযম বিনা মানুষ মানুষ হয় না, দেশও মানুষের দেশ হয় না; (৪) ভেদবুদ্ধি ও দলাদলি সর্ব্বথা পরিত্যাগ কর, তাহা নিজ সম্প্রদায়ের আত্মরক্ষার নামে, দেশের স্বাধীনতার নামে, অথবা অপর যে কোন নামের আবরণেই আসুক্ না কেন।

শতবর্ষ পূর্ব্বে রামমোহন রায় দেশকে এই সকল কল্যাণবাণীই বলিয়াছিলেন। অমর বাবু রামমোহনের সেই বাণীকে যুগোপযোগী আকার দান করিয়া দেশবাসীর সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন।

কিন্তু রামমোহনের যুগে যে কথার মূল্য ছিল, এখনও কি তাহার মূল্য আছে? তখন যাহা প্রযোজ্য ছিল, এখনও কি তাহা প্রযোজ্য আছে? আছে বই কি! মানুষের কল্যাণ ও জাতির কল্যাণ বিধাতার কতকগুলি শাশ্বত নিয়মের উপরে প্রতিষ্ঠিত; তাহা সর্ব্বযুগে ও সর্ব্ব-দেশে একরূপ। এই জন্য বর্ত্তমান যুগে আবার রামমোহনের বাণীর আলোচনা করা প্রয়োজন হইয়াছে।

আরও একটি কারণে ইহা প্রয়োজন। যাঁহারা কোনও প্রাচীন কীর্ত্তির ভগ্নস্তূপ দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, সেই ভগ্নস্তূপ কীর্ত্তিটির ভিত্তির পরিসর অপেক্ষা অনেক অধিক স্থান অধিকার করিয়া পড়িয়া থাকে। দর্শক সেই ধ্বংসরাশির বিস্তৃতি দেখিয়া চমকিত ও ভীত হন। রামমোহনের সময়ে তাঁহার পূর্ব্ব-যুগের বিশাল সভ্যতা এইরূপে নানা দিক্ দিয়া ধ্বংস হইয়া পড়িয়া ছিল। লোকে বলিতেছিল, এত বড় সভ্যতার এত বড় ভগ্নস্তূপের মধ্যে বসিয়া একা রামমোহন নূতনভাবে কতটুকু গড়িবেন? তাঁহার কাজটুকু কি টিঁকিবে? কিন্তু রামমোহন ধ্বংসরাশির বিশালতায় ভীত হন নাই, অথবা লোকের ঐ সকল কথায় নিরুদ্যম হন নাই। বর্ত্তমান কালে আবার যেন আর একটি ভাঙ্গনের যুগ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এই নূতন প্রকার ধ্বংসের আরম্ভ দেখিয়া যাহাতে আমরা ভীত না হই, সেজন্যও সেই নির্ম্মাণ-কুশল স্থপতি রামমোহনের কার্য্যপ্রণালীর আলোচনা করা ভাল।

রামমোহনের পরবর্ত্তী এক শতাব্দীতে এ দেশে যে সকল মহামনা দেশসেবক অভ্যুদিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে মতের ও কার্য্য-প্রণালীর বহু বৈচিত্র্য ছিল; তথাপি ঈশ্বরের প্রতি সরল বিশ্বাসে, চিন্তার প্রসারে, মনের উদারতায় ও আত্মোৎসর্গের মহত্ত্বে তাঁহারা সকলে যেন একশ্রেণীভুক্ত মানুষ ছিলেন। ঐ এক শতাব্দীতে তাঁহাদের

অনুষ্ঠিত জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চ্চার দ্বারা, সমাজ-সংস্কারের দ্বারা, দেশসেবার দ্বারা, বিশ্বাসানুযায়ী আচরণের বীরত্বের দ্বারা, ধর্ম্ম-সংস্কারের দ্বারা, এ দেশে এক অপূর্ব্ব ঐকান্তিকতার আবির্ভাব হইয়াছিল। সেই ঐকান্তিকতার ভাবটিই যেন এ যুগে আর থাকিতেছে না।

বর্ত্তমান যুগে মানুষের ধর্ম্মচিন্তা শিথিল। এখন লোকেরা বলে,—মতের বিশুদ্ধতার জন্য বা ষোল আনা সত্য নির্ণয়ের জন্য, কঠিন প্রয়াসের কোন প্রয়োজন নাই; স্থির ধর্ম্মবিশ্বাসেরও কোন প্রয়োজন নাই; যাহা বলিলে অধিকাংশ লোক খুশী হয়, তাহাই বলিয়া চল,—মুখে বলিয়া চল, অন্তরে বিশ্বাস না-ই বা থাকিল। এখন নীতির বন্ধনও শিথিল। মানুষের ইচ্ছার উপরে, বিশেষতঃ যৌবনের প্রবৃত্তির উপরে, নীতির নিয়মগুলি গুরুভার শিকলির মত হইয়া চাপিয়া থাকিবে, ইহা লোকে অসহ্য বলিয়া বোধ করিতেছে। সাহিত্যে ও শিল্পে পূর্ব্বাচার্য্যগণ নানাবিধ আদর্শ মানিয়া চলিতেন; এই অপরাধে তাঁহাদের রচিত সাহিত্য ও শিল্প এখন বিস্বাদ বলিয়া অনাদৃত হইতেছে। আদর্শের 'নিগড়' পরাইলে নাকি সাহিত্য ও শিল্প নষ্ট হইয়া যায়! এখন সমাজে, পরিবারে, এমন কি শিক্ষায়তনগুলিতে পর্য্যন্ত, আনুগত্যের কোন স্থান রাখা হইতেছে না; এ সকলও গণমতের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হউক,—ইহাই যেন এ যুগের বুলি। এ যুগে আমোদ প্রমোদের গতি কোন্ দিকে, সে বিষয়ে কিছু বলাই নিষ্প্রয়োজন। এই সকল ভাব দেখিয়া আশঙ্কা হয় যে, বিগত এক শতাব্দীতে যাহা গড়িয়াছিল, এখন তাহার সবই বুঝি ভাঙ্গিয়া যাইবে।

কিন্তু ইতিহাসের ধারায় ভাঙ্গাগড়ার ব্যাপার যখন যে ভাবেই উপস্থিত হউক্ না কেন, কল্যাণরক্ষার ও কল্যাণপ্রতিষ্ঠার নিয়ম সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বযুগে একরূপ। রামমোহন রায়ের যুগে তিনিই প্রকৃত

হিন্দুধর্ম্মের সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী রক্ষক ও সমর্থক ছিলেন; মিশনরীগণের আক্রমণ হইতে হিন্দুর বেদান্ত-প্রতিপাদ্য ধর্ম্মকে তিনিই রক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি দেখিলেন, পৌত্তলিকতা এক মহা ভ্রান্তি। ভ্রান্তির সংমিশ্রণ কোন ধর্ম্মকেই রক্ষা করে না; তাহা হিন্দুধর্ম্মকেও রক্ষা করিতে পারিবে না, বরং ধ্বংসের পথেই লইয়া যাইবে। তিনি দেখিলেন, মানুষ নিজ **অন্তরে** ঈশ্বরের ইচ্ছা বুঝিয়া তদনুসরণে জীবন গঠন করিলেই উন্নত হইতে পারে; কিন্তু পৌত্তলিকতা **আন্তরিক** ধর্ম্মসাধনের ও নৈতিক ঐকান্তিকতার পরিপন্থী; অতএব তাহা হিন্দুধর্ম্মকে রক্ষা করিতে পারিবে না, বরং ধ্বংসের পথেই লইয়া যাইবে। তিনি দেখিলেন, পৌত্তলিকতা সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতার ও ভেদবুদ্ধির জননী; সঙ্কীর্ণতা ও ভেদবুদ্ধি হিন্দুধর্ম্মকে রক্ষা করিতে পারিবে না, বরং ধ্বংসের পথেই লইয়া যাইবে। অতএব হিন্দুধর্ম্মকে রক্ষা করিতে হইলে পৌত্তলিকতা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করা প্রয়োজন। ঈশ্বরের যে সকল শাশ্বত নিয়ম অনুভব করিয়া রামমোহন তাঁহার যুগে তাঁহার এই কল্যাণবাণী বলিয়াছিলেন, সেই সকল শাশ্বত নিয়ম এখনও কার্য্য করিতেছে।

এখনও ইহা সত্য যে, পৌত্তলিকতা ও সাম্প্রদায়িকতা হইতে মুক্ত হওয়া, সর্ব্বদেশের সর্ব্বযুগের ধর্ম্মধারাসকলে যাহা-কিছু শ্রেষ্ঠ, ভক্তির সহিত তাহা আত্মস্থ করা, এবং ভারতের চিরন্তন ত্যাগ-সংযম ও শুদ্ধতার আদর্শকে উন্নত করিয়া ধরা,—হিন্দুসমাজের পক্ষে ইহাই বাঁচিবার পথ, শক্তিশালী হইবার পথ, ভাবী মিলিত-ভারতের একটি গৌরবময় অঙ্গে পরিণত হইবার পথ। তদ্বিপরীত পথ—অর্থাৎ মূর্ত্তিপূজা ও নরপূজার দ্বারা স্ব-সম্প্রদায়কে নূতন করিয়া কষিয়া বাঁধা ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের সহিত আপনাদের পার্থক্যকে তীক্ষ্ণতর করিয়া তোলা—আত্মঘাতের পথ। এ সকল চেষ্টা যাঁহারা করিতেছেন, তাঁহারা হিন্দুসমাজের

শ্রেষ্ঠ মানুষদের শ্রদ্ধা হারাইতেছেন; কারণ, "মূর্ত্তিপূজা, নরপূজা, জাতিভেদ অথবা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষবুদ্ধি দ্বারা হিন্দুজাতির অণুমাত্রও উপকার হইতে পারে" ইহা স্বীকার করিলে হিন্দুর প্রকৃতিকে অতি হীন বর্ণে চিত্রিত করা হয়—এত হীন বর্ণে চিত্রিত করা হয় যে, হিন্দুর কোন ঘোর শত্রুও কোন দিন তাহাকে তত হীন বলেন নাই। হিন্দুজাতির পরম হিতৈষী রামমোহন ঠিক ইহার বিপরীত কথাই বলিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, হিন্দুর বেদান্ত-প্রতিপাদ্য একেশ্বরবাদ এমন উন্নত বস্তু যে, তাহা হিন্দুকে জ্ঞানে ও শক্তিতে উজ্জ্বল করিবে, জাতিভেদ ও সাম্প্রদায়িকতা অপসারিত করিবে, ভারতকে জগৎ-সভায় শ্রদ্ধাযোগ্য করিয়া তুলিবে।

কল্যাণরক্ষার ও কল্যাণপ্রতিষ্ঠার নিয়ম যে সকল যুগেই একরূপ, আমরা বর্ত্তমান যুগের ধর্ম্মপ্রাণ দেশসেবকদের নিকটেও তাহার সাক্ষ্য পাইতেছি। দেশের সেবার জন্য যাঁহারা কারাবাস বরণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে গম্ভীরপ্রকৃতি, চিন্তাশীল, শুদ্ধচরিত্র, ত্যাগী যুবক অনেক রহিয়াছেন। তাঁহাদের সঙ্গে আলাপ করিয়া দেখিয়াছি, তাঁহারাও অনুভব করেন, এক ঈশ্বরে বিশ্বাস, জাতিভেদ ও সাম্প্রদায়িকতা উন্মূলন, নৈতিক সাহস ও শুদ্ধ চরিত্র,—এ সকলই দেশের কল্যাণের ভিত্তি। তাঁহাদের কথা যেন রামমোহনের বাণীর প্রতিধ্বনি; অথচ রামমোহনের অথবা ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে তাঁহাদের কোন সংশ্রব হয় নাই।

ঈশ্বর মানুষকে যত শক্তি দিয়াছেন, চিন্তাশক্তির স্থান তাহার মধ্যে অতি উচ্চে। চিন্তা-অর্জ্জিত জ্ঞানের দ্বারাই দেশ সুধীসমাজে সম্মান লাভ করে; চিন্তায় যে পঙ্গু, সে পশ্চাতে পড়িয়া থাকে। জ্ঞানবীর রামমোহন সে যুগে দেশবাসীর মধ্যে স্বাধীন ও সাহসিক চিন্তার অভাব দেখিয়া ব্যথিত হইয়াছিলেন, এবং দেশবাসীকে অন্ধবিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া চিন্তা ও যুক্তির সাহায্যে সত্য নির্ণয় করিতে প্রেরণা দান করিয়া-

ছিলেন। বর্ত্তমান শিথিলতার যুগে দেশের মানুষ আবার যেন চিন্তায় বিমুখ ও চিন্তা-পঙ্গু হইয়া পড়িতেছেন। রামমোহনের গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ সুশৃঙ্খল বিচারপ্রণালীর মধ্যে এমন ঐকান্তিকতা ও তেজ আছে, যাহা এ যুগের বাঙ্গালীকে চিন্তার পথে নিজের পা চালাইয়া অগ্রসর হইতে শক্তি ও সাহস দান করিতে পারে। তাঁহার সমুদয় বিচার-বিতর্ক সত্যের প্রতি একাগ্র দৃষ্টি, সত্যের প্রতিষ্ঠার জন্য ঐকান্তিক আগ্রহ এবং তদুদ্দেশ্যে ব্যবহৃত শাণিত যুক্তিসমূহের আভায় ঝলমল্ করিতেছে। এই পুস্তকে অমর বাবু সে সকল বিচারকে প্রতিপক্ষের 'প্রশ্ন' বা 'আপত্তি', ও রামমোহনের 'উত্তর', এই আকার দান করিয়াছেন। রামমোহনের ন্যায় মানুষের হাতে বিচার-বিতর্কও যে কতদূর হৃদয়গ্রাহী হইতে পারে, এই পুস্তকে পাঠক তাহার পরিচয় পাইবেন। পুস্তকখানা যদি বাঙ্গালীর প্রাণে স্বাধীন-চিন্তার সাহস ও বীর্য্য আনয়ন করে, তবে অমর বাবুর এই শ্রদ্ধা-প্রণোদিত পরিশ্রম সার্থক হইবে।

চিন্তার বীর্য্যের অন্তরায় কি কি? এই প্রশ্নের উত্তর পাঠক এই পুস্তকে নানা প্রসঙ্গে প্রাপ্ত হইবেন। কয়েকটি অন্তরায় এই :—(১) পিতৃ-পিতামহের ও স্ববর্গের মতের অন্ধ অনুসরণ; (২) অধিকাংশের মত কোন্ দিকে, সভয়ে তাহার অনুসন্ধান; (৩) বিশ্বাস থাকিলে ভ্রান্ত পদ্ধতি অবলম্বনেও ঈশ্বরকে পাওয়া যাইবে, অন্ততঃ তাঁহার পথে কিছু দূর অগ্রসর হওয়া যাইবে, এই আশা; (৪) ভারতের আর্য্য ঋষিগণ যাহা কিছু বলিয়া গিয়াছেন, তাহার সবই অভ্রান্ত সত্য, এই বিশ্বাস করা, কিন্তু তাঁহারা কি বলিয়া গিয়াছেন, তাহার অনুসন্ধান না করা; (৫) ভাবের পরিতৃপ্তিই সত্যের পরীক্ষা, এই মত; (৬) দলের গোঁড়ামি; প্রভৃতি। এ সকল হইতে মুক্ত না হইলে মানুষের মত মানুষ হওয়া, ও জাতির মত জাতি গঠন করা, উভয়ই অসম্ভব।

এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি হাতে লইয়া আমরা বাঙ্গালী সমাজকে বলিতে চাই,—"এস, চিন্তা কর, আলোচনা কর। আলোচনা করিয়া যদি মূর্ত্তিপূজাকে কল্যাণকর বলিয়া বোঝ, তাহাই করিও। কিন্তু আলোচনা না করা, চিন্তাকে নিদ্রিত রাখা, ধর্ম্ম ও সত্য সম্বন্ধে মনকে শিথিল করিয়া রাখা,—ইহাতে ঘোর অকল্যাণ।"

বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকেও দু একটি কথা বলিবার আছে। এমন অনেক লোক আছেন, যাঁহারা চিন্তা-বিমুখ হইয়া, কিন্তু সরল ও প্রগাঢ় বিশ্বাসের সহিত, দেবমূর্ত্তির পূজা করেন। এ পুস্তকে যদিও তাঁহাদের কার্য্যের ভ্রম প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে; তথাপি তাঁহাদের নিষ্ঠাকে আমরা অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা করি। কিন্তু আজকাল বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ দলবদ্ধ হইয়া অনেক স্থলে যেরূপ বিশ্বাস ও নিষ্ঠাহীন ভাবে সরস্বতী-পূজার আড়ম্বর করিতেছেন, তাহা দেখিয়া বড়ই ক্লেশ বোধ হয়।

প্রাচীন কালে গুরু বা শিষ্য কাহারও মনে মূর্ত্তিপূজার বিষয়ে কোন সংশয় বা আলোচনা উত্থিত হইত না; তখন উহা নিরবচ্ছিন্ন সরল বিশ্বাসেরই ব্যাপার ছিল। তাই তখন ছাত্রগণের বিদ্যার তপস্যাকে পূজার অনুষ্ঠানের দ্বারা দেবপূজার পদবীতে উন্নীত করিয়া লওয়া সম্ভব হইত।

এখন ছাত্রেরা স্কুলে-কলেজে ইতিহাস, ভূগোল, ন্যায়শাস্ত্র, দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছেন। হিন্দু ছাত্রেরা দেখিতেছেন যে, পৃথিবীর অধিকাংশ লোক মূর্ত্তির সহায়তা বিনা ঈশ্বরের উপাসনা করিয়া থাকেন। সুতরাং তাঁহাদের মনে মূর্ত্তিপূজা সম্বন্ধে বহু আলোচনা উপস্থিত হয়। তাঁহাদের মধ্যে শতকরা একজনও প্রাচীনদিগের ন্যায় দেবী সরস্বতীতে অবিচারিত বিশ্বাস রক্ষা করিতে পারেন কি না সন্দেহ। অথচ দেখিতে পাই, আজকাল বিদ্যালয়সকলে দলবদ্ধ হইয়া সরস্বতী-পূজা করিবার এক প্রথা দাঁড়াইয়া গিয়াছে।

এই প্রথার পক্ষীয়গণের মধ্যে অনেকে, ধর্ম্মের যুক্তিতে নয়, কিন্তু সামাজিকতা ও বিশুদ্ধ আমোদের নামে, ইহার সমর্থন করিতেছেন। তাঁহারা চিন্তা করেন না যে, ঐকান্তিক জ্ঞানতপস্যা হইতে দেবপূজা যতখানি উর্দ্ধে, উহা হইতে আমোদ-চর্চ্চা ততখানি নীচে। যদি এ কথা সত্য হয় যে, ছাত্রগণ আমোদের ভাবেই সরস্বতী-পূজা করে, তবে বলিতে হয়, পূর্ব্বে যে কার্য্যের দ্বারা ছাত্রের মনটি মনোরাজ্যের দু এক ধাপ উর্দ্ধে উঠিত, এখন তাহারই দ্বারা সে মনটি মনোরাজ্যের দু এক ধাপ নীচে নামিয়া যাইতেছে। ইহার ফল মানবচরিত্রে অতি গুরুতর। "ধর্ম্মকে আমোদে ও খেলায় পরিণত করা যায়," এ ধারণা মানুষের অন্তরে জন্মাইয়া দেওয়ার ফল ব্যক্তিগত জীবনে ও জাতীয় জীবনে অতি সাংঘাতিক।

আমরা সামাজিকতা ও আমোদের দিক ছাড়া, ধর্ম্মের দিক্ হইতেও এই প্রথার আলোচনা করিতে চাই। দলবদ্ধ পূজার অনেক দায়িত্ব আছে। বিদ্যালয়ের সকল ছাত্রকে লইয়া সরস্বতী-পূজার আয়োজন যাঁহারা করেন, তাঁহারা কাহাকেও প্রশ্ন করেন না—"তুমি সরস্বতীতে বিশ্বাস কর কি?" "বিশ্বাস কর বা না কর, আমাদের সঙ্গে যোগ দাও," এই ভাবেই এ পূজায় আহ্বান করা হয়। ইহা দ্বারা ধর্ম্মবিশ্বাসরূপ অতি পবিত্র বস্তুকে অবহেলা করিতে ছাত্রগণকে পরোক্ষভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়। ধর্ম্মবিশ্বাসে দৃঢ়তা, ধর্ম্মবিশ্বাসের জন্য ত্যাগস্বীকার, এ সকল দূরে থাকুক, "ধর্ম্মবিশ্বাস যদি আমোদ-আহ্লাদের বাধা হয়, তবে তাহাকে চাপা দিয়া রাখা যায়"—এই ভাব ছাত্রমণ্ডলীর মনে দাঁড়াইয়া যাইতেছে। অনেকে এই পূজা উপলক্ষ্যে অপরের সরল স্বাভাবিক ধর্ম্মবিশ্বাসকে, ও বিশ্বাসবিরুদ্ধ আচরণ হইতে নিবৃত্ত থাকিবার সঙ্কল্পকে, বিদ্রূপ করিতে ও আঘাত করিতেও সঙ্কুচিত হন না।

অতএব, দলবদ্ধ সরস্বতী-পূজাকে আমোদের ব্যাপার বলিয়া দেখিলে, এই পূজার ফল—নিম্নাভিমুখী মনোগতি; এবং ধর্ম্মানুষ্ঠানরূপে দেখিলে, ইহার ফল—আন্তরিক বিশ্বাসের প্রতি অবজ্ঞা। আমাদের মনে হয়, এ উভয় প্রকার অকল্যাণ জাতীয় চরিত্রে ফলিতেছে। প্রাচীন কালে সরস্বতী-পূজার দ্বারা ছাত্রগণ হইতেন অধিক ভক্তিমান্, অধিক তপস্যানিরত, সংযত ও শান্ত; বর্ত্তমান যুগের এই দলবদ্ধ সরস্বতী-পূজার দ্বারা তাঁহারা হইয়া উঠিতেছেন ভক্তিহীন, বিশ্বাসহীন, লঘুচিত্ত ও পরমতে অসহিষ্ণু।

গ্রাম হইতে সহরে নবাগত সরলচিত্ত ছাত্রদের কাছে এ পূজা কেমন লাগে? তাহারা দেখে, সহরবাসী ছাত্রদের মধ্যে ভক্তির লেশমাত্র নাই। পূজায় ও মন্ত্রপাঠে অনেকে আসেন না; অনেকে এ সকল দেখিয়া হাসাহাসি করেন; অথচ পরে সকলে মিলিয়া ষোড়শোপচারে ভোজন করেন, ও দল বাঁধিয়া অভিনয় করেন অথবা বায়োস্কোপে গমন করেন। তাঁহারা দেখে, দলপতিদের মনের একমাত্র ব্যস্ততা এই যে, অমুক বিদ্যালয়কে পূজার ধূমধামে হারাইতে পারা গেল কি না। সরলমতি গ্রামবাসী ছাত্রেরা এ সকল দেখিয়া, বিস্মিত ও দুঃখিত হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ক্রমে তাহারাও দলে মিশিয়া যায়।

জাতীয় কল্যাণের দিক্ হইতেও এই নূতন প্রথাকে চিন্তা করা আবশ্যক। পূর্ব্বে বিদ্যামন্দিরসকল হিন্দু ও মুসলমানের পবিত্র মিলনক্ষেত্র ছিল। উৎসবদিনে সকলে মিলিত হইয়া এক পরমেশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা অর্পণ করিতেন, ও পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্বীকার করিতেন। সে সকল দিন আমরা দেখিয়াছি। এখন দুই সম্প্রদায়কে পৃথক্ পৃথক্ বিদ্যালয়ে পড়াইবার চেষ্টা হইতেছে। এই ব্যবস্থার ফলে দুই সম্প্রদায়ের ছাত্রগণের মধ্যে যে দূরত্বজনিত বিচ্ছেদ ঘটিতে আরম্ভ হইয়াছে, সরস্বতী-পূজার

আড়ম্বর সেই বিচ্ছেদকে প্রসারিত করিয়া একেবারে অলঙ্ঘনীয় করিয়া তুলিতেছে।

সংক্ষেপে বলা যায়, বর্ত্তমান যুগে ছাত্রমণ্ডলীর দলবদ্ধ সরস্বতী-পূজা তাহাদের চিন্তাশক্তিকে পঙ্গু করিতেছে, মনকে কপট করিতেছে; ইহা গুরু বস্তুকে লঘু করিতে শিখাইতেছে, দলগত সঙ্কীর্ণতা সৃষ্টি করিতেছে। যে তরুণগণ দেশের আশাস্থল, ইহা তাহাদেরই মধ্যে এই সকল বিষ সঞ্চারিত করিতেছে। সুতরাং ইহা দেশের কল্যাণের মহাশত্রু। শিক্ষকগণ ও ছাত্রগণ এই সকল কথা ধীর ভাবে চিন্তা করিয়া দেখিবেন।

সাধনাশ্রম
২১০।৬, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা
৬ই আগষ্ট, ১৯৩৭

শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

বিষয়-সূচী

বিষয় পৃষ্ঠা

১। রামমোহনের ধর্ম্মসংস্কার কার্য্য ... ১—১০

(ক) রামমোহন বর্ত্তমান যুগের ব্রহ্মোপাসকদের ধর্ম্মগুরু ১

(খ) ধর্ম্মসংস্কারই তাঁহার জীবনের সর্ব্বপ্রধান কার্য্য ... ২

(গ) হিন্দুধর্ম্মের সংস্কার কত কঠিন শ্রমসাধ্য ছিল ... ৩

(ঘ) কি কি ভাব লইয়া তিনি ঐ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন ৪

(ঙ) মূর্ত্তিপূজার বিরুদ্ধে তাঁহার সংগ্রামের কারণ ... ৫

(চ) অপরের ধর্ম্মবিশ্বাসের সমালোচনা অন্যায় কি না ? ৬

(ছ) সত্যের জয়ে বিশ্বাস সংস্কারকের বল ... ৭

(জ) রামমোহনের বিরুদ্ধে আন্দোলনের প্রধান কারণ ৯

(ঝ) শাস্ত্র ও যুক্তি উভয়ই সত্যনির্ণয়ের উপায় ... ৯

২। রামমোহনের শাস্ত্রীয় বিচারের পদ্ধতি .. ১১—২৬

(ক) শাস্ত্রীয় বিচারে রামমোহনের দাঁড়াইবার ভূমি ... ১১

(খ) শাস্ত্রীয় বিচারের নিয়ম—কয়েকটি মূল-সূত্র ... ১২

(গ) প্রথম সূত্র—পুরাণতন্ত্রাদি প্রসিদ্ধ টীকাবিশিষ্ট বা মহাজন-ধৃত না হইলে অপ্রামাণ্য ... ১৩

(ঘ) দ্বিতীয় সূত্র—পুরাণতন্ত্রাদি বেদার্থের বিরোধী হইলে অপ্রামাণ্য ১৪

(ঙ) তৃতীয় সূত্র—যে বিদ্যা দ্বারা ব্রহ্মকে জানা যায়, তাহাই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা ১৪

(চ) সকল বেদের প্রতিপাদ্য—পরব্রহ্ম ... ১৫

(ছ) পুরাণতন্ত্রাদিরও প্রতিপাদ্য—পরব্রহ্ম ... ১৬

বিষয় পৃষ্ঠা

(জ) চতুর্থ সূত্র—মনু বেদার্থের সংগ্রহকর্ত্তা, সুতরাং প্রামাণ্য ১৮

(ঝ) মনুরও শেষ সিদ্ধান্ত—ব্রহ্মজ্ঞান ... ১৮

(ঞ) প্রতিমাদি পূজার অনুকূল সকল শাস্ত্র অপরা বিদ্যা ১৯

(ট) পঞ্চম সূত্র—শাস্ত্রের বিভিন্ন উপদেশ অধিকারী-ভেদে প্রযোজ্য ১৯

(ঠ) উক্ত পাঁচটি মূল-সূত্র কি অন্য পণ্ডিতেরা জানিতেন না ? ২১

(ড) শাস্ত্রসিন্ধু হইতে রামমোহনের ব্রহ্মজ্ঞান-রূপ রত্ন আবিষ্কার ২২

(ঢ) তাঁহার তর্ক-বিচার উচ্চতর হিন্দুধর্ম্মের রক্ষার জন্য ২৩

(ণ) তাঁহার জয়পত্র প্রাচীন ঋষিদেরই প্রদত্ত ... ২৫

৩। মূর্ত্তিপূজার সপক্ষে প্রথম শ্রেণীর যুক্তি ও তাহার উত্তর (নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনা অসম্ভব কি না ?) ... ... ২৬—৩৯

(ক) সূচনা ২৬

(খ) 'নিরবয়ব ব্রহ্মকে ধারণা করা যায় না'—এ আপত্তির উত্তর ২৮

(গ) 'যিনি ধারণাতীত, তাঁর উপাসনা অসম্ভব'—উত্তর ২৮

(ঘ) 'ব্রহ্মবিষয়ক শাস্ত্রসকল সাধারণের অবোধ্য'—উত্তর ২৯

(ঙ) 'উপাসনা মাত্রই ভ্রমাত্মক জ্ঞান'—উত্তর ... ৩০

(চ) সাক্ষাৎ উপাসনা ও পরম্পরা উপাসনা ... ৩২

(ছ) উপাসনা সত্যমূলক হওয়া আবশ্যক ... ৩৪

(জ) ব্রহ্মের 'স্বরূপ' জানা যায় না, কিন্তু তাঁহাকে তটস্থ লক্ষণে জানা যায় ৩৫

(ঝ) ব্রহ্মকে ইন্দ্রিয়ের গোচর করিয়া জানা অসম্ভব ৩৬

বিষয় পৃষ্ঠা

(ঞ) তাঁহাকে তটস্থ লক্ষণে উপাসনা করিতে সকলেই সক্ষম ৩৮

(ট) স্বজাতীয় বিজাতীয় অনেকেই তাঁহার উপাসনা করিতেছেন ৩৯

৪। দ্বিতীয় শ্রেণীর যুক্তি ও তাহার উত্তর (যে কোনও স্পষ্ট পদার্থে ঈশ্বরের উপাসনা হইতে পারে কি না ?) ... ... ৪০—৪৪

(ক) 'ব্রহ্ম সর্ব্বময় ; যে-কোনও পদার্থে তাঁহার উপাসনা না হইবে কেন ?'—উত্তর ৪০

(খ) 'কোনও স্পষ্ট পদার্থকেও ভ্রমক্রমে ঈশ্বরবোধে উপাসনা করিলে ফলসিদ্ধি অবশ্য হবে'—উত্তর ... ৪৩

(গ) মূর্ত্তিসকলেতে বাস্তবিক ঈশ্বরেরই উপাসনা করা হয় কি না ? ৪৩

৫। তৃতীয় শ্রেণীর যুক্তি ও তাহার উত্তর (ঈশ্বর নিরাকার অথচ সাকার, এ কথা সত্য কি না ?) ... ৪৪—৫৬

(ক) 'নিরাকার ব্রহ্ম সাকার হইয়া দর্শন দেন'—উত্তর ৪৪

(খ) 'যিনি নিরাকার, তিনিই সাকার'—উত্তর ... ৪৬

(গ) 'ব্রহ্ম সাকার কৃষ্ণ-মূর্ত্তি ; সে মূর্ত্তি আনন্দের মূর্ত্তি'—উত্তর ৪৬

(ঘ) 'রাম, কৃষ্ণ প্রভৃতি ঈশ্বরের অবতার'—উত্তর ... ৪৯

(ঙ) সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মের অবতার কথন শাস্ত্রে নাই ... ৫০

(চ) 'ব্রহ্ম দেবতাদের নিকট প্রকাশিত হইয়াছিলেন'—উত্তর ৫০

(ছ) 'সগুণ হইলেই সাকার হয়'—উত্তর ... ৫১

(জ) 'শাস্ত্রে দেবতাদিগকে ব্রহ্ম বলা হইয়াছে'—উত্তর ৫২

(ঝ) স্পষ্ট বস্তুতে ব্রহ্মের অধ্যাস হয়, 'কিন্তু ব্রহ্মে স্পষ্ট বস্তুর অধ্যাস হয় না ৫৩

(ঞ) 'দেবতারা স্বয়ং আপনাদিগকে ব্রহ্ম বলিয়াছেন'—উত্তর ৫৪

বিষয়	পৃষ্ঠা
৬। চতুর্থ শ্রেণীর যুক্তি ও তাহার উত্তর (দেবতারা ঈশ্বরের স্বরূপ বা কর্ম্মচারী কি না ?)	**৫৬—৬২**
(ক) 'দেবতারা ঈশ্বরের নানা স্বরূপের প্রকাশক'—উত্তর	৫৬
(খ) 'দেবতারা ঈশ্বরের কর্ম্মচারী'—উত্তর ...	৫৮
(গ) একেশ্বরবাদীর পক্ষে অন্য দেবতার পূজা অবৈধ	৫৯
৭। পঞ্চম শ্রেণীর যুক্তি ও তাহার উত্তর (সাকার-উপাসনা নিরাকার-উপাসনার সোপান কি না ?)	**৬২—৬৬**
(ক) 'প্রথমে সাকার, পরে নিরাকার'—উত্তর ...	৬২
(খ) 'প্রথমে অপর সকল শাস্ত্র, পরে বেদ-বেদান্ত'—উত্তর	৬৩
(গ) 'প্রথমে বেদের অগ্রভাগ, পরে বেদান্ত'—উত্তর	৬৪
(ঘ) 'প্রথমে কর্ম্মসাধন, পরে জ্ঞানসাধন'—উত্তর ...	৬৫
৮। ষষ্ঠ শ্রেণীর যুক্তি ও তাহার উত্তর (ত্রিবিধ আপত্তি)	**৬৬—৮৫**
(ক) 'পুরাণ-ইতিহাসই বর্ত্তমান কালের বেদ'—উত্তর ...	৬৬
(খ) 'চিত্তশুদ্ধি না হইলে ব্রহ্মোপাসনায় প্রবৃত্ত হওয়া অনুচিত'—উত্তর	৬৭
(গ) 'ব্রহ্মোপাসনার নিয়মসকল সম্যক্ পালন করা অসম্ভব'—উত্তর	৬৮
(ঘ) 'ব্রহ্মজ্ঞানে গৃহস্থের অধিকার নাই'—উত্তর ...	৬৯
(ঙ) 'ব্রহ্মোপাসনায় অব্রাহ্মণ ও নারীদের অধিকার নাই'—উত্তর	৭০
(চ) 'বিশ্বাস থাকিলে সাকারোপাসনাতেও উত্তম ফল পাওয়া যায়'—উত্তর	৭১
(ছ) 'মন্দিরে মস্‌জিদে বা গির্জ্জায় উপাসনা করাও পৌত্তলিকতা'—উত্তর	৭১

বিষয় পৃষ্ঠা

(জ) 'প্রাচীন যবনাদি শাস্ত্রেও প্রতিমাপূজা ছিল'—উত্তর ৭২

(ঝ) 'বেদান্ত-সূত্রের ভাষ্যকার স্বয়ং সাকার দেবতার স্তব করিয়াছেন'—উত্তর ৭৩

(ঞ) 'ব্রহ্মোপাসনায় লৌকিক ভদ্রাভদ্র জ্ঞান লোপ পায়'—উত্তর ৭৩

(ট) 'তোমরা ব্রহ্মজ্ঞানীর মত কি কার্য্য কর?'—উত্তর ৭৫

(ঠ) 'মূর্ত্তিপূজা পরম্পরা-সিদ্ধ'—উত্তর ... ৭৭

(ড) পরম্পরা-বিরুদ্ধ নূতন প্রথাও সমাজে সর্ব্বদা গৃহীত হয় ৮০

(ঢ) 'পিতা-পিতামহ ও স্ববর্গের মত পরিত্যাগ করা অন্যায়'—উত্তর ৮১

(ণ) 'অল্প লোকের মত গ্রহণ করা অসঙ্গত'—উত্তর ৮২

৯। মূর্ত্তিপূজা নিম্নাধিকারীর জন্য ... ... ৮৫—১০৫

(ক) মূর্ত্তিপূজা নিম্নস্তরের সাধনা ৮৫

(খ) যজ্ঞাদি কর্ম্ম নিকৃষ্ট সাধন ৮৮

(গ) প্রকৃত নিম্নাধিকারী কাহারা? ৯১

(ঘ) শিক্ষা দিলে 'নিম্নাধিকারী' উচ্চাধিকারী হয় ... ৯২

(ঙ) মূর্ত্তিপূজার ব্যবস্থা কেবল 'নিম্নাধিকারীকে' উচ্চাধিকারে তোল্‌বার জন্য ৯৩

(চ) উচ্চাধিকার অলভনীয় নয় ৯৮

(ছ) উচ্চাধিকার লাভের জন্য চেষ্টার প্রয়োজন ... ১০০

(জ) নিম্নাধিকারে সন্তুষ্ট থাকার কুফল ... ১০২

১০। দেবমূর্ত্তিসকল কি ঈশ্বরের প্রতিমা? ... ১০৫—২০

(ক) ঐশ্বরিক ও মানবিক উভয় ভাবের মিশ্রণে দেবতার সৃষ্টি ১০৫

(খ) দেবতাতে মানবিক ভাবের আরোপ ঈশ্বর-সাধনার বিঘ্ন ১০৭

বিষয়		পৃষ্ঠা
(গ)	উহাতে ভাবমুগ্ধতা জন্মায়	১০৮
(ঘ)	ভাবমুগ্ধতা ভক্তি নয়	১১২
(ঙ)	মূৰ্ত্তিসকল সত্য ঈশ্বরকে প্রকাশ করে না ...	১১৪
(চ)	মূৰ্ত্তিপূজা ঈশ্বরের অবমাননা	১১৭
(ছ)	মূৰ্ত্তিসকল দেবতাদেরই প্রতিমা, ঈশ্বরের নয় ...	১১৯
১১।	**দেবতারা বাস্তবিক আছেন কি না?**	**১২০—৩২**
(ক)	বেদান্তানুসারে দেবতারা আছেন, কিন্তু উপাস্য নহেন	১২০
(খ)	দেবতারা সৃষ্ট ও নশ্বর	১২১
(গ)	দেবতারা মনুষ্যের ন্যায় ব্রহ্মজ্ঞানের প্রার্থী ...	১২৩
(ঘ)	পুরাণাদি অনুসারে দেবতারা কল্পিত ...	১২৪
(ঙ)	দুই মতের সামঞ্জস্য	১২৫
(চ)	দেবতাদের পূজা কল্পনাময়	১২৭
(ছ)	মূৰ্ত্তিতে 'প্রাণ-প্রতিষ্ঠা' করা কল্পনা ...	১২৯
(জ)	সাধকেরা দেবতাদের দর্শন পান, এ কথা সত্য কি না?	১৩১
১২।	**মূৰ্ত্তিপূজা দীর্ঘকাল প্রচলিত থাকিবার কারণ**	**১৩২-৪০**
(ক)	প্রথম তিন কারণ	১৩২
(খ)	চতুর্থ ও পঞ্চম কারণ	১৩৭
(গ)	ষষ্ঠ ও সপ্তম কারণ	১৩৮
১৩।	**দেবপূজা ও ব্রহ্মোপাসনার সাধন-পদ্ধতি পরস্পরের বিপরীত**	**১৪০—৬৯**
(ক)	অপরিচ্ছিন্নকে পরিচ্ছিন্ন কল্পনা করা দেবপূজার ভিত্তি	১৪০
(খ)	দ্রব্যাদি দান দেবপূজার **প্রথম অঙ্গ** ...	১৪১

বিষয় পৃষ্ঠা

(গ) জীবনগঠন ব্রহ্মোপাসনার অত্যাবশ্যক সাধন ... ১৪২

(ঘ) বাহ্যিক শুচিতা ও জাতবিচার দেবপূজার **দ্বিতীয় অঙ্গ** ১৪৩

(ঙ) ইহাতে চরিত্রের বিশুদ্ধতা হইতে সাধকের দৃষ্টিকে সরাইয়া লয় ১৪৪

(চ) পৌত্তলিকতা সমাজের স্বাভাবিক গঠনকে ধ্বংস করে ১৪৫

(ছ) প্রাচীন গ্রীস ও রোমের পৌত্তলিকতা অপেক্ষা হিন্দু পৌত্তলিকতা অধিক অনিষ্টকর ১৪৫

(জ) পৌত্তলিকতা ও জাতিভেদ পরস্পর সংযুক্ত ও পরস্পরের সহকারী ১৪৬

(ঝ) জাতবিচার মানুষকে মানুষ হইতে বিচ্ছিন্ন করে ১৪৯

(ঞ) জাতিভেদ অনৈক্যের হেতু ও রাজনৈতিক উন্নতির অন্তরায় ১৫০

(ট) দেবতাদের চরিতাখ্যান পাঠ ও শ্রবণাদি দেবপূজার **তৃতীয় অঙ্গ** ১৫১

(ঠ) পুরাণাদিতে দেবচরিত্রের বর্ণনা কালিমাময় ... ১৫২

(ড) তাহার ফলে উপাসকদের নীতির হীনতা ঘটে ... ১৫৩

(ঢ) দেবপূজার সমর্থনকারীদের উচিত দেবচরিত্রকে কলঙ্কমুক্ত করা ১৫৫

(ণ) কলঙ্কমুক্ত না হইলে দেবতারা উপাস্য হইতে পারেন না ১৫৬

(ত) শিক্ষিত ব্যক্তিরা দেবচরিত্রকে আলোচনার বাহিরে রাখেন ১৫৭

(থ) ব্রহ্মোপাসনায় নীতিকে উন্নত করে ... ১৫৯

(দ) শাস্ত্রে অন্ধবিশ্বাস দেবপূজার **চতুর্থ অঙ্গ** ... ১৬০

(ধ) ব্রহ্মোপাসনায় বুদ্ধিবৃত্তির চালনা অপরিহার্য্য ... ১৬১

বিষয় পৃষ্ঠা

(ন) বুদ্ধিবৃত্তিকে নিষ্কৃতি দেওয়ার ফল জীবনের অধোগতি ১৬২
(প) বাল্যে প্রদত্ত অন্ধশিক্ষাই সকল কুসংস্কারকে পুরুষানুক্রমে স্থায়ী করে ১৬৩
(ফ) বাল্যশিক্ষা বিষয়ে পিতামাতার দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য ১৬৪
(ব) সত্যাসত্য নির্ণয়ে অন্ধবিশ্বাসীর মতামতের মূল্য নাই ১৬৫
(ভ) ব্রহ্মোপাসনা অন্ধবিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না ১৬৬
(ম) মন্ত্রশক্তিতে বিশ্বাস দেবপূজার **পঞ্চম অঙ্গ** ... ১৬৭
(য) ইহা গুরুতা ও পৌরোহিত্য আনয়ন করে ... ১৬৮
(র) দেবপূজা ও ব্রহ্মোপাসনা সর্ব্ববিষয়ে পরস্পরের বিপরীত ১৬৯

১৪। ব্রহ্মোপাসনা ও দেবপূজার মধ্যে সামঞ্জস্য সম্ভব কি না? ... ... ১৭০—৭৫

(ক) একেশ্বরবাদ দুই প্রকার—মিশ্র ও বিশুদ্ধ ... ১৭০
(খ) রামমোহন বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদী ছিলেন ... ১৭২
(গ) তিনি বেদান্ত-সূত্রের উপর বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন ১৭৩
(ঘ) মিশ্র একেশ্বরবাদের বিরুদ্ধে রামমোহনের মত ১৭৪
(ঙ) ব্রহ্মোপাসনা ও দেবপূজার মধ্যে সামঞ্জস্য অসম্ভব ১৭৫

১৫। সত্যধর্ম্ম কি? ... ... ১৭৬—৮৬

(ক) রামমোহন প্রকৃত হিন্দুধর্ম্মের রক্ষক ছিলেন ... ১৭৬
(খ) হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ রূপ বেদান্তসম্মত ব্রহ্মোপাসনা ১৭৭
(গ) রামমোহনের 'বেদান্ত-ধর্ম্মে' নীতির স্থান ... ১৭৯
(ঘ) ধর্ম্মের সার কি? ১৮০
(ঙ) বিশ্বজনীন ধর্ম্ম কাহাকে বলে? ... ১৮২

বিষয় পৃষ্ঠা

(চ) সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয় কি ? ১৮২
(ছ) রামমোহন প্রত্যেক ঐতিহাসিক ধর্ম্মের সম্প্রসারক ছিলেন ১৮৪
(জ) ভারতের ভাবী ধর্ম্ম ১৮৫

১৬। উপসংহার ... ...১৮৬—৯৫

(ক) রামমোহনের সংগ্রামনিরত বীরমূর্ত্তি ... ১৮৬
(খ) তাঁহার কান্ত কোমল মূর্ত্তি ১৮৭
(গ) তাঁহার স্বদেশ-বৎসল প্রেমিক মূর্ত্তি ... ১৮৯
(ঘ) দেশের লোক আজও তাঁহার প্রতি উদাসীন ও বিরূপ ১৮৯
(ঙ) তাঁহার পদাঙ্কানুসরণকারীদের প্রতিও বিরূপ ১৯০
(চ) ইহার কারণ পৌত্তলিকতা ১৯১
(ছ) পৌত্তলিকতা পরিত্যাগের জন্য শ্রোতৃবর্গকে আহ্বান ১৯২

প্রথম পরিশিষ্ট—ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্য ... ১৯৬

দ্বিতীয় পরিশিষ্ট—ব্রহ্মোপাসনা-প্রণালী ১৯৭—২০৮

(ক) ব্রহ্মোপাসনা সম্বন্ধীয় সাধারণ নিয়ম ... ১৯৭
(খ) উপাসনার প্রকার-ভেদ ১৯৭
(গ) উপাসনার বিবিধ অঙ্গ ১৯৮
(ঘ) আরাধনার দৃষ্টান্ত ২০১
(ঙ) প্রার্থনার দৃষ্টান্ত ২০৭
(চ) একটি প্রার্থনা-সঙ্গীত ২০৮
(ছ) একটি ব্রহ্মস্তোত্র ২০৮

রামমোহন রায় ও মূর্ত্তিপূজা

১। রামমোহনের ধর্ম্মসংস্কার কার্য্য।

(ক) রামমোহন বর্ত্তমান যুগের ব্রহ্মোপাসকদের ধর্ম্মগুরু।

"অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥"

অর্থ—অখণ্ডমণ্ডলাকার চরাচর জগৎকে ব্যাপ্ত করে' যিনি বর্ত্তমান, তাঁর পরম পদ যে ব্যক্তি প্রদর্শন করেছেন, সেই শ্রীগুরুকে নমস্কার করি।

বর্ত্তমান যুগের ভারতীয় ব্রহ্মোপাসকগণ যদি এই মন্ত্রের দ্বারা কারোকে অভিবাদন করতে চান, তবে মহাত্মা রামমোহন রায়কেই করতে হয়। কারণ, যে সময়ে আমাদের পূজনীয় পিতামহ-প্রপিতামহগণের মধ্যে সকলেই সর্ব্বব্যাপী পরমেশ্বরের জ্ঞান হারিয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবতার পূজায় তন্ময় হয়ে নিযুক্ত ছিলেন, তখন মহাত্মা রামমোহন রায়ই সর্ব্বপ্রথমে 'ভাব সেই একে, জলে স্থলে শূন্যে যে সমানভাবে থাকে' এই বলে' জলদগম্ভীর স্বরে তাঁদের আহ্বান করেছিলেন। প্রভাতের অরুণোদয় আসন্ন জেনে, মস্জিদের আজানদাতা যেমন সর্ব্বাগ্রে আপনি শুদ্ধ-শান্ত হয়ে, উচ্চ মঞ্চে আরোহণপূর্ব্বক সকলকে নমাজের জন্য আহ্বান করেন, রামমোহন রায় তেমনি ভারতের নূতন আলোকময় যুগের উষাকালে সকল জাতির, সকল সম্প্রদায়ের, লোককে জগৎপতি পরমেশ্বরের

উপাসনায় সম্মিলিত হতে আহ্বান করেছিলেন। তাঁর সেই গম্ভীর আহ্বান আজও ভারতাকাশে দিকে দিকে প্রতিধ্বনিত হচ্চে। তাঁর সেই আহ্বান না শুন্‌লে আমাদের মধ্যে কেহই জাগ্‌তাম কি না, ঈশ্বরকে এক বলে' বুঝ্‌তাম কি না, আত্মাঘ় দ্বারা তাঁর উপাসনা কর্‌তে শিখ্‌তাম কি না, কে বল্‌তে পারে? হয়ত বা আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ তাঁর প্রচারিত ব্রহ্মজ্ঞান গ্রহণ কর্‌তে যেমন সহস্র প্রকার আপত্তি উত্থাপন করেছিলেন, আমরাও আজ পর্য্যন্ত তাই কর্‌তাম। হয়ত বা তাঁরা যেমন তাঁকে ধর্ম্মের উচ্ছেদকারী ও দেশের শত্রু মনে করে' ঘৃণা করেছিলেন, নিন্দা করেছিলেন, ধিক্কার দান করেছিলেন, আমরাও আজ পর্য্যন্ত তাই কর্‌তাম। আজ যে আমরা উচ্ছ্বসিত হৃদয়াবেগে রামমোহনকে শ্রদ্ধাঞ্জলি দান কর্‌তে সক্ষম হচ্চি, তা তাঁর উপদেশে ব্রহ্মোপাসনা কিয়ৎপরিমাণে শিক্ষা করেছি বলে'। আমরা কতক লোক বুঝ্‌তে পেরেছি যে, এক ঈশ্বরের উপাসনায় মিলিত হওয়াই ভারতে জাতীয় একতা প্রতিষ্ঠিত কর্‌বার সর্ব্বোৎকৃষ্ট পথ; এক ঈশ্বরের উপাসনায় মিলিত হওয়াই মানবজাতির মহামিলনেরও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়।

(খ) ধর্ম্মসংস্কারই তাঁহার জীবনের সর্ব্বপ্রধান কার্য্য।

মহাত্মা রামমোহন রায় তাঁর কর্ম্মবহুল জীবনে সমাজ-সংস্কার, শাসনপদ্ধতি-সংস্কার, পাশ্চাত্যশিক্ষা-প্রচলন, বঙ্গসাহিত্যের উন্নতি প্রভৃতি নানা কার্য্যে শ্রম করেছিলেন; কিন্তু আশা করি, সকলেই এক বাক্যে স্বীকার কর্‌বেন যে, সকল কার্য্যের মধ্যে তাঁর প্রধান কার্য্য ছিল ধর্ম্মসংস্কার। তাঁর বাঙ্গালা, ইংরাজী ও পারসী গ্রন্থাবলীর প্রতি একবার দৃষ্টিপাত কর্‌লেই বোঝা যায়, ধর্ম্মসংস্কারে তাঁকে যতটা শক্তি, সময় ও অর্থ ব্যয় কর্‌তে হয়েছিল, তত আর কিছুতেই নয়।

(গ) হিন্দুধর্ম্মের সংস্কার কত কঠিন শ্রমসাধ্য ছিল।

ধর্ম্মসংস্কারের মধ্যেও দুইটি ধর্ম্মের সংস্কারে তাঁকে অধিক শ্রম কর্‌তে হয়েছিল—খ্রীষ্টধর্ম্ম ও হিন্দুধর্ম্ম। কিন্তু খ্রীষ্টীয় মিশনরি মহাশয়দের সঙ্গে তাঁর বিচার-বিতর্ক অপেক্ষাকৃত সহজ ছিল; কারণ তাঁরা একমাত্র বাইবল্‌ গ্রন্থকেই অভ্রান্ত শাস্ত্র মনে করতেন। রামমোহন রায় ঐ গ্রন্থখানাকে এবং তার আদিম হিব্রু ও গ্রীক সংস্করণকে ও টীকা-টিপ্পনীকে আয়ত্ত করেই তাঁদের সম্মুখীন হতে পেরেছিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত মহাশয়দের সহিত বিচার তত সহজ হয় নি; কারণ, তাঁদের 'অভ্রান্ত শাস্ত্র' ত একখানা দুখানা নয়! মন্ত্র, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষৎ সম্বলিত চারি বেদ হতে আরম্ভ করে' সূত্র, সংহিতা, স্মৃতি, পুরাণ, উপপুরাণ, ইতিহাস, তন্ত্র, আগম প্রভৃতি অগণ্য গ্রন্থের প্রত্যেক খানাই তাঁদের 'ঋষিবাক্য', সুতরাং 'অভ্রান্ত শাস্ত্র'। তাঁদের ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় মতামতে পরিবর্ত্তন আন্‌তে হলে, এর কোনওটির সম্বন্ধেই অনভিজ্ঞ থাক্‌লে চলে না। রামমোহন তাঁর বিচার-গ্রন্থসকলে কত শাস্ত্র হতে যে বচন উদ্ধৃত করে' প্রতিপক্ষের যুক্তি খণ্ডন করেছেন, তা দেখ্‌লে বিস্মিত হতে হয়। কত দীর্ঘকালের কঠিন পরিশ্রমে তাঁকে এ সকল আয়ত্ত কর্‌তে হয়েছিল! দ্বাদশ বৎসর বয়সে কাশীতে গমন করে' সেই যে শাস্ত্রাধ্যয়ন আরম্ভ করেছিলেন, পরিণত বয়স পর্য্যন্ত, যখন যেখানে ছিলেন, তাঁর সেই অধ্যয়নের বিরাম হয় নি। এই অসাধারণ পরিশ্রম তিনি এই উদ্দেশ্যেই করেছিলেন যে, তাঁর দেশবাসী বহু-দেববাদ, মূর্ত্তিপূজা ও অর্থহীন আচার-বিচার পরিত্যাগ করে', পূর্ব্বকালের মুনিঋষিদের উপদিষ্ট জ্ঞানমূলক একেশ্বরবাদ গ্রহণ করবে এবং সাক্ষাৎ ভাবে জগৎপতি পরমেশ্বরের উপাসনা অবলম্বন করে জ্ঞানে, ভক্তিতে, চরিত্রে ও নরসেবায় উন্নত হয়ে, জগতে শ্রেষ্ঠজাতি রূপে গণ্য হবে

(ঘ) কি কি ভাব লইয়া তিনি ঐ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

কি কি মহৎ ভাব নিয়ে রামমোহন রায় হিন্দুধর্ম্মের সংস্কার-কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, তার কিঞ্চিৎ আলোচনা আবশ্যক। ঈশোপনিষদের ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ কালে তার ভূমিকায় (W. 73) তিনি এ বিষয়ে যা বলেছিলেন, তার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই—'মানুষের দেহ যদিও এই বিপুল জগতের তুলনায় অতি ক্ষুদ্র, এবং তার আয়ুষ্কাল যদিও বিশ্ব-জগতের আয়ুর তুলনায় অতি সংক্ষিপ্ত, তথাপি মানুষের নৈতিক শক্তি অতি মহৎ ; আর সেই নৈতিক শক্তির উপযুক্ত পরিচালনা দ্বারা যে শুভফল উৎপন্ন হয়, তার মূল্যও অনেক। অপর দিকে, যে ব্যক্তি মানবের হিত-সাধনের বিবিধ সুযোগ লাভ করে'ও সে-সকলকে অবহেলা করে, পরিণামে তার গভীর মনোবেদনা উপস্থিত হওয়া অনিবার্য্য। এই প্রকার চিন্তার ফলে, আমি ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করে'ও, এবং বাল্যাবধি সেই সম্প্রদায়ের সকল ধর্ম্মমতে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়েও, দেশবাসীর শোচনীয় ভ্রমসকল পূর্ণভাবে হৃদয়ঙ্গম করেছি ; এবং তাঁদের, মানসিক উন্নতির জন্য ও তাঁদিগকে বিশুদ্ধতর নীতির পথ প্রদর্শনের জন্য নিজের সকল শক্তি নিয়োগ করতে উৎসাহিত হয়েছি। বিভিন্ন মতাবলম্বী নানা সম্প্রদায়ের হিন্দুদের সঙ্গে সর্ব্বদা বাস করে' আমার দেখ্‌বার যথেষ্ট সুযোগ হয়েছে যে, স্বার্থপর নেতাদের দ্বারা প্ররোচিত হয়ে তাঁরা শাস্ত্রবিরুদ্ধ ও যুক্তিবিরুদ্ধ কত-কিছু বালকোচিত কুসংস্কারে নিপতিত হয়েছেন। ঐ সকল নেতা তাঁদিগকে পৌত্তলিকতার মন্দিরে নিয়ে গিয়েছেন, এবং নীতিমূলক ধর্ম্মের সার বস্তু গোপন করে' তার ছায়ামাত্রের প্রতি তাঁদের সরল হৃদয়ে একটা হীন আসক্তি উৎপন্ন করেছেন।'

কঠোপনিষদের ইংরাজী অনুবাদের ভূমিকাতেও (W. 46) রামমোহন রায় বলেছিলেন—'যে পরম পুরুষ আমাদের সকল কার্য্যের হৃদ্‌গত অভিসন্ধি দেখেন ও অন্তরের সকল ভাব জানেন, তাঁর দয়ার উপর নির্ভর করে', সত্যকে সমর্থন কর্‌বার ও বোঝাবার চেষ্টা করা, এবং এই ক্ষেত্রে যাঁরা সহকর্ম্মী তাঁদের সহায়তা করা, এই দুই কার্য্যে নিযুক্ত থাকাই আমার কাছে সময়ের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্যবহার বলে' মনে হয়।'

বেদান্তসারের ইংরাজী অনুবাদের ভূমিকাতেও (W. 5) রামমোহন রায় পৌত্তলিকতার বিবিধ কুফল বর্ণনা করে' পরিশেষে বলেছিলেন যে, দেশবাসীদের দুঃখে সমবেদনাই তাঁর শাস্ত্রগ্রন্থসকল প্রকাশে ও ধর্ম্মসংস্কারে প্রবৃত্ত হবার কারণ।

অতএব, উন্নত কর্ত্তব্যজ্ঞানই রামমোহনকে স্বদেশের ধর্ম্মসংস্কার কার্য্যে প্রবৃত্ত করেছিল, এতে কোনও সন্দেহ নেই।

(৬) মূর্ত্তিপূজার বিরুদ্ধে তাঁহার সংগ্রামের কারণ।

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্য্য নামক এক বিখ্যাত পণ্ডিত 'বেদান্তচন্দ্রিকা' নামে একখানা পুস্তক রচনা করে' এবং তার ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করে' রামমোহন রায়ের ব্রহ্মোপাসনা-বিষয়ক মতের প্রতিবাদ করেছিলেন। রামমোহন রায়ও বাঙ্গালা ও ইংরাজী উভয় ভাষায় তার উত্তর দিয়েছিলেন। বাঙ্গালা উত্তর 'ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচার' নামে, এবং ইংরাজী উত্তর 'A Second Defence of the Monotheistic System of the Veds' এই নামে খ্যাত। এই দুই উত্তর হতে পরে আমাকে অনেক কথা উদ্ধৃত কর্‌তে হবে; এ জন্য এ স্থলেই বলে' রাখি যে, ইংরাজী উত্তরটি বাংলা উত্তরের অবিকল অনুবাদ নহে; তাতে স্থানে স্থানে কোনও কোনও কথা অধিক বা অল্প আছে। যা

হোক্, ঐ ইংরাজী উত্তরে রামমোহন রায়ের মূর্ত্তিপূজার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হবার কারণ পাওয়া যায়। রামমোহন রায় প্রচলিত ধর্ম্মের প্রতি অকারণে আক্রমণ করুচেন, এই ভেবে ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁর গ্রন্থে প্রশ্ন করেছিলেন—অন্যে নিজ ব্যয়ে ও নিজ পরিশ্রমে মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করে' পূজা করে; তাতে তোমরা কেন মর্ম্মান্তিক ব্যথা পাও? এর উত্তরে রামমোহন রায় মূর্ত্তিপূজার বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হবার তিনটি কারণ দিয়েছিলেন। সেই কারণগুলি সংক্ষেপে এই (W. 116):—প্রথম, যে ব্যক্তি স্বার্থ নিয়ে একান্ত অভিভূত হয়ে না থাকে, অন্যের দুঃখ দেখ্‌লে তার দয়া হওয়া স্বাভাবিক; এতে তার নিজের কোনও হাত নেই। দ্বিতীয়, আমার দেশবাসীরা শাস্ত্রের উপদেশ অমান্য করে' মূর্ত্তিপূজা করেন; অনেক সময় অতিশয় ব্রীড়াজনক মূর্ত্তি প্রস্তুত করে' কদর্য্য ভাষায় এবং অশ্লীল সঙ্গীত ও অঙ্গভঙ্গী সহকারে তার আরাধনা করেন। এ সকল কার্য্যের ফলে তাঁরা যে নিন্দা ও বিদ্রূপের ভাজন হন, তার অংশী আমাকেও হতে হয়। তৃতীয়, মানুষের প্রতি মানুষের যে কর্ত্তব্য আছে, তার প্রেরণায় বাধ্য হয়ে আমাকে দেশবাসীর কল্যাণের জন্য প্রাণপণ খাট্‌তে হয়। আমার দেশবাসীরা যে আত্মবঞ্চনা ও হীনতার মধ্যে রয়েছেন, তা হতে তাঁদের উদ্ধার করবার জন্য এবং তাঁদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করবার উদ্দেশ্যে শ্রম না করে' আমি পারি না। এই তিন কারণে আমি মূর্ত্তিপূজার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করি।

(চ) অপরের ধর্ম্মবিশ্বাসের সমালোচনা অন্যায় কি না?

কিন্তু প্রশ্ন হতে পারে, প্রত্যেক মানুষই ত আপন বিশ্বাস ও রুচি অনুসারে ধর্ম্মানুষ্ঠান করবার অধিকারী। সে অনুষ্ঠানকে তোমার যদি

ভ্রান্তিপূর্ণ বা অনিষ্টকর মনে হয়, তুমি তা করো না। তুমি নীরবে দর্শন না করে', কেন অপরের বিশ্বাসের ও কার্য্যের সমালোচনা কর্‌তে অগ্রসর হও? এর উত্তর পূর্ব্বেই এক প্রকার দেওয়া হয়েছে। কিন্তু রামমোহন খ্রীষ্টীয় মিশনরিদের সহিত বিচারকালে যে উত্তর দিয়েছিলেন, তা আরও স্পষ্ট; এ জন্য সেটিও উল্লেখ কর্‌চি। তিনি তাঁর 'Final Appeal to the Christian Public' গ্রন্থের ভূমিকায় (W. 682) বলেছিলেন যে, মানুষ সামাজিক জীব; এক জনের মঙ্গলামঙ্গল অপর জনকে সর্ব্বদাই স্পর্শ করে। অতএব, কি গার্হস্থ্যবিষয়ক, কি রাষ্ট্রনীতিবিষয়ক, কি ধর্ম্মবিষয়ক, যে কোনও প্রথা মানবসমাজের পক্ষে অনিষ্টকর, অথবা যাতে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির অধোগতি হয়, তার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়া অন্যায় নয়। তবে সর্ব্বদাই স্মরণ রাখ্‌তে হবে যে, আমরা সকলেই এক পিতার সন্তান।

(ছ) সত্যের জয়ে বিশ্বাস সংস্কারকের বল।

তথাপি, অপ্রিয় সত্য সর্ব্বদাই বিরুদ্ধ ভাব উৎপন্ন করে, এবং মিত্রকেও শত্রু করে' তোলে। এ জন্য প্রত্যেক সংস্কারককেই জীবিতকালে নিন্দিত, ঘৃণিত ও উৎপীড়িত হতে হয়। কিন্তু তাঁরা এই বিশ্বাসে কার্য্য করেন যে, সত্যের জয় হবেই হবে। আজ যারা উত্তেজিত ও খড়্গহস্ত, উত্তেজনা প্রশমিত হলে, কাল তারা চিন্তা করে' দেখ্‌বে; এবং পরশু তারা আস্তে আস্তে সত্যকে গ্রহণ কর্‌বে। রামমোহন রায়ের অন্তরে এ বিশ্বাস ছিল। বেদান্ত গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি বলেছিলেন (গ্র, ৭)—

"প্রায়শ আমারদের মধ্যে এমত সুবোধ উত্তম ব্যক্তি আছেন যে, কিঞ্চিৎ মনোনিবেশ করিলে এ সকল কাল্পনিক হইতে চিত্তকে নিবর্ত্ত করিয়া সর্ব্বসাক্ষী সদ্রূপ পরব্রহ্মের প্রতি

চিত্ত নিবেশ করেন, এবং এ অকিঞ্চনকে পরে পরে তুষ্ট হয়েন। আমি এই বিবেচনায় এবং আশাতে তাঁহারদের প্রসন্নতা উদ্দেশ্যে এই যত্ন করিলাম।"

বেদান্তসারের ইংরাজী অনুবাদের ভূমিকায় রামমোহন রায় বলেছিলেন (W. 5)—'আমি ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করে' বিবেক ও সত্যনিষ্ঠার বশবর্ত্তী হয়ে যে পথ অবলম্বন করেছি, তাতে আমাকে আমার ঘোর কুসংস্কারাচ্ছন্ন আত্মীয়গণের অপ্রিয় ও তিরস্কারভাজন হতে হয়েছে। কারণ প্রচলিত ধর্ম্মের সঙ্গে তাঁদের ঐহিক সুখসুবিধার সংশ্রব আছে। কিন্তু তাঁদের সে সব তিরস্কার যতই পুঞ্জীভূত হোক্, আমি এই বিশ্বাসে সমুদয় ধীরচিত্তে বহন করতে পারি, যে, এমন দিন আস্‌বে, যখন লোকে আমার এই সামান্য চেষ্টাকে ন্যায়দৃষ্টিতে দেখ্‌বে এবং হয়ত কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করবে। মানুষ যাই বলুক্, আমি অন্ততঃ এই সান্ত্বনাটুকু হতে বঞ্চিত হব'না, যে,'আমার অন্তরের অভিসন্ধি সেই পরম পুরুষের নিকট গ্রাহ্য, যিনি গোপনে দর্শন করে' প্রকাশ্যে পুরস্কার দান করেন।'

সত্যে এরূপ সুদৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে, বিধাতার প্রতি এরূপ নিশ্চিত নির্ভর রেখে এবং দেশবাসীর সম্বন্ধে এরূপ উজ্জ্বল আশা হৃদয়ে পোষণ করে' রামমোহন রায় কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। তাঁর সেই বিশ্বাস জয়ী হয়েছে, সেই নির্ভর সত্য প্রতিপন্ন হয়েছে, এবং সেই আশাও কিয়ৎ-পরিমাণে সফল হয়েছে। আজ দেশবাসীদের মধ্যে অনেকে বাস্তবিকই তাঁর শ্রমকে ন্যায়দৃষ্টিতে দেখ্‌চেন এবং কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করচেন। যাঁরা আজও বিরুদ্ধ ভাব নিয়ে আছেন, তাঁর প্রদর্শিত আদর্শকে শান্ত মনে চিন্তা করতে ও সাহসের সহিত গ্রহণ করতে সক্ষম হচ্চেন না, তাঁরাও কালে চিন্তা করবেন এবং গ্রহণ করবেন; এতে কিছুমাত্র সংশয় নেই।

(জ) রামমোহনের বিরুদ্ধে আন্দোলনের প্রধান কারণ।

রামমোহন রায় শাস্ত্রের প্রমাণ হাতে নিয়ে এ দেশের প্রচলিত ধর্ম্মের সংস্কারে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। শাস্ত্রের প্রমাণ নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন বলেই ব্রাহ্মণপণ্ডিতদের মধ্যে সাড়া পড়্‌ল এবং সকলে তাঁর সঙ্গে বিচারে প্রবৃত্ত হলেন। তা না হলে, কত লোক কত কথা বলে, কত প্রকার আচরণ করে, পণ্ডিতেরা ত সে সকলের প্রতি ভ্রূক্ষেপও করেন না। তাঁরা সে সকলকে 'ম্লেচ্ছাচার' বলে' অবজ্ঞা করেই নিশ্চিন্ত থাকেন। রামমোহন শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে ব্রহ্মজ্ঞান প্রচারে নিযুক্ত হয়েছিলেন, এইটিই তাঁর বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন উপস্থিত হবার প্রধান কারণ।

(ঝ) শাস্ত্র ও যুক্তি উভয়ই সত্য নির্ণয়ের উপায়।

কিন্তু শাস্ত্রের দোহাই দিয়েছিলেন বলে' তিনি যে স্বয়ং শাস্ত্রবাক্য-মাত্রকেই অবিচারে মান্য কর্‌তেন, তা নয়। যুক্তিহীন ও অনিষ্টকর শাস্ত্রবাক্যকে তিনি অন্য উৎকৃষ্টতর শাস্ত্রবাক্য দ্বারা খণ্ডন কর্‌তেন। শাস্ত্র ও যুক্তি উভয়ের সাহায্যে সত্যে উপনীত হতে হবে, এই তাঁর সুচিন্তিত মত ছিল। তাঁর সংস্কার-কার্য্যের সূচনা কালে (১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে) হিন্দু-শাস্ত্রের যে পুস্তক (বেদান্ত গ্রন্থ) তিনি সর্ব্বপ্রথম বঙ্গানুবাদ সহ প্রকাশ করেছিলেন, তারই 'অনুষ্ঠান' নামক মুখবন্ধে তিনি বলেছিলেন (গ্র, ১২)—

"আমাদিগ্যের উচিত যে, শাস্ত্র এবং বুদ্ধি উভয়ের নির্দ্ধারিত পথের সর্ব্বথা চেষ্টা করি; এবং ইহার অবলম্বন করিয়া ইহ-লোকে পরলোকে কৃতার্থ হই।"

কেনোপনিষদের ইংরাজী অনুবাদের ভূমিকাতেও (W. 37) তিনি এই কথাই বলেছিলেন; এবং তাতে শাস্ত্র ও যুক্তির সঙ্গে ভগবৎ-কৃপাকেও যোগ করেছিলেন। তিনি সেখানে যা বলেছিলেন, তার সার

মর্ম্ম এই—'আমি অনেক সময় এই বলে' দুঃখ করেছি যে, ধর্ম্মবিষয়ক সত্যের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হলে আমাদিগকে বহু বাধাবিঘ্নের সম্মুখীন হতে হয়। যখন আমরা প্রাচীন জাতিসকলের পরম্পরাগত শাস্ত্রসমূহের প্রতি দৃষ্টি করি, তখন প্রায়ই দেখ্‌তে পাই যে, সে সকল শাস্ত্র পরস্পরের বিরোধী। আবার, এই দেখে' নিরুৎসাহ হয়ে যখন আমরা যুক্তিকে উৎকৃষ্টতর সহায় বলে' আশ্রয় করি, তখন অবিলম্বে দেখি, কেবলমাত্র যুক্তিও অভীষ্ট বস্তুর সমীপে আমাদের নিয়ে যেতে অক্ষম। অনেক সময় দেখা যায়, যুক্তি আমাদের চেষ্টার সহায় না হয়ে, অথবা সন্দেহসকলের নিরাকরণ না করে', বরং সর্ব্ববিষয়ে ঘোর সংশয় জন্মিয়ে দেয়; যে সকল তত্ত্বের উপরে আমাদের সুখ-শান্তি বহু পরিমাণে নির্ভর করে, তাদেরই প্রতি অনাস্থা উৎপন্ন করে। অতএব, সর্ব্বোৎকৃষ্ট পন্থা বোধ হয় এই যে, শাস্ত্র ও যুক্তি এ দুয়ের কোনও একটির হস্তে আপনাদের সম্পূর্ণ সমর্পণ না করে', উভয়ের প্রদত্ত আলোকের যথাযথ ব্যবহার দ্বারা আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও নৈতিক জ্ঞানকে উজ্জ্বল করা; এবং সেই সঙ্গে সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরের মঙ্গলভাবের উপরে নির্ভর রাখা। আমরা ব্যগ্র ভাবে ও পরিশ্রম সহকারে যে বস্তুর অন্বেষণ করি, একমাত্র তাঁর কৃপাই সেই বস্তুর লাভে আমাদের সক্ষম কর্‌তে পারে।'

রামমোহন তাঁর বিচার-গ্রন্থ সকলে বৃহস্পতির এই বচনটি স্থানে স্থানে উদ্ধৃত করেছেন (W. 397):—

"কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যোঽর্থনির্ণয়ঃ।
যুক্তিহীন বিচারেণ ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে॥"

অর্থ—কেবল শাস্ত্রকে আশ্রয় করে' কোনও বিষয়ের মীমাংসা করা উচিত নয়; যুক্তিহীন বিচারের ফলে ধর্ম্মহানি উৎপন্ন হয়।

২। রামমোহনের শাস্ত্রীয় বিচারের পদ্ধতি।

(ক) শাস্ত্রীয় বিচারে রামমোহনের দাঁড়াইবার ভূমি।

কিন্তু তখনকার পণ্ডিতেরা শাস্ত্রবাক্যে এমন তন্ময় ও আত্মহারা ছিলেন যে, শাস্ত্রের প্রমাণ ভিন্ন নিতান্ত সহজ সরল সত্যও তাঁরা স্বীকার করতে প্রস্তুত ছিলেন না। সুতরাং তাঁদের সঙ্গে বিচারে রামমোহনকে যুক্তির অপেক্ষা শাস্ত্রের দোহাই-ই অধিক দিতে হয়েছিল। কিন্তু সর্ব্ব-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত রামমোহন পূর্ব্বেই আপনার দাঁড়াবার ভূমিটি বিশেষ দক্ষতার সহিত নির্ব্বাচন করে' নিয়েছিলেন। সেই ভূমিটি এমনই সুদৃঢ় ও নিরাপদ যে, যে দিক্ হতে যত বড় পণ্ডিতই আক্রমণ করুন না কেন, তথা হতে তাঁকে বিচলিত কর্‌তে পারেন, এমন সাধ্য কারো ছিল না। সমুদ্রের মধ্যে এমন এক একটি পর্ব্বত থাকে যে, সহস্র উত্তাল তরঙ্গ চার দিক্ থেকে এসে আঘাত করে'ও কোনও দিন তার কিছু কর্‌তে পারে না; বরং নিজেরাই চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে ফিরে' যায়। ভারতীয় শাস্ত্রসিন্ধুতে এরূপ একটি সুদৃঢ় পর্ব্বত আছে; রামমোহন তারই উপর দাঁড়িয়েছিলেন। সে পর্ব্বতটির নাম কি, কেহ কি জিজ্ঞেস্ কর্‌চেন? সে পর্ব্বতটির নাম 'ব্রহ্মজ্ঞান'। সমুদ্রের কুক্ষিতেই যে পর্ব্বতের জন্ম ও বৃদ্ধি হয়েছে, কালক্রমে সমুদ্র স্বয়ং যদি তাকে পর ভাব্‌তে আরম্ভ করে এবং তরঙ্গমালা উত্তোলিত করে' আঘাতের পর আঘাত দ্বারা তাকে দূর করে' দিতে চায়, তা হলে কি সেই পর্ব্বত চলে' যায়? না; সে অটল হয়ে সমুদ্রেরই বক্ষঃস্থলে নির্ভয়ে দণ্ডায়মান থাকে। ভারতীয় সভ্যতার স্থায়ী ফল 'ব্রহ্মজ্ঞান' অগাধ শাস্ত্রসিন্ধুর মধ্যস্থলে চিরদিন এইরূপে দাঁড়িয়ে আছে। কালে কালে শ্লোক-বচনের অনেক

তরঙ্গ তার বিরুদ্ধে আস্ফালন করে' এসেছে; কিন্তু তার কোনও ক্ষতি কখনও কর্‌তে পারে নি।

আমি কি উপমার সাহায্যে ব্রহ্মজ্ঞানের মহত্ত্ব বাড়াচ্চি? সেরূপ সংশয় যদি কেহ করেন, তবে শ্রবণ করুন, ভারতীয় শাস্ত্রে ব্রহ্মজ্ঞানের স্থান কি, এবং রামমোহন রায় শাস্ত্রীয় বিচারে কিরূপ অপরাজেয় ভূমিকে আশ্রয় করেছিলেন।

(খ) শাস্ত্রীয় বিচারের নিয়ম—কয়েকটি মূল-সূত্র।

শাস্ত্র অনন্ত। খণ্ড খণ্ড ভাবে দেখ্‌লে তাতে পরস্পর-বিরোধী অনেক কথাই পাওয়া যায়। সত্য-মিথ্যা এমন মত নেই, সৎ-অসৎ এমন কার্য্য নেই, যা শাস্ত্রের বচন উদ্ধৃত করে' সমর্থন করা যায় না। অতএব পণ্ডিত-মণ্ডলীর মধ্যে সর্ব্বজন-স্বীকৃত কতকগুলি নিয়ম আছে, যদ্দারা পরস্পর-বিরোধী শাস্ত্রবাক্যসকলের সামঞ্জস্য করা যায়, অথবা কোন্‌টি গ্রাহ্য ও কোন্‌টি অগ্রাহ্য, নির্ণয় করা যায়। রামমোহন রায় সে সকল নিয়ম শাস্ত্র হতেই আবিষ্কার করেছিলেন এবং পণ্ডিতগণের নিকট হতেও জেনে নিয়েছিলেন; আর সে সকলেরই সাহায্যে পূর্ব্ব হতে আপন দুর্গকে অনাক্রম্য করে' রেখেছিলেন। সেই মূল-সূত্রগুলি কোনও প্রাচীন গ্রন্থে এক স্থানে লিখিত আছে কি না, জানি না। রামমোহন রায়ও তাঁর কোনও গ্রন্থে সেগুলি একত্র ব্যক্ত করেন নি; কেবল প্রয়োজন অনুসারে নানা স্থানে উল্লেখ করেছেন মাত্র। আমি সেগুলি আপনাদের অবগতির জন্য নিম্নে একত্র বিবৃত কর্‌চি। তাতে দেখ্‌তে পাবেন, রামমোহন রায়ের ব্রহ্মজ্ঞান-রূপ দুর্গ বাস্তবিকই অনাক্রম্য ছিল কি না।

(গ) প্রথম সূত্র—পুরাণতন্ত্রাদি প্রসিদ্ধ টীকাবিশিষ্ট বা মহাজন-ধৃত না হইলে অপ্রামাণ্য।

প্রথম সূত্র—অগণ্য পুরাণতন্ত্রাদির মধ্যে যে সকল গ্রন্থের প্রসিদ্ধ টীকা আছে, অথবা যার বচন মহাজনগণকর্তৃক উদ্ধৃত হয়েছে, কেবল সেগুলিই প্রামাণ্য।

এ বিষয়ে ব্রাহ্মণ-সেবধির দ্বিতীয় সংখ্যায় (গ্র, ৪৭০—৭১) রামমোহন বল্‌চেন—"তন্ত্র শাস্ত্রের অন্ত নাই। সেইরূপ মহাপুরাণ ও পুরাণ ও উপপুরাণ এবং রামায়ণাদি গ্রন্থ অতি বিস্তার। এ নিমিত্ত শিষ্ট-পরম্পরা নিয়ম এই, যে যে পুরাণ ও তন্ত্রাদির টীকা আছে ও যে যে পুরাণাদির বচন মহাজন-ধৃত হয়, তাহারি প্রামাণ্য। অন্যথা পুরাণের অথবা তন্ত্রের নাম করিয়া বচন কহিলে প্রামাণ্য হয়, এমৎ নহে। অনেক পুরাণ ও তন্ত্রাদি যাহার টীকা নাই ও সংগ্রহকারের ধৃত নহে, তাহা আধুনিক হইবার সম্ভব আছে। কোনো কোনো পুরাণতন্ত্রাদি এক দেশে চলিত আছে, অন্য দেশীয়েরা তাহাকে কাল্পনিক কহেন। বরঞ্চ এক দেশেই কতক লোক কাহাকে মান্য করেন, কতক লোক নবীন কৃত জানিয়া অমান্য করেন। অতএব সটীক কিম্বা মহাজন-ধৃত পুরাণ-তন্ত্রাদির বচন মান্য হয়েন।"

তবেই দেখুন, শাস্ত্র নামে কথিত অনেক গ্রন্থের প্রামাণ্য লোপ হয়ে গেল।

(ঘ) দ্বিতীয় সূত্র—পুরাণতন্ত্রাদি বেদার্থের বিরোধী হইলে অপ্রামাণ্য।

দ্বিতীয় সূত্র—প্রামাণ্য পুরাণ বা তন্ত্রের মধ্যেও যদি বেদার্থের বিরোধী কোনও বাক্য থাকে, তবে সে বাক্য অগ্রাহ্য।

এ সম্বন্ধে রামমোহন বলছেন (গ্র, ৪৭১, ৬২১)—"গ্রন্থের মান্যামান্যের সাধারণ নিয়ম এই, যে সকল গ্রন্থ বেদবিরুদ্ধ অর্থ কহে, তাহা অপ্রমাণ।"

তিনি এ কথার সমর্থনে শাস্ত্রবাক্য উদ্ধৃত করেছেন। যথা—

"যা বেদবাহ্যাঃ স্মৃতয়ো যাশ্চ কাশ্চ কুদৃষ্টয়ঃ।
সর্ব্বাস্তা নিষ্ফলা প্রেত্য তমোনিষ্ঠা হি তাঃ স্মৃতাঃ॥" মনু।

অর্থ—যে সকল স্মৃতি বেদার্থের বহির্ভূত, এবং যা-কিছু কুদৃষ্টিসম্পন্ন, সে সকল তামসিক বলে' গণ্য। পরলোকে সে সমুদয় নিষ্ফল হয়।

"শ্রুতি স্মৃতি বিরোধে তু শ্রুতিরেব গরীয়সী।
অবিরোধে সদা কার্য্যং স্মার্ত্তং বৈদিকবৎ সতা॥"

স্মার্ত্তধৃত বচন।

অর্থ—শ্রুতিবাক্য ও স্মৃতিবাক্যে বিরোধ হলে, শ্রুতিবাক্যই মান্য। বিরোধ না থাকলে সজ্জনেরা স্মৃতিবাক্যকে বেদবাক্যের ন্যায় পালন করবেন।

(ঙ) তৃতীয় সূত্র—যে বিদ্যা দ্বারা ব্রহ্মকে জানা যায়, তাহাই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা।

তবে ত শ্রুতি অর্থাৎ বেদই সর্ব্বপ্রধান শাস্ত্র। কিন্তু বেদেও ত কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড উভয়ই আছে। কর্ম্মকাণ্ডে ত বহু দেবতার বর্ণনা

ও তাঁদের উদ্দেশে বহুপ্রকার যাগযজ্ঞের বিধি দেখা যায়। পক্ষান্তরে জ্ঞানকাণ্ডে একমাত্র পরব্রহ্মের উপাসনারই প্রেরণা আছে। এ উভয়ের সামঞ্জস্য কোথায়?

এ বিষয়ে তৃতীয় সূত্র এই—যে বিদ্যা দ্বারা অক্ষর পরব্রহ্মকে জানা যায়, তাই পরা বিদ্যা; তদ্ভিন্ন সকলই অপরা অর্থাৎ অশ্রেষ্ঠ বিদ্যা।

এই সূত্র কি রামমোহন রায় নিজ মতের দৃঢ়তার জন্য স্বয়ং রচনা কর্লেন? না। তিনি বেদ হতেই সূত্রটি উদ্ধৃত করেছেন (গ্র, ১৯৩, ৫৯৮)। বেদ নিজেই বল্‌চেন—"অপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি, অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে।" —মুণ্ডক, ১।১।৫

অর্থ—ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ, জ্যোতিষ, এই সকলই অশ্রেষ্ঠ বিদ্যা। সে বিদ্যাই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা, যদ্দ্বারা সেই অক্ষর পুরুষকে জানা যায়।

অতএব, চারি বেদের সেই সকল অংশই অধিক মান্য, যাতে ব্রহ্ম-বিষয়ক উপদেশ আছে।

রামমোহন রায় এই প্রসঙ্গে ভগবদ্‌গীতার দশম অধ্যায় হতে এই এই বাক্যাংশও উদ্ধৃত করেছেন:—"অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাং"—'বিদ্যা সকলের মধ্যে আমি অধ্যাত্ম বিদ্যা'; অর্থাৎ পরমাত্ম-বিষয়ক বিদ্যাই সকল বিদ্যার মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

(চ) সকল বেদের প্রতিপাদ্য—পরব্রহ্ম।

সকল বেদের সার সিদ্ধান্ত কি, এ বিষয়ে রামমোহন বেদান্ত গ্রন্থের ভূমিকায় বল্‌চেন (গ্র, ১)—"বেদের পুনঃ পুনঃ প্রতিজ্ঞার দ্বারা এবং বেদান্ত শাস্ত্রের বিবরণের দ্বারা এই প্রতিপন্ন

হইয়াছে যে, সকল বেদের প্রতিপাদ্য সদ্রূপ পরব্রহ্ম হইয়াছেন।"

তবে বেদের কোনও কোনও অংশে রূপগুণবিশিষ্ট দেবতাকে এবং মনুষ্যকে ব্রহ্মরূপে বর্ণন করা হল কেন? এর উত্তরে রামমোহন বল্‌চেন (গ্র, ২)—**"ব্রহ্ম সর্ব্বময় হয়েন, তাঁহার অধ্যাস করিয়া সকলকে ব্রহ্মরূপে স্বীকার করা যায়। পৃথক্ পৃথক্‌কে সাক্ষাৎ ব্রহ্ম বর্ণন করা বেদের তাৎপর্য্য নহে। এই মত সিদ্ধান্ত বেদ আপনি অনেক স্থানে করিয়াছেন।"**

'অধ্যাস' সম্বন্ধে পরে আরও বলা যাবে [৫ (ঝ) দ্রষ্টব্য]।

কেনোপনিষদের ইংরাজী অনুবাদের ভূমিকায় (W. 36) রামমোহন বল্‌চেন যে, প্রত্যেক বেদের প্রথমাংশে বহু দেবদেবীর বর্ণনা আছে; কিন্তু শেষাংশে সেই বহুদেববাদের বিরুদ্ধে বলা হয়েছে। কেবল তা নয়, সে সকল বর্ণনা কেন করা হল, তার কারণও দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে যে, যারা অদৃশ্য পরব্রহ্মের ধারণা কর্‌তে ও তাঁর উপাসনা কর্‌তে অসমর্থ, তারা যাতে সকল ধর্ম্ম হ'তে বঞ্চিত হয়ে পশুত্বের অবস্থায় না থাকে, সেই উদ্দেশ্যে ঐ সকল রূপক বর্ণনা। বেদ স্বয়ং এবং বেদার্থের নির্ণয়কর্ত্তা সুপ্রসিদ্ধ ব্যাস ঋষি এইরূপে বেদসমূহের পরস্পর-বিরোধী স্থলসকলের সামঞ্জস্য করেছেন। সেই মীমাংসা যদি গ্রহণ করা না যায়, তবে সমগ্র বেদ একান্ত অবোধ্য হয়ে পড়ে, এবং তার প্রামাণ্যও লোপ পায়।

(ছ) পুরাণতন্ত্রাদিরও প্রতিপাদ্য—পরব্রহ্ম।

উপরে যে সূত্রের উল্লেখ করা হয়েছে (অর্থাৎ যে বিদ্যা দ্বারা অক্ষর পুরুষকে জানা যায়, তাই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা), তদনুসারে পুরাণতন্ত্রাদির মধ্যেও

সেই সকল অংশই অধিক মান্য, যাতে ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ আছে। এ বিষয়ে রামমোহন রায় ঈশোপনিষদের ভূমিকায় (গ্র, ১৪৫-৪৬) বল্‌চেন—
"পুরাণ এবং তন্ত্রাদি অবশ্য শাস্ত্র বটেন; যেহেতু পুরাণ এবং তন্ত্রাদিতেও পরমাত্মাকে এক এবং বুদ্ধিমনের অগোচর করিয়া পুনঃ পুনঃ কহিয়াছেন। তবে পুরাণেতে এবং তন্ত্রাদিতে সাকার দেবতার বর্ণন এবং উপাসনার [বিবরণ] যে বাহুল্য মতে লিখিয়াছেন, সে প্রত্যক্ষ বটে। কিন্তু ঐ পুরাণ এবং তন্ত্রাদি সেই সাকার বর্ণনের সিদ্ধান্ত আপনিই পুনঃ পুনঃ এইরূপে করিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি ব্রহ্ম-বিষয়ের শ্রবণমননেতে অশক্ত হইবেক, সেই ব্যক্তি দুষ্কর্ম্মে প্রবর্ত্ত না হইয়া রূপকল্পনা করিয়াও উপাসনার দ্বারা চিত্ত স্থির রাখিবেক। পরমেশ্বরের উপাসনাতে যাহার অধিকার হয়, কাল্পনিক উপাসনাতে তাহার প্রয়োজন নাই।"

রামমোহন ঐ ঈশোপনিষদের ভূমিকাতেই অন্যত্র (গ্র;১৪৮-৪৯) বল্‌চেন—
"যদ্যপি পুরাণতন্ত্রাদিতে লক্ষ স্থানেও নামরূপবিশিষ্টকে উপাস্য করিয়া কহিয়া, পুনরায় কহেন যে, এ কেবল দুর্ব্বলাধিকারীর মন স্থিরের জন্য কল্পনামাত্র করা গেল, তবে ঐ পূর্ব্বের লক্ষ বচনের সিদ্ধান্ত পরের বচনে হয় কি না? আর যদি পুরাণতন্ত্রাদিতে সকল ব্রহ্মময় এই বিচারের দ্বারা নানা দেবতা, এবং দেবতার বাহন এবং ব্যক্তিসকল, আর অন্নাদি যাবদ্বস্তুকে ব্রহ্ম করিয়া কহিয়া, পুনরায় পাছে এ বর্ণনের দ্বারা ভ্রম হয় এ নিমিত্ত পশ্চাৎ কহেন যে, বাস্তবিক নামরূপ সকল

জন্য [অর্থাৎ সৃষ্ট] এবং নশ্বর হয়েন, তবে তাবৎ পূর্ব্বের বাক্যের মীমাংসা পরের বাক্যে হয় কি না? ***। আমরা সিদ্ধান্ত বাক্যে মনোযোগ না করিয়া মনোরঞ্জন বাক্যে মগ্ন হই।"

(জ) চতুর্থ সূত্র—মনু বেদার্থের সংগ্রহকর্ত্তা, সুতরাং প্রামাণ্য।

আর একটি সূত্র এই যে—মনু বেদার্থের সংগ্রহকর্ত্তা বলে' স্বীকৃত। মনুস্মৃতি সকল স্মৃতির মধ্যে প্রধান। অতএব মনুর বাক্য প্রামাণ্য (গ্র, ১৮৯)।

এ সম্বন্ধে রামমোহন রায় বল্‌চেন (গ্র, ৩৮৮)—"বেদদ্বেষকারি জৈন ও যবনাদির আক্রমণপ্রযুক্ত ভারতবর্ষে নানা শাখা-বিশিষ্ট বেদের সমুদায় প্রাপ্তি হইতেছে না। কিন্তু এই দৌর্ভাগ্য প্রশমনার্থ বেদ স্বয়ং কহিয়াছেন যে—'যদ্বৈ কিঞ্চিন্মনুরবদৎ তদ্বৈ ভেষজং'—যাহা কিছু মনু কহিলেন তাহাই পথ্য হয়।"

রামমোহন এ বিষয়ে বৃহস্পতির এই বচনও উদ্ধৃত করেছেন (গ্র, ১৭০)—'মন্বর্থবিপরীতা যা সা স্মৃতির্ন প্রশস্যতে'—মনুস্মৃতির অর্থের বিপরীত যে স্মৃতি, তা প্রশংসনীয় নয়।

(ঝ) মনুরও শেষ সিদ্ধান্ত—ব্রহ্মজ্ঞান।

কিন্তু এ স্থলেও আপত্তি হতে পারে, মনুতেও তো দেবতাদের উদ্দেশে যাগযজ্ঞাদির বিধি আছে। এর উত্তরে রামমোহন রায় বল্‌চেন (গ্র, ১৪৯, ৫৯৩ ও অন্যত্র)—"মনু সকল স্মৃতির প্রধান। তাহার শেষ গ্রন্থে সকল কর্ম্মকে কহিয়া পশ্চাৎ কহিলেন—'যথোক্তান্যপি কর্ম্মাণি পরিহায় দ্বিজোত্তমঃ। আত্মজ্ঞানে শমে চ স্যাদ্‌বেদাভ্যাসে

চ যত্নবান্ ॥'—শাস্ত্রোক্ত যাবৎ কর্ম্ম, তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াও ব্রহ্মোপাসনাতে এবং ইন্দ্রিয়নিগ্রহেতে আর প্রণব এবং উপনিষদাদি বেদাভ্যাসেতে ব্রাহ্মণ যত্ন করিবেন।"

রামমোহন মনুর এই শ্লোকও উদ্ধৃত করেছেন (গ্র, ২৩২)—

সর্ব্বেষামপি চৈতেষামাত্মজ্ঞানং পরং স্মৃতং।
তদ্ধ্যগ্রং সর্ব্ববিদ্যানাং প্রাপ্যতে হ্যমৃতং ততঃ॥"

রামমোহন রায় কৃত অর্থ—"এই সকল ধর্ম্মের মধ্যে আত্মজ্ঞানকে পরম ধর্ম্ম কহা যায়; যেহেতু সকল ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ যে আত্মজ্ঞান তাহা হইতে মুক্তি হয়।"

(ঞ) প্রতিমাদি পূজার অনুকূল সকল শাস্ত্র অপরা বিদ্যা।

অতএব দেখা যাচ্চে, সকল শাস্ত্রেরই শেষ সিদ্ধান্ত ব্রহ্মজ্ঞান। এ জন্য মাণ্ডুক্যোপনিষদের ভূমিকায় (গ্র, ৫৯৮) রামমোহন বল্‌চেন—"যে কোনো শাস্ত্রে সোপাধি উপাসনার এবং প্রতিমাদি পূজার বিধান ও তাহার ফল কহিয়াছেন, সেই সকল শাস্ত্রকে অপরা বিদ্যা করিয়া জানিবেন; এবং যাহাদের কোনো মতে ব্রহ্মতত্ত্বে মতি নাই, এবং সর্ব্বব্যাপি করিয়া পরমাত্মাতে যাহাদের বিশ্বাস নাই, এমৎ অজ্ঞানীর নিমিত্ত ঐ সকল শাস্ত্রে কহিয়াছেন।"

(ট) পঞ্চম সূত্র—শাস্ত্রের বিভিন্ন উপদেশ অধিকারী-ভেদে প্রযোজ্য।

শাস্ত্রসমূহের সামঞ্জস্য রক্ষার আর একটি সর্ব্বজনসম্মত সূত্র এই যে, শাস্ত্রের বিভিন্ন উপদেশ অধিকারী-ভেদে প্রযোজ্য।

এ বিষয়ে রামমোহন রায় বল্‌চেন (গ্র, ৫৯৯)—"শাস্ত্রে কহিতেছেন—'অধিকারিবিশেষেণ শাস্ত্রাণ্যুক্তান্যশেষতঃ'—অধিকারিপ্রভেদেতে শাস্ত্রে নানা প্রকার বিধি উক্ত হইয়াছে। অর্থাৎ, যে ব্যক্তির পরমার্থতত্ত্বে কোনো মতে প্রীতি নাই এবং সর্ব্বদা অনাচারে রত হয়, তাহাকে অঘোর পথের আদেশ করেন। তদনুসারে সেই ব্যক্তি কহে যে, 'অঘোরান্ন পরো মন্ত্রঃ'—অঘোর মন্ত্রের পর আর নাই। আর যে ব্যক্তি পরমার্থ বিষয়ে বিমুখ এবং পানাদিতে রত, তাহার প্রতি বামাচারের আদেশ করেন; এবং সে কহে যে, অলিনা বিন্দুমাত্রেণ ত্রিকোটিকুলমুদ্ধরেৎ'—বিন্দুমাত্র মদিরার দ্বারা তিন কোটি কুলের উদ্ধার হয়। আর যে ব্যক্তির পরমেশ্বর বিষয়ে শ্রদ্ধা না হইয়া স্ত্রীসুখাদি বিষয়ে সর্ব্বদা আকাঙ্ক্ষা হয় তাহার প্রতি স্ত্রীপুরুষের ক্রীড়াঘটিত উপাসনার উপদেশ করিয়াছেন; এবং সে কহে যে, 'বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ, শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্‌ যঃ' ইত্যাদি—যে ব্যক্তি ব্রজবধূদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের এই ক্রীড়াকে শ্রদ্ধান্বিত হইয়া শ্রবণ করে এবং বর্ণন করে, সে ব্যক্তির শ্রীকৃষ্ণেতে পরম ভক্তি হইয়া, অন্তঃকরণের দুঃখ ত্বরায় নিবৃত্তি হয়। আর, যাহারা হিংসাদি কর্ম্মেতে রত হয়, তাহার প্রতি ছাগাদি বলিদানের উপদেশ করিয়াছেন; এবং সে কহে যে, 'স্বমেকমেকমুদরা তৃপ্তা ভবতি চণ্ডিকা' ইত্যাদি—মেষের রুধির দান করিলে এক বৎসর পর্য্যন্ত ভগবতী প্রীতা হয়েন। এ সকল

বিদ্যা অপরা বিদ্যা হয়। কিন্তু ইহার তাৎপর্য্য এই যে, আত্মতত্ত্ববিমুখ [লোক] সকল, যাহাদের স্বভাবত অশুচি ভক্ষণে, মদিরা পানে, স্ত্রীপুরুষ ঘটিত আলাপে এবং হিংসাদিতে রতি হয়, তাহারা নাস্তিকরূপে ঐ সকল গর্হিত কর্ম্ম না করিয়া পূর্ব্বলিখিত বচনেতে নির্ভর করিয়া ঈশ্বরোদ্দেশে এ সকল কর্ম্ম যেন করে। যেহেতু নাস্তিকতার প্রাচুর্য্য হইলে জগতের অত্যন্ত উৎপাত হয়।”

রামমোহন পরে আবার বল্‌চেন (গ্র, ৬০০)—“আর ইহাও জানা কর্ত্তব্য, যে যে শাস্ত্রে ঐ সকল আহার-বিহার ও হিংসা ইত্যাদির উপদেশ আছে, সেই সকল শাস্ত্রেই সিদ্ধান্তের সময় অঙ্গীকার করেন যে, আত্মজ্ঞান ব্যতিরেকে অন্য যে উপদেশ, সে কেবল লোকরঞ্জন মাত্র।”

(ঠ) উক্ত পাঁচটি মূল-সূত্র কি অন্য পণ্ডিতেরা জানিতেন না?

উপরে যে পাঁচটি মূল-সূত্র উল্লেখ করা গেল, তা স্বীকার না করলে বিপুল হিন্দুশাস্ত্রের সহস্র পরস্পর-বিরোধী মতামতের মধ্যে কোনও সামঞ্জস্য হতে পারে না। আবার এগুলি স্বীকার করলে যে ব্রহ্মজ্ঞানকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলে’ না মেনে উপায় নেই, তাও সঙ্গে সঙ্গেই দেখা গেল। রামমোহন রায় আশ্চর্য্য প্রতিভা-বলে এই সূত্রগুলিকে আবিষ্কার করে’ দৃঢ়মুষ্টিতে ধরলেন। অন্য পণ্ডিতেরা যে এ সকল জান্‌তেন না, তা নয়; কিন্তু তাঁরা এ সকলের অপরিহার্য্য সিদ্ধান্তের প্রতি মনোযোগ করতেন না। অথবা, এই সুবিস্তৃত দেশে যে সকল মত-বিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠান

একবার প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে, তার পরিবর্ত্তন তাঁরা কল্পনাও কর্‌তে পার্‌তেন না ; সুতরাং ঐ সিদ্ধান্ত তাঁদের কাছে আকাশ-কুসুমের ন্যায় অলীক বোধ হত। যে সকল প্রথা দেশে বহুকাল যাবৎ সর্ব্বসাধারণের মধ্যে প্রচলিত রয়েছে, তার পরিবর্ত্তনকে সম্ভব মনে করা এবং তজ্জন্য চেষ্টায় প্রবৃত্ত হওয়া কত বড় ধারণা-শক্তি ও কত বড় সাহসের কার্য্য! রামমোহন রায় বিপুল ধারণা-শক্তির সাহায্যে শাস্ত্রের ব্রহ্মজ্ঞানরূপ সিদ্ধান্তকে মনে-প্রাণে গ্রহণ কর্‌লেন, এবং অসাধারণ সাহসের সহিত তদনুসারে সমাজকে পুনর্গঠন কর্‌বার কার্য্যে ব্রতী হলেন।

(ভ) শাস্ত্রসিন্ধু হইতে রামমোহনের ব্রহ্মজ্ঞানরূপ রত্ন আবিষ্কার।

ঐ মূল-সূত্রগুলি আবিষ্কারের ফলে রামমোহন যেন সমগ্র শাস্ত্র-ভাণ্ডারের চাবি আপন হাতে পেলেন। সেই চাবি দ্বারা সুপ্রাচীন হিন্দুজাতির সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান্ সম্পদ যে ব্রহ্মজ্ঞান, তাকে উদ্‌ঘাটন করে' স্বদেশীয় বিদেশীয় সকল লোককে দেখালেন। পরাধীনা দুঃখিনী ভারতমাতার জীর্ণ কুটীরে বহু আবর্জ্জনারাশির অভ্যন্তরে যে এমন রত্ন লুক্কায়িত ছিল, তা কে জান্‌ত? বিদেশীয়েরা স্বপ্নেও ভাবেন নাই যে, এই জ্ঞানালোচনাবিহীন বিজিত জাতির মধ্যে তাঁরা যে কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধর্ম্ম প্রচলিত দেখ্‌ছিলেন, তার অতিরিক্ত কিছু এখানে কখনও ছিল বা আছে। ভারতীয় শাস্ত্রে যে জ্ঞানমূলক উন্নত একেশ্বরবাদ এবং নীতি ও জনসেবামূলক সার ধর্ম্মের উপদেশ আছে, তার বিন্দুমাত্র ধারণাও তাঁদের ছিল না। রামমোহন রায়ের প্রকাশিত ব্রহ্মজ্ঞান-প্রতিপাদক শাস্ত্রসমূহের ইংরাজী অনুবাদ এবং তৎসম্বন্ধে তাঁর মন্তব্যসকল পাঠ করে' তাঁরা অতিশয় বিস্মিত হলেন। সুদূর ইউরোপ ও আমেরিকায়

রামমোহনের যশ ঘোষিত হল; ফ্রান্স্ ও যুক্তরাজ্যে তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও দেশহিতৈষিতার প্রশংসাধ্বনি উত্থিত হল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, তাঁর এই আবিষ্কার স্বদেশবাসীর মনে বিন্দুমাত্র কৃতজ্ঞতা বা সম্ভ্রমের উদ্রেক কর্‌ল না! আপন দেশে তিনি তিরস্কৃত ও লাঞ্ছিত হতে লাগ্‌লেন! অথবা, আশ্চর্য্যই বা বলি কেন? আমরা যে পুরাতন প্রথায় অভ্যস্ত, যার সঙ্গে আমাদের গার্হস্থ্য ও সামাজিক সকল ব্যাপার জড়িত, ঐ আবিষ্কারকে গ্রহণ কর্‌তে গেলে যে তার অনেক সংস্কার কর্‌তে হয়। পুরাতন মন্দিরকে অশ্বত্থবৃক্ষের সহস্র শিকড় যেমন করে' আচ্ছন্ন করে, বহুদেববাদ ও মূর্ত্তিপূজা এবং সেই সঙ্গে জাতিভেদের জটিল আচার-বিচার তেমনি করে' আমাদের সমাজকে আচ্ছন্ন করে' ফেলেছে; রামমোহনের আবিষ্কৃত ও প্রচারিত ব্রহ্মজ্ঞান অনুসারে এই সমাজকে পুনর্গঠন কর্‌তে হলে, অনেক চিন্তা, অনেক শ্রম ও অনেক ত্যাগস্বীকারের প্রয়োজন। রামমোহনের সমকালে আমাদের পিতামহ-প্রপিতামহগণ তাতে প্রস্তুত ছিলেন না। বহু শতাব্দীর পরাধীনতা তাঁদের নির্ব্বীর্য্য ক'রে রেখেছিল। সুতরাং স্বভাবতঃই তাঁরা ব্রহ্মজ্ঞানের বিরোধী হলেন। ব্রহ্মজ্ঞানকে তাঁরা আপন পূর্ব্বপুরুষদের উপার্জ্জিত শ্রেষ্ঠ রত্ন বলে' চিন্‌তে না পেরে, বরং তাকে ধর্ম্মের বিনাশক, সমাজের ধ্বংসকারী, এমন কি দুর্ভিক্ষ ও মারীভয়ের হেতু মনে কর্‌তে লাগ্‌লেন। অনেকে শাস্ত্রবাক্য উদ্ধৃত করে' প্রচলিত প্রথার সমর্থন-পূর্ব্বক রামমোহনকে নিরস্ত কর্‌বার চেষ্টা কর্‌তে লাগ্‌লেন।

(চ) তাঁহার তর্ক-বিচার উচ্চতর হিন্দুধর্ম্মের রক্ষার জন্য।

কিন্তু কর্‌লে কি হবে? রামমোহন রায়ের সহিত পণ্ডিতগণের সেই বহুবর্ষব্যাপী শাস্ত্রীয় বিচার উচ্চতর হিন্দুধর্ম্মের সহিত নিম্নতর

হিন্দুধর্ম্মের সংগ্রাম বই ত নয়! সুতরাং পদে পদেই তাঁদের পরাস্ত হতে হল; প্রতি বারের বিচারে উন্নত হিন্দুধর্ম্মই জয়ী হল। রামমোহন শাস্ত্রসকল হাতে নিয়ে উন্নত হিন্দুধর্ম্মের রক্ষার জন্যই দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি মান্দ্রাজের শঙ্কর শাস্ত্রীর আক্রমণের যে উত্তর দিয়েছিলেন, তার নাম দিয়েছিলেন—'A Defence of Hindoo Theism'—হিন্দু একেশ্বরবাদের রক্ষার চেষ্টা। সেইরূপ, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের আক্রমণের ইংরাজী উত্তরের নাম দিয়েছিলেন—'A Second Defence of the Monotheistical System of the Veds'—বেদোক্ত একেশ্বরবাদের রক্ষার দ্বিতীয় চেষ্টা। খ্রীষ্টীয় মিশনরিগণ হিন্দু দর্শনশাস্ত্রসকলের দোষ ধরে' তাঁদের পত্রিকাদিতে কিছু লিখ্‌লে, রামমোহন নিজের পত্রিকা বাহির করে, সে সকল বিষয়ের সদ্ব্যাখ্যা দিয়ে দেশের গৌরব রক্ষা কর্‌তেন। মিশনরিরা আমাদের ভ্রান্ত মত ও কুৎসিত আচার-ব্যবহার দেখে' হিন্দুধর্ম্মের নিন্দা কর্‌লে, তিনি সেই সমবেদনাশূন্য আক্রমণের প্রতিরোধ-কল্পে দণ্ডায়মান হতেন; এবং প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের বিকৃতি-সমূহের জন্য যে প্রাচীন ঋষিগণ দায়ী নন, এর চেয়ে উৎকৃষ্টতর ধর্ম্ম যে আমাদের ছিল এবং ভবিষ্যতে হতে পারে, শাস্ত্রীয় প্রমাণ সহ তা দেখাতেন। যে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা প্রতিপক্ষরূপে তাঁর সঙ্গে বহুবর্ষব্যাপী সংগ্রামে নিযুক্ত ছিলেন, তাঁদেরই পক্ষ হয়ে তিনি মিশনরিদের সঙ্গে দ্বন্দ্ব কর্‌তেন। মিশনরিরা হিন্দুধর্ম্মের গ্লানি প্রচার করাতে একবার তিনি তাঁর 'ব্রাহ্মণ-সেবধি' নামক পত্রিকায় তাঁদের সম্মুখ-বিচারে আহ্বান করেছিলেন, এবং লিখেছিলেন (গ্র, ৩৫৭)—"**নিন্দা ও তিরস্কারের দ্বারা অথবা লোভ প্রদর্শন দ্বারা [আপন] ধর্ম্ম সংস্থাপন করা যুক্তি ও বিচার-সহ হয় না। তবে বিচার-বলে হিন্দুর ধর্ম্মের**

মিথ্যাত্ব ও আপন ধর্ম্মের উৎকৃষ্টত্ব, ইহা স্থাপন করেন, সুতরাং ইচ্ছাপূর্ব্বক অনেকেই তাঁহাদের ধর্ম্ম গ্রহণ করিবেক; অথবা স্থাপন করিতে অসমর্থ হয়েন, [তবে] এরূপ বৃথা ক্লেশ করা ও ক্লেশ দেওয়া হইতে ক্ষমাপন্ন হইবেন।"

কত বড় সাহসিক আহ্বান! তার পর, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের দরদী হয়ে মিশনরিদিগকে আরও কি বলেছিলেন, শুনুন—"ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের ক্ষুদ্র গৃহে নিবাস, ও শাকাদি ভোজন, ও ভিক্ষোপজীবিকা দেখিয়া তুচ্ছ করিয়া বিচার হইতে যেন নিবৃত্ত না হয়েন; যেহেতু সত্য ও ধর্ম্ম সর্ব্বদা ঐশ্বর্য্য ও অধিকারকে, ও উচ্চ পদবী ও বৃহৎ অট্টালিকাকে আশ্রয় করিয়া থাকেন, এমত নিয়ম নহে।"

কি সাহস! ব্রহ্মজ্ঞানের বিরুদ্ধে যত বড় মিশনরি বা যত বড় ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতই আসুন, তাঁকে তিনি জয় করতে পারবেন, এই বিশ্বাস রামমোহনের ছিল।

(ণ) তাঁহার জয়পত্র প্রাচীন ঋষিদেরই প্রদত্ত।

অতএব, রামমোহন রায় যদি বিচারে মিশনরিদের সঙ্গে বা পণ্ডিত-দের সঙ্গে পুনঃ পুনঃ জয়ী হয়ে থাকেন, তবে সেই জয়ে তাঁর ব্যক্তিগত জয় বা তাঁর দলভুক্ত লোকদের জয় হল, এমন মনে করা সঙ্গত নয়; হিন্দুজাতির উন্নত একেশ্বরবাদেরই জয় হল এবং সেই সূত্রে সকল দেশেরই উন্নত ধর্ম্মের অধিকার প্রসারিত হল। রামমোহনের সেই বিজয়ে তাঁর নিজের গৌরব অপেক্ষা প্রাচীন ঋষিদেরই গৌরব অধিক। কারণ শাস্ত্র-রচয়িতা ঋষিগণই ব্রহ্মজ্ঞানকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত

করে’ রেখে গিয়েছেন। যে-কেহ ব্রহ্মজ্ঞানের পক্ষে দাঁড়াবে, তার জন্য জয়-পত্র বহুকাল পূর্ব্বে তাঁরাই লিখে রেখে গিয়েছেন। তাই বলি, রামমোহন রায়ের জয়-পত্র প্রাচীন মুনিঋষিদেরই প্রদত্ত।

৩। মূর্ত্তিপূজার সপক্ষে প্রথম শ্রেণীর যুক্তি ও তাহার উত্তর।

(নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনা অসম্ভব কি না?)

(ক) সূচনা।

মহাত্মা রামমোহন রায় যে সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে, কেবল মাত্র আমাদের ঐহিক ও পারত্রিক কল্যাণের জন্য দয়া-পরবশ হয়ে হিন্দুধর্ম্মের সংস্কারে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, সে কথা বলা হয়েছে। এই কার্য্যের জন্য তিনি অপার শাস্ত্রসিন্ধুর মধ্যে কেমন অনাক্রম্য, অপরাজেয় একটি অটল ভূমি আশ্রয় করেছিলেন, তাও বর্ণনা করা হয়েছে। এক্ষণে তাঁর সমকালবর্ত্তী পণ্ডিতগণ ব্রহ্মোপাসনার বিরুদ্ধে ও প্রচলিত দেবদেবী-পূজার সমর্থনে যে সকল যুক্তি উপস্থিত করেছিলেন, তিনি কিরূপে সেগুলি একে একে খণ্ডন করলেন, সে আলোচনায় প্রবৃত্ত হচ্চি।

বলা বাহুল্য, উক্ত পণ্ডিতগণ আমাদেরই পিতামহ-প্রপিতামহ-স্থানীয়। সুতরাং তাঁদের কোনও কোনও যুক্তি নিতান্ত বালকোচিত মনে হলেও, তাঁদের প্রতি আমাদের সমুচিত শ্রদ্ধা রক্ষা করা প্রয়োজন হবে। পূর্ব্বেই বলেছি, নিরবয়ব পরব্রহ্মের উপাসনার কিঞ্চিৎ আস্বাদন না

পেলে, আমরাও হয়ত আজ পর্য্যন্ত ঐরূপ যুক্তিই উপস্থিত করতাম। বর্ত্তমান পাশ্চাত্য শিক্ষার যুগেও জ্ঞানে গুণে সমুন্নত অনেক শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি, ঐ আস্বাদন না পাওয়াতে, ব্রহ্মোপাসনার বিরুদ্ধে স্থূল-সূক্ষ্ম সহস্র প্রকার আপত্তি উত্থাপন করছেন; সুতরাং তখনকার কালে দৃঢ়-বিশ্বাসী পণ্ডিতদের নানা আপত্তি কিছুমাত্র অস্বাভাবিক ছিল না।

মূর্ত্তিপূজার বিরুদ্ধে মহাত্মা রামমোহন রায় অতি তীব্র ভাব পোষণ করতেন। সুতরাং তাঁর কোনও কোনও উক্তি কারো কারো কাছে কিঞ্চিৎ কঠিন মনে হতে পারে। কিন্তু যাঁরা সত্যান্বেষী, তাঁরা বিরুদ্ধ মত, যতই অপ্রিয় হোক্, সহিষ্ণু হয়ে শ্রবণ করেন ও চিন্তা করে' দেখেন; সঙ্গত বোধ হলে গ্রহণ করেন, নতুবা পরিত্যাগ করেন। রামমোহন রায়ের ন্যায় একজন বিশ্ব-বরেণ্য ব্যক্তি উপাসনা-রূপ সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় বিষয়ে কি কি বলেছেন, সকলেরই ধীর ভাবে শ্রবণ করা বিধেয়।

ব্রহ্মোপাসনার বিরুদ্ধে ও মূর্ত্তিপূজার সমর্থনে যত প্রকার যুক্তি পণ্ডিতেরা উপস্থিত করেছিলেন, সেগুলিকে ছয় শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়; যথা—

(১) নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনা অসম্ভব,

(২) যে-কোনও সৃষ্ট পদার্থে ঈশ্বরের উপাসনা হতে পারে,

(৩) ঈশ্বর নিরাকার অথচ সাকার,

(৪) দেবতারা ঈশ্বরের স্বরূপ (attributes) বা কর্ম্মচারী,

(৫) সাকার-উপাসনা নিরাকার-উপাসনার সোপান,

(৬) বিবিধ আপত্তি।

প্রত্যেক শ্রেণীর যুক্তিসকলকে রামমোহন রায়ের উত্তর সহ আমি ক্রমান্বয়ে উপস্থিত করছি।

(খ) 'নিরবয়ব ব্রহ্মকে ধারণা করা যায় না' —এ আপত্তির উত্তর।

ব্রহ্মোপাসনা অবলম্বনের বিরুদ্ধে সর্ব্বপ্রথম আপত্তি এই ছিল যে, যিনি অবয়বহীন তাঁকে অন্তরে ধারণা করা অসম্ভব। এই আপত্তির উত্তরে রামমোহন রায় বল্লেন (গ্র, ১৪৭-৪৮)—"ব্রহ্মজ্ঞান যদি অসম্ভব হইত, তবে 'আত্মা বা অরে শ্রোতব্যো মন্তব্যঃ', 'আত্মৈবোপাসীত', এইরূপ শ্রুতি এবং স্মৃতিতে ব্রহ্মজ্ঞান সাধনের প্রেরণা থাকিত না। কেন না, অসম্ভব বস্তুর প্রেরণা শাস্ত্রে হইতে পারে না। আর যদি কহ, ব্রহ্মজ্ঞান অসম্ভব নহে, কিন্তু কষ্টসাধ্য, বহু যত্নে হয়, ইহার উত্তর এই—যে বস্তু বহু যত্নে হয়, তাহার সিদ্ধির নিমিত্ত সর্ব্বদা যত্ন আবশ্যক হয়; তাহার অবহেলা কেহ করে না। তুমি আপনিই ইহাকে কষ্টসাধ্য কহিতেছ, অথচ ইহাতে যত্ন করা দূরে থাকুক, ইহার নাম করিলে ক্রোধ কর।"

(গ) 'যিনি ধারণাতীত, তাঁর উপাসনা অসম্ভব'—উত্তর।

পূর্ব্বোক্ত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁর ইংরাজী পুস্তিকায় বলেছিলেন—যাঁকে ধারণা করা যায় না, তাঁর উপাসনাও করা যায় না। এর উত্তরে রামমোহন ইংরাজীতে যা বল্লেন (W, 122-23) তার মর্ম্ম এই—যদি এমন মনে করেন যে, ব্রহ্মের উপাসনা করতে হলে, তাঁর স্বরূপ ও গুণসকল সমগ্র জানা আবশ্যক, তা হলে আমি স্বীকার করি, সেরূপ উপাসনা সম্ভব নয়। অথবা যদি মনে করেন সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরের যথার্থ একটি জড়ীয় প্রতিকৃতি নির্ম্মাণ করে, তার সাক্ষাতে

পত্রপুষ্প ও নৈবেদ্যাদি না দিলে উপাসনা হল না, তা হলেও স্বীকার করি, উপাসনা সম্ভব নয়। কিন্তু যদি উপাসনার অর্থ এই হয় যে, মনকে উন্নত করে' সেই সর্ব্বব্যাপী পরম পুরুষের সত্তা উপলব্ধি করা, জগদ্ব্যাপারে তাঁর যে জ্ঞান ও শক্তি প্রকাশ পাচ্চে সর্ব্বদা তার অনুধ্যান করা, এবং যিনি আমাদিগকে জীবন দিয়েছেন, সর্ব্বক্ষণ আমাদের ইন্দ্রিয়-জ্ঞান জন্মাচ্চেন এবং আমাদের সকল প্রকার সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধান কর্‌চেন, তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতার অনুভবে হৃদয়কে পূর্ণ রাখা, তবে আমি এ কথা বল্‌তে কখনও ইতস্ততঃ কর্‌ব না যে, সেরূপ উপাসনা কেবল 'সম্ভব' নয়, প্রত্যেক মানুষের পক্ষে অবশ্য-কর্ত্তব্য।

এই উক্তিতে রামমোহন রায় পরমেশ্বরের সত্য উপাসনা কিরূপ তার ইঙ্গিত করেছেন। পরমেশ্বরের স্বরূপ ও গুণাবলী সমগ্র না জেনেও এরূপ উপাসনা করা যায়। আর এরূপ উপাসনায় মূর্ত্তি নির্ম্মাণের বা পত্রপুষ্প নৈবেদ্যাদি প্রদানের কিছুমাত্র প্রয়োজন হয় না।

(ঘ) 'ব্রহ্মবিষয়ক শাস্ত্রসকল সাধারণের অবোধ্য'—উত্তর।

এক বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী সুপণ্ডিত গোস্বামী তাঁর পুস্তিকায় লিখেছিলেন —বেদ, বেদান্ত, ব্রহ্মসূত্র প্রভৃতি ব্রহ্মপ্রতিপাদক শাস্ত্রসমূহ 'প্রাকৃত মনুষ্যের' বোধগম্য হতে পারে না; অতএব, তারা কিরূপে ব্রহ্মোপাসনা করবে? এর উত্তরে রামমোহন রায় বল্লেন (গ্র, ৬২৭-১৮)—

"যদ্যপি বেদ দুর্জ্ঞেয় বটেন, তত্রাপি বেদের অনুশীলন করা ব্রাহ্মণের নিত্যধর্ম্ম হইয়াছে; অতএব তাহার অনুষ্ঠান সর্ব্বদা কর্ত্তব্য। শ্রুতিঃ—'ব্রাহ্মণেন নিষ্কারণো ধর্ম্মঃ ষড়ঙ্গো বেদোহধ্যেয়ো জ্ঞেয়শ্চ' ইতি—ব্রাহ্মণের নিষ্কারণ ধর্ম্ম এই যে, ষড়ঙ্গ বেদের অধ্যয়ন করিবেন এবং অর্থ জানিবেন। ভগবান্ মনু—

'আত্মজ্ঞানে শমে চ স্যাদ্ বেদাভ্যাসে চ যত্নবান্'—ব্রহ্মজ্ঞানে এবং ইন্দ্রিয়নিগ্রহে ও বেদাভ্যাসে ব্রাহ্মণ যত্ন করিবেন। বেদ দুর্জ্ঞেয় হইলেও বেদার্থজ্ঞান ব্যতিরেকে আমাদের ঐহিক পারত্রিক কোন মতে নিস্তার নাই। এই হেতু বেদের অর্থাবধারণ সময়ে সেই অর্থে সন্দেহ না জন্মে এই নিমিত্ত দ্বিতীয় প্রজাপতি ভগবান্ স্বায়ম্ভুব মনু ধর্ম্মসংহিতাতে তাবৎ বেদার্থের বিবরণ করিয়াছেন। শ্রুতিঃ—'যৎ কিঞ্চিন্মনুরবদৎ তদ্বৈ ভেষজং'—যাহা কিছু মনু কহিয়াছেন, তাহাই পথ্য। এবং বিষ্ণুরুদ্রাংশসম্ভব ভগবান্ বেদব্যাস বেদান্ত সূত্রের দ্বারা বেদার্থের সমন্বয় করিয়াছেন; এবং ভগবান্ পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য ঐ বেদান্ত সূত্রের এবং দশোপনিষদের ভাষ্যে তাবৎ অর্থ স্থির করিয়াছেন। অতএব; বেদ দুর্জ্ঞেয় হইয়াও এই সকল উপায়ের দ্বারা সুগম হইয়াছেন।"

সুতরাং ব্রহ্মোপাসনা না করার পক্ষে এ আপত্তি অসঙ্গত।

(৬) 'উপাসনা মাত্রই ভ্রমাত্মক জ্ঞান'—উত্তর।

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্য্য বোধ হয় অদ্বৈতবাদী ছিলেন। অদ্বৈতবাদীদের মতে ব্রহ্ম ও জীব বাস্তবিক একই। অজ্ঞানতার অবস্থায় মানুষ দুয়ের মধ্যে ভেদ কল্পনা করে। সুতরাং তখন যে প্রকার উপাসনাই করুক্, সকলই ভ্রমাত্মক। এই ভূমির উপর দাঁড়িয়ে ভট্টাচার্য্য মহাশয় বল্লেন, উপাসনামাত্রই যখন ভ্রমাত্মক জ্ঞান, তখন সাকার দেবদেবীর উপাসনা নিয়ে থাকাই ভাল। কি আশ্চর্য্য, ব্রহ্মোপাসনাকে বাধা দিতে গিয়ে, যে সাকার উপাসনার সমর্থনে দাঁড়িয়েছেন, তাকেও মিথ্যা বলে'

ফেল্লেন! বাস্তবিক এ দেশে অদ্বৈতবাদের ভাব এতই বিস্তার লাভ করেছে যে, সর্ব্বসাধারণের মনে উপাসনামাত্রেরই প্রতি এই প্রকার অবজ্ঞা গূঢ়রূপে বর্ত্তমান আছে! তবে যে লোকে দেবদেবীর উপাসনা নিয়ে থাকে, তা যেন কেবল বর্ত্তমান 'অজ্ঞান অবস্থায়' একটা কিছু করে' মনকে প্রবোধ দিবার জন্য। যা হোক্, ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের উক্তির উত্তরে রামমোহন রায় বল্লেন (গ্র, ৬৯০)—"দেবতার উপাসনাকে যে ভ্রমাত্মক কহিয়াছেন তাহাতে আমারদিগের হানি নাই। কিন্তু উপাসনামাত্রকে ভ্রমাত্মক কহিয়া ব্রহ্মোপাসনা হইতে জীবকে বহির্ম্মুখ করিবার চেষ্টা করেন, ইহাতে আমারদিগের আর অনেকের সুতরাং হানি আছে। যেহেতু ব্রহ্মের উপাসনাই মুখ্য হয়; তদ্ভিন্ন মুক্তির কোন উপায় নাই।"

এ কথা বলে' রামমোহন রায় তৎপরে বল্লেন যে, জগতের সৃষ্টি স্থিতি-লয়ের আলোচনা দ্বারা পরমাত্মার সত্তা নির্ণয় কর্‌তে হবে; এবং একমাত্র তিনিই সত্য, জগৎ-সংসার মিথ্যা, এর অনুকূল শাস্ত্রের শ্রবণমনন দ্বারা বহুকালে বহুযত্নে তাঁর সাক্ষাৎকার কর্‌তে হবে। ইহাই 'বেদান্তসিদ্ধ যথার্থ জ্ঞানরূপ আত্মোপাসনা'। এই উপাসনা না করাতে অনেক প্রত্যবায় শাস্ত্রে লিখিত আছে। এই বলে' রামমোহন অনেকগুলি বচন উদ্ধৃত কর্‌লেন। তন্মধ্যে দুইটি এই :—

"অসূর্য্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ। তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ॥"—ঈশোপনিষৎ, ৩

অর্থ—আত্মজ্ঞানরহিত ব্যক্তিগণ শরীর ত্যাগের পর অন্ধতমসাচ্ছন্ন অসুর-লোক সকলে গমন করে।

'ন চেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ'—কেনোপনিষৎ, ২। ৫

অর্থ—এ সংসারে থাক্‌তে থাক্‌তেই যদি ব্রহ্মকে জানা না যায়, তবে মহা বিনাশ।

(চ) সাক্ষাৎ উপাসনা ও পরম্পরা উপাসনা।

শাস্ত্রানুসারে উপাসনা দুই প্রকার—সাক্ষাৎ উপাসনা ও পরম্পরা উপাসনা। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মতে সাক্ষাৎ উপাসনা ত অসম্ভবই, কারণ জীব ও ব্রহ্ম এক। আর, পরম্পরা উপাসনার অর্থ মূর্ত্তিপূজা। রামমোহন রায় এই ভ্রম দূর কর্‌বার জন্য উক্ত দুই প্রকার উপাসনার লক্ষণ সংক্ষেপে ব্যাখ্যা কর্‌লেন; বল্লেন (গ্র, ১০৫)— "বিশ্বের সৃষ্টিস্থিতিলয়ের দ্বারা যে আমরা পরমেশ্বরের আলোচনা করি, সেই পরম্পরা উপাসনা হয়। আর যখন অভ্যাসবশতঃ প্রপঞ্চময় বিশ্বের প্রতীতির নাশ হইয়া কেবল ব্রহ্মসত্তা মাত্রের স্ফূর্ত্তি থাকে, তাহাকেই আত্মসাক্ষাৎকার কহি।"

অর্থাৎ, যখন সাধনের ফলে সর্ব্বময় ব্রহ্মসত্তার প্রকাশ হয়, তাঁকে ভিন্ন অপর কিছু দেখা যায় না, সে অবস্থাই সাক্ষাৎ উপাসনার অবস্থা। তার পূর্ব্বে জগৎকার্য্যের পর্য্যালোচনা দ্বারা যে উপাসনা করা যায়, তাই পরম্পরা বা পরোক্ষ উপাসনা। রামমোহন অন্যত্রও এই দুই প্রকার উপাসনার উল্লেখ করেছেন। বেদান্ত গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন (গ্র, ২)— "ইহার [অর্থাৎ বেদান্ত গ্রন্থের] দৃষ্টিতে জানিবেন যে, আমাদের মূল শাস্ত্রানুসারে ও অতি পূর্ব্ব পরম্পরায় এবং বুদ্ধির বিবেচনাতে জগতের স্রষ্টা পাতা সংহর্ত্তা ইত্যাদি বিশেষণগুণে কেবল ঈশ্বর উপাস্য হইয়াছেন; অথবা সমাধি বিষয়ে ক্ষমতাপন্ন হইলে সকল ব্রহ্মময় এমত রূপে সেই ব্রহ্ম সাধনীয় হয়েন।"

অর্থাৎ, ব্রহ্মের সাক্ষাৎ অনুভব না পেয়ে তাঁকে জগতের স্রষ্টা পাতা সংহর্ত্তা ইত্যাদি বিশেষণ দ্বারা উপাসনা করা এক প্রকার; আর, তাঁকে সর্ব্বময়রূপে প্রত্যক্ষ করে' উপাসনা করা অন্য প্রকার। সাক্ষাৎ উপাসনা অবশ্য পরোক্ষ উপাসনা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; কিন্তু রামমোহন বল্‌চেন, তা 'অভ্যাস বশতঃ' (অর্থাৎ সাধনার ফলে) ক্রমে ক্রমে হয়। পরোক্ষ উপাসনা সাক্ষাৎ উপাসনার সোপান স্বরূপ।

কিন্তু 'পরম্পরা উপাসনা' বল্‌তে মূর্ত্তিপূজা বোঝায় না। এ বিষয়ে রামমোহন বল্লেন (গ্র, ১০৫-৬)—**ভট্টাচার্য্য অনীশ্বরকে ঈশ্বর এবং নশ্বরকে নিত্য, আর অপরিমিত পরমাত্মাকে পরিমিত অঙ্গীকার করাকে পরম্পরা উপাসনা কহেন। বস্তুতঃ সে উপাসনাই হয় না, কেবল কল্পনামাত্র।"**

ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলেছিলেন, সংসারের সামান্য যে রাজা, তারই সাক্ষাৎ উপাসনা হয় না, আর পরমেশ্বরের হবে! তাঁর বাক্যটি এই—"উপাসনা পরম্পরা ব্যতিরেকে সাক্ষাৎ হয় না; নিরাকার পরমেশ্বরের কথা থাকুক, সামান্য যে লৌকিক রাজাদির উপাসনা, বিবেচনা করিয়া বুঝ।" রামমোহন রায় এই তুলনার উত্তরে বল্লেন (গ্র, ১০৬)—**"রাজাদিগের সেবা তাঁহারদিগের শরীর দ্বারা ব্যতিরেকে হয় না, ইহা যথার্থ ভট্টাচার্য্য লিখিয়াছেন। যেহেতু তাঁহারা শরীরী, সুতরাং তাঁহারদিগের উপাসনা শরীর দ্বারা কর্ত্তব্য। কিন্তু অশরীরী, আকাশের ন্যায় ব্যাপক, সদ্রূপ পরমেশ্বরের উপমা শরীরীর সহিত দেওয়া শাস্ত্র এবং যুক্তির সর্ব্বথা বিরুদ্ধ হয়।"**

ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁর তুলনার মর্ম্মটি প্রকাশ করে' বলেন নি। তাঁর অভিপ্রায় এও হতে পারে যে, সামান্য পার্থিব রাজার তুষ্টি সাধন কর্‌তে

চাইলে, তাই সাক্ষাৎ ভাবে করা যায় না ; কর্ম্মচারীদের তুষ্টি সাধন দ্বারা কর্‌তে হয় ; সুতরাং নিরাকার পরমেশ্বরের তুষ্টি সাধন সাক্ষাৎভাবে কিরূপে করা যাবে ? দেবতারা ঈশ্বরের কর্ম্মচারী স্বরূপ ; তাঁদের পূজা দ্বারাই ঈশ্বরের তুষ্টি সাধন হ'তে পারে। এই ভাবটি শঙ্কর শাস্ত্রীও ব্যক্ত করেছিলেন। এ বিষয়ে রামমোহন রায়ের বক্তব্য পরে উল্লেখ করা যাবে [৬ (খ) দ্রষ্টব্য]।

(ছ) উপাসনা সত্যমূলক হওয়া আবশ্যক।

উপাসনা কল্পনামূলক না হয়ে, সত্যমূলক হওয়া চাই। যে সাধনা আমাদের জীবনকে পবিত্র, উন্নত ও মহৎ কর্‌বে, তার ভিত্তি সত্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়া অত্যাবশ্যক। কল্পনা মিশ্রিত কর্‌লে, নিজেরই সে উপাসনায় দৃঢ় আস্থা হবে না। সুতরাং তাতে জীবন গড়্‌বে কি করে ? তাই রামমোহন বল্‌ছেন, যত দিন ঈশ্বরকে সাক্ষাৎভাবে জান্‌তে না পার, তত দিন তটস্থ লক্ষণের দ্বারা যে পরিমাণ জান্‌তে পার তাই অবলম্বন করে' উপাসনা কর ; কিন্তু কল্পনার আশ্রয় নিও না। বেদান্ত-গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে এ কথাটি বুঝিয়েছেন। তিনি যা বলেছেন (গ্র, ৩), তার মর্ম্ম এই—মনে কর, এক ব্যক্তি শৈশবকালে শত্রুগণকর্ত্তৃক অপহৃত হয়ে বিদেশে প্রতিপালিত ও বর্দ্ধিত হল। আপন পিতার সম্বন্ধে সে কিছুই জান্‌বার সুযোগ পেল না। ঐ ব্যক্তি বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে যদি পিতার উদ্দেশে কোনও ক্রিয়া কর্‌তে চায়, বা তাঁর মঙ্গল প্রার্থনা কর্‌তে ইচ্ছা করে, তবে কি সে যে-কোনও বস্তুকে সম্মুখে পাবে তাকেই পিতা বলে' গ্রহণ কর্‌বে ? কখনই নয়। সে শুধু এই বল্‌বে— 'যিনি আমার জন্মদাতা তাঁর মঙ্গল হউক'। জগৎ-পিতার সম্বন্ধেও এইরূপ। তাঁর স্বরূপ জানি না বলে', যে-কোনও নশ্বর

পদার্থকে ব্রহ্ম বলব, তা নয়। জগতের স্রষ্টা, পাতা, সংহর্ত্তা ইত্যাদি বিশেষণের দ্বারা লক্ষ্য করে' তাঁরই উপাসনা করব। এরই নাম তটস্থ লক্ষণের দ্বারা উপাসনা। তটস্থ লক্ষণ কি? না, নদীর জল সর্ব্বত্রই একরূপ; তার পরিচয় বলা যায় না। কিন্তু তীরবর্ত্তী গ্রাম সকলের নামের দ্বারা পরিচয় বলা যায়; যেমন, ঘোষপল্লীর গঙ্গা, বোসপল্লীর গঙ্গা; অর্থাৎ, যে জলস্রোতের তীরে ঘোষপল্লী বা বোসপল্লী আছে। ঈশ্বরের পরিচয়ও এইরূপে হয়; যথা, 'যিনি জগতের স্রষ্টা', 'যিনি জগতের পাতা', ইত্যাদি। তৈত্তিরীয় উপনিষদে (৩।১) বলা হয়েছে—"যাঁ হতে এই প্রাণিগণ উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হয়ে যাঁর গুণে জীবিত থাকে, এবং প্রলয়কালে যাঁতে ফিরে' যায় ও প্রবেশ করে, তিনিই ব্রহ্ম।" ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ এই প্রকার। তটস্থ লক্ষণে উপাসনা কাল্পনিক নয়; উহা কাল্পনিক উপাসনা হতে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

(জ) ব্রহ্মের 'স্বরূপ' জানা যায় না, কিন্তু তাঁহাকে তটস্থ লক্ষণে জানা যায়।

ব্রহ্ম বাক্যমনের অগোচর, তাঁর 'স্বরূপ' জানা যায় না, রামমোহন রায় এ কথা স্বীকার করে' বলচেন (গ্র, ৩)—কোন্ বস্তরই বা 'স্বরূপ' আমরা পূর্ণভাবে জানতে পারি? চন্দ্রসূর্য্যাদি যে সকল পদার্থ আমরা সর্ব্বদা দেখি, এবং যাদের সাহায্যে নানা কার্য্য সম্পাদন করি, তাদেরই কি যথার্থ 'স্বরূপ' জানি? এক গাছি তৃণকেও কি আমরা সম্পূর্ণ জানতে পারি? কিন্তু যতটুকু জানি, ততটুকুর দ্বারাই আমাদের প্রয়োজন নির্ব্বাহ হয়। ঈশ্বর ইন্দ্রিয়ের অগোচর; তাঁর সমগ্র তত্ত্ব না-ই বা জানলাম। জগতের রচনা ও নিয়মসকল দেখে' এইটুকু ত বুঝি যে, তিনি আছেন এবং তিনি কর্ত্তা ও নিয়ন্তা। এই পরিমাণ জানলেই উপাসনার সম্ভাবনা হয়।

রামমোহন আরও বল্‌চেন (গ্র, ৫৮৯)—জীবাত্মারই স্বরূপ কি আমরা জানি? সকলেই বিশ্বাস করেন, দেহের সকল স্থান ব্যাপ্ত করে' জীবাত্মা বর্ত্তমান আছে; কিন্তু তার স্বরূপ কে জানেন? তেমনি সত্য-স্বরূপ পরমেশ্বর এই নামরূপময় জগতের আশ্রয় হয়ে বর্ত্তমান আছেন। তাঁর স্বরূপ না জান্‌লেও, 'তিনি জগতের ও জীবনের আশ্রয়' এই ভাবে তাঁকে নিত্য ধারণা কর্‌বে।

'স্বরূপ' শব্দ আজকাল আমরা যে অর্থে ব্যবহার করি (different attributes) রামমোহন রায় ঠিক সে অর্থে উহা সকল সময় ব্যবহার কর্‌তেন না। তিনি যে অনেক স্থলে বলেছেন, ব্রহ্মের স্বরূপ জানা যায় না, তাঁকে কেবল তটস্থ লক্ষণে জানা যায়, তার মর্ম্ম এই যে, আমরা তাঁর বিষয়ে যা-কিছু জানি, সকলই জগৎ ও জীবের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধের দিক্ থেকে জানি। ঐ সকল সম্বন্ধ ছেড়ে দিয়ে, তিনি স্বয়ং কিরূপ, 'তা আমাদের জান্‌বার উপায় নেই। কিন্তু রামমোহন বারম্বার বলেছেন, পরমেশ্বর স্রষ্টা, পাতা, কর্ত্তা, নিয়ন্তা; তিনি সর্ব্বদর্শী, পুণ্যপাপের শাস্তা; তিনি সর্ব্বজীবের হিতকারী, প্রার্থনার পূরণকর্ত্তা। বস্তুতঃ, এ সকলই তটস্থ লক্ষণে জানা। অতএব, তটস্থ লক্ষণে জানাকে তুচ্ছ করা যায় না। তটস্থ লক্ষণেই তাঁর উপাসনা কর্‌তে হবে।

(ঝ) ব্রহ্মকে ইন্দ্রিয়ের গোচর করিয়া জানা অসম্ভব।

লোকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থসকলকে যে ভাবে দেখে, শুনে, ব্যবহার করে, ব্রহ্মকেও সেইভাবে দেখ্‌তে শুন্‌তে ও ব্যবহার কর্‌তে চায়। রামমোহন রায় বল্‌চেন, এটি সম্ভব নয়। কেন না, ব্রহ্ম ইন্দ্রিয়ের অগোচর। যা-কিছু ইন্দ্রিয়ের গোচর, তাই পরিমিত ও নশ্বর; তা কখনও ব্রহ্ম হতে পারে না। এ সম্বন্ধে রামমোহন কেনোপনিষদের এই তেজঃপূর্ণ বাক্যসকল নানা প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করেছেন :—

"যদ্বাচাঽনভ্যুদিতং, যেন বাগভ্যুদ্যতে।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি, নেদং যদিদমুপাসতে॥
যন্মনসা ন মনুতে, যেনাহুর্ম্মনো মতং।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি, নেদং যদিদমুপাসতে॥
যচ্চক্ষুষা ন পশ্যতি, যেন চক্ষূংষি পশ্যতি।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি, নেদং যদিদমুপাসতে॥
যচ্ছ্রোত্রেণ ন শৃণোতি, যেন শ্রোত্রমিদং শ্রুতং।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি, নেদং যদিদমুপাসতে॥
যৎ প্রাণেণ ন প্রাণিতি, যেন প্রাণঃ প্রণীয়তে।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি, নেদং যদিদমুপাসতে॥

অর্থ:—যিনি বাক্য দ্বারা প্রকাশিত হন না, যাঁহাকর্ত্তৃক বাক্য প্রকাশিত হয়, কেবল তাঁকেই তুমি ব্রহ্ম বলে' জেনো; লোকে এই যে-কিছু (বাক্য দ্বারা প্রকাশযোগ্য) পদার্থের উপাসনা করে, তা ব্রহ্ম নয়।

যাঁকে লোকে মন দ্বারা মনন কর্‌তে পারে না, যিনি মনকে জান্‌চেন বলে' ব্রহ্মবিদেরা বলেন, কেবল তাঁকেই তুমি ব্রহ্ম বলে' জেনো; লোকে এই যে-কিছু (মননযোগ্য) পদার্থের উপাসনা করে, তা ব্রহ্ম নয়।

যাঁকে লোকে চক্ষু দ্বারা দেখ্‌তে পায় না, যাঁর শক্তিতে চক্ষুর্গোচর সকল বস্তুকে দেখে, কেবল তাঁকেই তুমি ব্রহ্ম বলে' জেনো; লোকে এই যে-কিছু (দর্শনযোগ্য) পদার্থের উপাসনা করে, তা ব্রহ্ম নয়।

যাঁকে লোকে কর্ণেন্দ্রিয় দ্বারা শুন্‌তে পায় না, যিনি কর্ণেন্দ্রিয়কে জানেন, কেবল তাঁকেই তুমি ব্রহ্ম বলে' জেনো; লোকে এই যে-কিছু (শ্রবণযোগ্য) পদার্থের উপাসনা করে, তা ব্রহ্ম নয়।

যাঁকে লোকে ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা আঘ্রাণ কর্‌তে পারে না, যাঁর শক্তিতে ঘ্রাণেন্দ্রিয় নিজ কার্য্যে নিযুক্ত হয়, কেবল তাঁকেই তুমি ব্রহ্ম বলে' জেনো ; লোকে এই যে-কিছু (আঘ্রাণযোগ্য) পদার্থের উপাসনা করে, তা ব্রহ্ম নয়।

এমন যিনি সর্ব্বেন্দ্রিয়ের অগোচর, তাঁকে ইন্দ্রিয়ের গোচররূপে কল্পনা কর্‌লে, তাঁকে সত্য ভাবে জানার সম্ভাবনাই লোপ পায়। কারণ ইন্দ্রিয়ের গোচর কোনও পদার্থ তিনি নন।

(ঞ) তাঁহাকে তটস্থ লক্ষণে উপাসনা করিতে সকলেই সক্ষম।

তবে তাঁকে কিরূপে উপাসনা কর্‌তে হবে ? পূর্ব্বেই বলা হয়েছে, তটস্থ লক্ষণ দ্বারা। তটস্থ লক্ষণ দ্বারা উপাসনা কর্‌তে সকলেই পারে। শঙ্কর শাস্ত্রীর সহিত বিচারে রামমোহন বলেছিলেন (W. 94)—আমি স্বীকার করি, ব্রহ্মস্বরূপের পূর্ণ জ্ঞান লাভ করা অতি কঠিন, এমন কি অসম্ভব ; কিন্তু জগৎ-কার্য্যের পর্য্যালোচনা দ্বারা পরমেশ্বরের অস্তিত্ব নির্ণয় করে' তাঁর উপাসনা করা এমন কিছু কঠিন কার্য্য নয় যে, যে-কোনও সাধারণ জ্ঞানবিশিষ্ট মানুষ, কুসংস্কার হতে মুক্ত হলে, তা কর্‌তে পারে না। মূর্ত্তিপূজকেরা সর্ব্বদাই কৃত্রিম মূর্ত্তিতে একই সময়ে ঐশ্বরিক ও মানবীয় দুই বিপরীত প্রকৃতি আরোপ করেন [এ বিষয়ে ১০ (ক) দ্রষ্টব্য] ; এবং আশ্চর্য্য এই যে, তাঁরা বিশ্বাস করেন, স্বহস্তনির্ম্মিত মূর্ত্তিকে মন্ত্রাদি উচ্চারণের দ্বারা বিশ্বজগতের স্রষ্টারূপে পরিণত করা যায়। জগৎকার্য্যে পরমেশ্বরের সত্তা নির্ণয় করে' উপাসনা কর্‌লে, এ সকল কল্পনার আশ্রয় নিতে হয় না।

(ট) স্বজাতীয় বিজাতীয় অনেকেই তাঁহার উপাসনা করিতেছেন।

সাধারণ লোক নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনা কর্‌তে পারে না, এ কথা রামমোহন রায় স্বীকার কর্‌তেন না। তিনি বল্‌চেন (গ্র, ৩—৪)—"আর এক অধিক আশ্চর্য্য এই যে, স্বজাতীয় বিজাতীয় অনেকেই নিরাকার ঈশ্বরের উদ্দেশে উপাসনা করিতেছেন, ইহা প্রত্যক্ষ দেখিতেছেন, অথচ কহিতেছেন যে, নিরাকার ঈশ্বর, তাঁহার উপাসনা কোন মতে হইতে পারে না।"

অন্যত্র বল্‌চেন (গ্র, ১১)—"এই হিন্দোস্থান ভিন্ন অর্দ্ধেক হইতে অধিক পৃথিবীতে এক নিরঞ্জন পরব্রহ্মের উপাসনা লোকে করিয়া থাকেন। এই হিন্দোস্থানেতেও শাস্ত্রোক্ত নির্ব্বাণ সম্প্রদা, এবং নানক সম্প্রদা, আর দাদু সম্প্রদা, এবং শিবনারায়ণী প্রভৃতি অনেকে, কি গৃহস্থ কি বিরক্ত, কেবল নিরাকার পরমেশ্বরের উপাসনা করেন। তবে কিরূপে কহেন যে, তাবৎ পৃথিবীর মতের বহির্ভূত এই ব্রহ্মোপাসনার মত হয়?"

আর এক স্থলে (W, 96) ইংরাজীতে যা বল্‌চেন, তার মর্ম্ম এই—আমি সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করি, আরব ও তুরস্ক দেশের উচ্চতম হতে নিম্নতম শ্রেণীর প্রত্যেক মুসলমান, ইউরোপের খ্রীষ্টানগণের মধ্যে অন্ততঃ প্রত্যেক প্রোটেষ্টাণ্ট্ খ্রীষ্টান, এবং এই ভারতবর্ষেরই কবীর ও নানক সম্প্রদায়ের লোকেরা কি মূর্ত্তির অবলম্বন ভিন্ন ঈশ্বরের উপাসনা করেন না? যদি বল 'করেন', তবে কিরূপে আমরা স্বীকার কর্‌তে পারি যে, মানবজাতি দৃশ্য পদার্থের অবলম্বন-রূপ বালকোচিত উপায় ব্যতীত সেই পরম পুরুষের উপাসনা কর্‌তে সক্ষম নয়?

৪। দ্বিতীয় শ্রেণীর যুক্তি ও তাহার উত্তর।

(যে-কোনও সৃষ্ট পদার্থে ঈশ্বরের উপাসনা হইতে পারে কি না ?)

(ক) 'ব্রহ্ম সর্ব্বময় ; 'যে-কোনও পদার্থে তাঁহার উপসনা না হইবে কেন ?'—উত্তর।

মূর্ত্তিপূজার সপক্ষে দ্বিতীয় শ্রেণীর যুক্তি এই যে, ব্রহ্ম যখন সর্ব্বময়, তখন যে-কোনও পদার্থে তাঁর উপাসনা না হবে কেন ? ঈশ্বর সর্ব্বত্র আছেন, কেবল কি পূজার্থ নির্ম্মিত মূর্ত্তিতেই নেই ?

আপনারা লক্ষ্য করে' দেখুন, এই শ্রেণীর যুক্তিতে মূর্ত্তিপূজার সমর্থক পূর্ব্বের ভূমি পরিত্যাগ করলেন। অর্থাৎ, ব্রহ্মকে ধারণা করা যায় না, তা নয় ; আপত্তিকারী নিজেই তাঁকে সর্ব্বময় বলে' ধারণা করচেন, এবং বিশেষ মূর্ত্তিতে তাঁকে সর্ব্বময় বলে'ই ধারণা করতে চাচ্চেন।

ভট্টাচার্য্য প্রশ্ন করলেন—ব্রহ্ম হতে ভিন্ন কি বস্তু আছে, যে, তার উপাসনাতে ব্রহ্মের উপাসনা হবে না ? রামমোহন এর উত্তরে যা বল্লেন (গ্র, ৭০৬), তার মর্ম্ম এই—জগতে ব্রহ্ম হতে ভিন্ন বস্তু নেই, এই হেতুতে যদি যে-কোনও বস্তুর উপাসনা দ্বারা ব্রহ্মোপাসনা সিদ্ধ হয়, তবে এই যুক্তিতে কি দেবতা, কি মনুষ্য, কি পশুপক্ষী, সকলেরই উপাসনার তুল্যরূপে বিধি পাওয়া গেল। তা হলে, নিকটস্থ স্থাবর-জঙ্গম পরিত্যাগ করে' আয়াস স্বীকারপূর্ব্বক মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করবার, বা দূরস্থ দেবতা-বিগ্রহের নিকট যাবার, কি প্রয়োজন ?

এই কথায় রামমোহন ইঙ্গিত করচেন যে, যখন কোনও মূর্ত্তির পূজা কর, তখন সর্ব্বময় ব্রহ্মের চিন্তা কর না ; ঐ মূর্ত্তিরই চিন্তা কর এবং তার সম্মুখে পত্রপুষ্প নৈবেদ্যাদি প্রদান কর। তা না হলে নিকটের নানা

পদার্থ পরিত্যাগ করে' মূর্ত্তির কাছে যেতে না। বাস্তবিক কোনও সৃষ্ট বস্তুতে সর্ব্বময় ব্রহ্ম আছেন এই চিন্তা করা, আর সেই বস্তুটিকেই উপাস্যরূপে স্থাপন করা, এ দু'য়ে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। বেদান্ত সূত্রে (৩।৩।৬২) উপদেশ দেওয়া হয়েছে—সমুদয় পদার্থই বিরাট্ পুরুষের (অর্থাৎ ব্রহ্মের) অঙ্গ ; সুতরাং কোনও একটি পদার্থকে তাঁর অঙ্গ বলে' ভাব্তে বাধা নেই ; কিন্তু সেই পদার্থকে স্বতন্ত্র রূপে উপাসনা কর্বে না।

রামমোহন রায় অন্যত্র (গ্র, ৬—৭) বলেছেন—"যদি ব্রহ্ম সর্ব্বময় জানেন, তবে বিশেষ বিশেষ রূপেতে পূজা করিবার তাৎপর্য্য হইত না। এ স্থানে এমত যদি কহেন যে, ঈশ্বরের আবির্ভাব যে রূপেতে অধিক আছে তাহার উপাসনা করা যায়, তাহার উত্তর এই—যে ন্যূনাধিক্য এবং হ্রাসবৃদ্ধি দ্বারা পরিমিত হইল সে ঈশ্বর-পদের যোগ্য হইতে পারে না। অতএব, ঈশ্বর কোন স্থানে অধিক আছেন, কোন স্থানে অল্প, এ অত্যন্ত অসম্ভাবনা। বিশেষত এ সকল রূপে [অর্থাৎ মূর্ত্তিতে] প্রত্যক্ষে কোন অলৌকিক আধিক্য দেখা যায় না।"

ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে রামমোহন এই মর্ম্মে আরও বলেছিলেন (গ্র, ১০৬—৭) যে, যদি বলেন, দূরস্থ দেবতা-বিগ্রহ ও নিকটস্থ স্থাবর-জঙ্গমের উপাসনা কর্লে তুল্যরূপেই সর্ব্বব্যাপী পরমেশ্বরের উপাসনা হয় বটে, কিন্তু শাস্ত্রে বিধি আছে এ জন্যই দেব-বিগ্রহের পূজা করি, তা হলে স্মরণ করুন, শাস্ত্র কেবল নিম্নাধিকারীর জন্য ঐ সকল পূজার অনুমতি দিয়েছেন। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির প্রতি পরমাত্মার উপাসনাই উপদেশ করেছেন ; সুতরাং পরমাত্মার উপাসনাই করা উচিত। "শাস্ত্র মানিলে সর্ব্বত্র মানিতে হয়"।

বাস্তবিক, দেব-বিগ্রহ পুরাণ-বর্ণিত দেব-কাহিনীকেই স্মরণ করিয়ে দেয়, সর্ব্বময় ব্রহ্মকে স্মরণ করায় না। অতএব, দেবপূজার সমর্থনে 'ব্রহ্ম সর্ব্বময়' এই যুক্তি আনা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক।

কোনও একটি সৃষ্ট পদার্থকে ব্রহ্ম বলে' উপাসনা করা বিষয়ে রামমোহন রায় আর এক স্থলে (গ্র, ৩) এইরূপ বলেছেন—জগতের কর্ত্তা অবশ্যই জগৎ অপেক্ষা ব্যাপক ও অধিক শক্তিমান্; সুতরাং জগতের অন্তর্গত কোনও এক পদার্থকে, অর্থাৎ জগতের একটি অতি ক্ষুদ্র অংশকে, জগতের কর্ত্তা বলে' কোন্ যুক্তিতে স্বীকার করা যায়?

শঙ্কর শাস্ত্রী বলেছিলেন—সমুদ্রের একাংশকে স্তুতি কর্‌লে সমগ্র সমুদ্রকেই স্তুতি করা হয়। এর উত্তরে রামমোহন রায় বল্‌তে পার্‌তেন যে, একাংশের সম্মুখে দাঁড়িয়ে বাস্তবিক সমগ্রকে ভাব্‌লে সমগ্রেরই স্তুতি হয় বটে, কিন্তু যদি ঐ একাংশকেই ভাবা যায় এবং তাকেই 'সমগ্র' বলা হয়, তবে সমগ্রের স্তুতি হয় না। বরং তাতে সমগ্রের অনন্ততা-জ্ঞান ক্রমে হারাতে হয়। কিন্তু রামমোহন এই উত্তর না দিয়ে শাস্ত্রী মহাশয়ের উক্তিসমূহের অসঙ্গতি দেখালেন (W. 97-98)। তিনি বল্লেন, দেবতারা কি সমুদ্রের অংশের ন্যায় ঈশ্বরের অংশ? তবে তাঁদের কখনও বা ঈশ্বরের স্বরূপ (attribute)-সমূহের মূর্ত্তি, কখনও বা ঈশ্বরের অমাত্য ('ministers') বলেন কি করে'? অংশ হলে বা স্বরূপ-সমূহের মূর্ত্তি হলে ত তাঁদের পৃথক্ অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় না। আবার, অমাত্য হলে পৃথক্ অস্তিত্ব মান্‌তে হয়। রামমোহন রায় শাস্ত্রী মহাশয়কে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, প্রকৃতপক্ষে বর্ত্তমান কালের হিন্দুগণ দেবতাসকলকে পৃথক্ পৃথক্ ব্যক্তিই মনে করেন, এবং যত অযৌক্তিক ভাবেই হউক, প্রত্যেককেই স্বাধীন ও সর্ব্বশক্তিমান্ মনে করেন। আর

তাঁরা ঈশ্বরলাভের উপায়রূপে দেবতাদের পূজা করেন না, দেবতাদিগকেই চরম উপাস্য বলে' গণ্য করেন।

(খ) 'কোন সৃষ্ট পদার্থকেও ভ্রমক্রমে ঈশ্বর বোধে উপাসনা করিলে ফলসিদ্ধি অবশ্য হবে'—উত্তর।

ভট্টাচার্য্য আর এক যুক্তি দিয়েছিলেন। তা এই যে, যদি সর্ব্বত্র ব্রহ্মস্ফূর্ত্তি না হয়, তবে এক একটি সৃষ্ট পদার্থকে ঈশ্বরবোধে উপাসনা করলেও ফলসিদ্ধি অবশ্য হবে। আপন বুদ্ধিদোষে কোনও বস্তুকে যথার্থরূপে না জান্‌লেও ফলসিদ্ধির হানি হতে পারে না। যেমন, স্বপ্নে মিথ্যা ব্যাঘ্রাদি দেখ্‌লে কি ভয় উৎপন্ন হয় না?

এর উত্তরে রামমোহন শুধু একটু ব্যঙ্গ কর্‌লেন; বল্লেন (গ্র, ৭০৭—৮)—ভট্টাচার্য্য আপনার অনুগত ব্যক্তিদের উত্তম শিক্ষা দিচ্চেন বটে! তিনি তাদের বলে' দিচ্চেন যে, স্বপ্নে ব্যাঘ্রাদি দর্শনে যেরূপ ফল হয়, সৃষ্ট বস্তুকে বুদ্ধিদোষে ঈশ্বর জ্ঞান কর্‌লেও সেইরূপ ফলই হয়; অর্থাৎ স্বপ্ন ভঙ্গ হলে যেমন ব্যাঘ্রাদি দর্শনের ফল নষ্ট হয়, তেমনি ভ্রম দূর হলে কাল্পনিক উপাসনার ফলও বিলুপ্ত হয়। ভট্টাচার্য্যের কোনও বুদ্ধিমান্ শিষ্য যখন এইটি বুঝ্‌বেন, তখন অবশ্য জ্ঞানসম্মত উপাসনার যে অবিনাশী ফল, তার উপার্জ্জনে যত্নশীল হবেন।

মূর্ত্তিপূজায় যে ভাবমুগ্ধতা জন্মায়, ভট্টাচার্য্য মহাশয় বোধ হয় তাকেই উপাসনার 'ফলসিদ্ধি' মনে করেছিলেন। ভাবমুগ্ধতা বিষয়ে ১০ম অধ্যায় (গ) ও (ঘ) দ্রষ্টব্য।

(গ) মূর্ত্তি সকলেতে বাস্তবিক ঈশ্বরেরই উপাসনা করা হয় কি না?

রামমোহন রায়ের সময়ে এদেশে ইউরোপীয়দের সংখ্যা অল্প ছিল; এবং তাঁরা দেশীয়দের সহিত এখনকার চেয়ে অধিক সংশ্রব রাখতেন।

যেমন করে' হউক, তাঁদের মধ্যে অনেকের এই ধারণা জন্মেছিল যে, হিন্দুরা দেবমূর্ত্তিসকলেতে ঈশ্বরেরই পূজা করে। রামমোহন রায় এই ভ্রম দূর কর্‌বার জন্য বেদান্তসারের ইংরাজী অনুবাদের ভূমিকায় (W. 4) লিখ্‌লেন—আমি লক্ষ্য করেছি যে, অনেক ইউরোপীয় ভদ্রলোক তাঁদের কথাবার্ত্তায় ও লেখায় হিন্দু পৌত্তলিকতার দোষ সকলকে লঘু বলে' প্রকাশ করেন ও ক্ষালনের চেষ্টা করেন। তাঁরা এই বল্‌তে চান যে, মূর্ত্তিপূজকেরা পূজার পদার্থসকলকে মহান্ পরমেশ্বরেরই স্মারক চিহ্নস্বরূপ বিবেচনা করেন। ইহা যদি বাস্তবিক সত্য হত, তা হলে বিষয়টিকে আমি হয়ত কিছু চিন্তা করে' দেখ্‌তাম। কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, বর্ত্তমান কালের হিন্দুগণ মোটেই এরূপ মনে করেন না। তাঁরা অগণ্য দেবদেবীর যথার্থ অস্তিত্বে দৃঢ় বিশ্বাস করেন, এবং মনে করেন যে, নিজ নিজ বিভাগে ঐ সকল দেবদেবীর পূর্ণ ও স্বাধীন ক্ষমতা আছে। তাঁদেরই তুষ্টি সাধনের জন্য মন্দিরসমূহ নির্ম্মিত হয় এবং পূজাহোমাদি করা হয়; সত্য ঈশ্বরের উদ্দেশে নয়।

দেবমূর্ত্তিসকল যে বাস্তবিক ঈশ্বরের প্রতিমা নয়, এ বিষয়ে পরে বিস্তৃত আলোচনা করা যাবে [১০ (ঙ) দ্রষ্টব্য]।

৫। তৃতীয় শ্রেণীর যুক্তি ও তাহার উত্তর।

(ঈশ্বর নিরাকার অথচ সাকার, এ কথা সত্য কি না ?)

(ক) 'নিরাকার ব্রহ্ম সাকার হইয়া দর্শন দেন';—উত্তর।

মূর্ত্তিপূজার সমর্থনে তৃতীয় শ্রেণীর যুক্তি এই যে, ব্রহ্ম নিরাকার হলেও, তিনি যখন সর্ব্বশক্তিমান্ তখন সাকার হয়ে দর্শন দিতেও পারেন।

তিনি দেবদেবীর মূর্ত্তি গ্রহণ করে' ভক্তজনের পূজা নেবেন, এতে আশ্চর্য্য কি ? এতে তাঁর ভক্তবৎসলতাই প্রকাশ পায়।

ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচারে রামমোহন রায় স্বয়ং এই প্রশ্ন উত্থাপন করে' বলেছেন (গ্র, ৬৮৮)—ব্রহ্ম জগতের সৃষ্টি প্রভৃতি কার্য্যে সর্ব্বশক্তিমান্ বটেন, কিন্তু আপনার স্বরূপের নাশ তিনি করতে পারেন না। যদি এক বার স্বীকার করা যায় যে, তিনি আপনার স্বরূপের নাশ করতে পারেন, তবে তাঁর নিজেরই নাশের সম্ভাবনা হল। কিন্তু যার নাশের সম্ভাবনা আছে, সে ত ব্রহ্ম হতে পারে না। অতএব, জগতের সম্বন্ধে ব্রহ্ম সর্ব্বশক্তিমান্ হলেও, আপনার স্বরূপের পরিবর্ত্তন বা নাশ বিষয়ে তাঁকে সর্ব্বশক্তিমান্ বলা যায় না। এজন্যই নিরাকার ব্রহ্ম কদাপি সাকার হতে পারেন না। কেন না, সাকার হলেই পরিমাণবিশিষ্ট হলেন এবং আকাশাদির ব্যাপ্য হলেন। তা হলে ব্রহ্মের বিরুদ্ধ ধর্ম্ম তাঁতে উপস্থিত হল। এ কখনও হতে পারে না।

'কবিতাকার' নামে খ্যাত এক পণ্ডিত বল্লেন—ব্রহ্ম বস্তুতঃ নিরাকার হলেও, ক্রিয়া উৎপন্ন করবার জন্য সাকার হয়ে আবির্ভূত হন। এ কথার উত্তরে রামমোহন বল্লেন (গ্র, ৬৬৯)—পরব্রহ্ম সর্ব্বদা এক অবস্থায় থাকেন। তাঁর ইচ্ছামাত্রেই সৃষ্ট্যাদি সমুদয় কার্য্য নিষ্পন্ন হয়। কার্য্য উৎপন্ন করবার জন্য তাঁর সাকার হবার প্রয়োজন হয় না। রূপ ধারণ না করলে তিনি কার্য্য করতে পারেন না, এ কথা বল্লে তাঁর অগৌরব করা হয়। দ্বিতীয়তঃ, এতে তাঁর অবস্থান্তর প্রাপ্ত হওয়া ও নশ্বর হওয়া স্বীকার করা হয়। তৃতীয়তঃ, এ কথা কেবল যুক্তির বিরুদ্ধ নয়, তাবৎ বেদেরও বিরুদ্ধ ; কারণ বেদে তাঁকে রূপরহিত, নিত্য ও পরিবর্ত্তনহীন বলেন।

(খ) 'যিনি নিরাকার, তিনিই সাকার'—উত্তর।

কবিতাকার আরও বল্লেন—'যিনি সাকার, তিনিই নিরাকার ব্রহ্ম'। এর উত্তরে রামমোহন বল্লেন (গ্র, ৬৬৩)—এ অত্যন্ত অশাস্ত্রীয় ও সর্ব্বপ্রকারে যুক্তিবিরুদ্ধ কথা। বেদান্ত-সূত্রে (৩।২।১১) আছে-'ন স্থানতোঽপি পরস্যোভয়লিঙ্গং সর্ব্বত্র হি' পরমেশ্বরের উভয় লক্ষণ, অর্থাৎ নিরাকার ও সাকার দুই প্রকার ভাব, হওয়া সম্ভব নয়। তাঁর সর্ব্বদা একই অবস্থা, এবং তিনি সর্ব্বোপাধিশূন্য। সর্ব্বত্র এই নিয়ম যে, আকারের ভাব ও অভাব এক কালে একই বস্তুতে সম্ভব হতে পারে না। 'তে যদন্তরা তদ্ব্রহ্ম" (ছান্দোগ্য, ৮।১৪।১)—ব্রহ্ম নামরূপ হতে ভিন্ন। 'দিব্যোহ্যমূর্ত্তঃ পুরুষঃ' (মুণ্ডক, ২।১।২)—ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ এবং আকারহীন। 'অরূপবদেব হি তৎপ্রধানত্বাৎ' (বেদান্ত সূত্র, ৩।২।১৪)—পরব্রহ্ম রূপবিশিষ্ট কোন প্রকারে নন, যেহেতু নিরাকার-প্রতিপাদক শ্রুতিরই প্রাধান্য।

ভট্টাচার্য্য বলেছিলেন—পরমাত্মার দেহ আছে। তদুত্তরে রামমোহন বল্লেন (গ্র, ৬৮৬—৮৭)—এরূপ কথা বল্লে সকল বেদকে তুচ্ছ করা হয়। এই বলে' উপরে লিখিত বচনসকল ও অন্যান্য বচন উদ্ধৃত করলেন, এবং বল্লেন, এ কথা বেদ-সম্মত যুক্তিরও বিরুদ্ধ ; কারণ মূর্ত্তি স্বীকার করলেই তা পরিমিত ও নশ্বর হবে। পরমাত্মা সেরূপ হতে পারেন না।

(গ) 'ব্রহ্ম সাকার কৃষ্ণ-মূর্ত্তি ; সে মূর্ত্তি আনন্দের মূর্ত্তি'—উত্তর।

গোস্বামী মহাশয় বল্লেন—ব্রহ্ম সাকার কৃষ্ণমূর্ত্তি ; কিন্তু সে আকার মায়িক নয় ; তা আনন্দের মূর্ত্তি। আর সেই আকার কেবল ভক্তজনের চক্ষুগোচর হয়। রামমোহন এ কথায় বল্লেন (গ্র, ৬৩২—৩৩)—তাবৎ

বেদান্ত এবং দর্শনশাস্ত্রসকল বল্‌চেন, ব্রহ্ম আকারবিশিষ্ট সকল পদার্থ হতে ভিন্ন। আর "বেদসম্মত যুক্তি দ্বারাতেও প্রতিপন্ন হইতেছে, যে বস্তু সাকার, সে নিত্য সর্ব্বব্যাপি ব্রহ্মস্বরূপ কদাপি হইতে পারে না। যেহেতু প্রত্যক্ষ আমরা দেখিতেছি যে, আকার-বিশিষ্ট কোন এক বস্তু যদ্যপিও অতি বৃহৎ হয়, তথাপি আকাশের এবং দিক্ ও কালের অবশ্য ব্যাপ্য হইয়া থাকে; বিশ্বের ব্যাপক হইয়া থাকিতে পারে না। সুতরাং সেই বস্তু অবশ্যই পরিমিত ও নশ্বর হইবেক। এবং ইহাও প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, যে-কোনও বস্তু চক্ষু-গোচর হয়, সে কদাপি স্থায়ী নহে। অতএব, প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ যে অস্থায়ী এবং পরিমিত, তাহাকে ব্যাপক এবং নিত্যস্থায়ী পরমেশ্বর করিয়া কিরূপে কহা যায়? আর, যাহা বেদের বিরুদ্ধ ও সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষের বিরুদ্ধ তাহাকে, বেদে যে ব্যক্তির শ্রদ্ধা আছে, এবং চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয় যাহার আছে, সে কিরূপে মান্য করিতে পারে?"

অতএব, ব্রহ্ম কোনও সাকার বস্তু নন, এবং কোনও সাকার বস্তুও ব্রহ্ম নয়। 'যিনি সাকার তিনিই নিরাকার', ~~অথবা~~ 'যিনি নিরাকার তিনিই সাকার', এ কখনও হতে পারে না।

কিন্তু 'কৃষ্ণমূর্ত্তি আনন্দের মূর্ত্তি; সে মূর্ত্তি কেবল ভক্তজনের চক্ষু-গোচর হয়' এ কথার উত্তর রামমোহন রায় কি দিলেন? রামমোহন রায় বল্লেন (গ্র, ৬৩৩)—"পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত ভিন্ন, কেবল আনন্দের আকার এবং সেই আকার কেবল ভক্তদের চক্ষু-গোচর হয়, আপকার এ কথা অত্যন্ত অসম্ভাবিত। যেহেতু পৃথিবী

জল তেজ ইত্যাদি প্রাকৃত বস্তু ব্যতিরেক কোনো আকার চক্ষু-গোচর হইয়াছে, কিম্বা হইবার সম্ভাবনা আছে, এরূপ বিশ্বাস তাবৎ হইতে পারে না, যাবৎ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সকল পক্ষপাতের দ্বারা অবশ না হয়। যদি বল, পৃথিব্যাদি ভিন্ন আনন্দের একটি অপ্রাকৃত আকার আছে, কিন্তু তাহা কেবল ভক্তদের দৃষ্টিগোচর হয়, ইহার উত্তর—শ্রুতি স্মৃতি এবং অনুভব ও প্রত্যক্ষ, ইহার বিরুদ্ধ আপনকার এ কথা সেইরূপ হয়, যেমন বন্ধ্যাপুত্র ও শশারুর শৃঙ্গ, ইহারো একটি একটি অপ্রাকৃত রূপ আছে, কিন্তু তাহা কেবল সিদ্ধ পুরুষের দৃষ্টিগোচর হয়; আর আকাশ-পুষ্পেরো অপ্রাকৃত এক প্রকার গন্ধ আছে, কিন্তু তাহা কেবল যোগীদের ঘ্রাণগোচর হয়। বস্তুতঃ, আনন্দের হস্তপাদাদি অবয়ব, এবং ক্রোধের ও দয়ার অবয়ব, এ সকল রূপক করিয়া বর্ণন হইতে পারে, কিন্তু যথার্থ করিয়া জানা ও জানান নেত্র-বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিকট কেবল হাস্যাস্পদ হয়। কিন্তু পক্ষপাত ও অভ্যাস, এ দুইকে ধন্য করিয়া মানি, যে, অনেককে অনায়াসে বিশ্বাস করাইয়াছে যে, আনন্দের রচিত হস্তপাদাদিবিশিষ্ট মূর্ত্তি আছেন; তাঁহার বেশভূষা বস্ত্র-আভরণ ইত্যাদি সকল আনন্দের হয়; এবং ধাম ও পার্শ্ববর্ত্তী ও প্রেয়সী এবং বৃক্ষাদি সকল আনন্দের রচিত; বস্তুত আনন্দের দ্বিতীয় ব্রহ্মাণ্ড হয়। অথচ, আনন্দের কিম্বা ক্রোধাদির ব্রহ্মাণ্ড দেখা দূরে থাকুক, অদ্যাপি কেহ আনন্দাদিরচিত কণিকাও দেখিতে পাইলেন না।”

(ঘ) 'রাম, কৃষ্ণ প্রভৃতি ঈশ্বরের অবতার'—উত্তর।

ভট্টাচার্য্য বল্লেন—যেমন কোনও মহারাজা প্রজাবর্গের রক্ষণের জন্য ছদ্মবেশে সামান্য লোকের ন্যায় নিজ রাজ্যে ভ্রমণ করেন, তেমনি ঈশ্বর রাম, কৃষ্ণ প্রভৃতি মনুষ্যরূপে আচ্ছন্নস্বরূপ হয়ে জগতের রক্ষা করেন। এর উত্তরে রামমোহন বল্লেন (গ্র, ৭০৮—৯)—কি রাম, কৃষ্ণ প্রভৃতির শরীরে, কি অন্য পদার্থে, জগতের সকল স্থানে ঈশ্বর প্রকাশ পাচ্চেন। আমাদের শরীরে এবং রাম কৃষ্ণাদির শরীরে ব্রহ্মস্বরূপের ন্যূনাধিক্য নেই; কেবল উপাধিভেদ মাত্র। প্রদীপ কাচপাত্রে থাক্‌লে বাহিরে প্রকাশ পায়, মৃণ্ময় পাত্রে থাক্‌লে প্রকাশ পায় না, এইমাত্র প্রভেদ; কিন্তু উভয়ের মধ্যে একই প্রদীপ। সেইরূপ ব্রহ্মসত্তা সর্ব্বত্র সমভাবে বর্ত্তমান; আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত তাঁর সত্তার তারতম্য নেই। এ বিষয়ে রামমোহন কয়েকটি শাস্ত্রীয় প্রমাণ দিলেন। তন্মধ্যে একটি এই—

"অহং যূয়মসাবার্য্য ইমে চ দ্বারকৌকসঃ।
সর্ব্বেপ্যেবং যদুশ্রেষ্ঠ বিমৃগ্যাঃ সচরাচরং॥" ভাগবতং

রামমোহন-কৃত অর্থ—"হে যদুবংশ-শ্রেষ্ঠ! আমি ও তোমরা ও এই বলদেব, আর দ্বারকাবাসি যাবৎ লোক, এ সকলকে ব্রহ্ম করিয়া জান। কেবল এ সকলকে ব্রহ্ম জানিবে এমত নহে, কিন্তু স্থাবর জঙ্গমের সহিত সমুদায় জগৎকে ব্রহ্ম করিয়া জান।"

'ব্রহ্ম করিয়া জান' অর্থাৎ ব্রহ্মের প্রকাশস্থল বলিয়া অনুভব কর। কারণ, ব্রহ্ম সর্ব্বময়। যাঁরা শ্রেষ্ঠ পুরুষ (বা অবতার) বলে' গণ্য, তাঁরাও অপর সকল মনুষ্য ও সকল পদার্থের ন্যায় ব্রহ্মের প্রকাশস্থল, কিন্তু ব্রহ্ম নহেন [নিম্নে (জ) দ্রষ্টব্য]।

রামমোহন কবিতাকারকে পূর্ব্বে বলেছেন (৪৫ পৃঃ) যে, ব্রহ্ম ইচ্ছামাত্র সব কর্‌তে পারেন; জগতের কার্য্য সম্পাদনের জন্য তাঁর আকার গ্রহণ কর্‌বার প্রয়োজন হয় না। আর, ব্রহ্ম 'ছদ্মবেশে', 'আচ্ছন্ন-স্বরূপ হয়ে', পৃথিবীতে ভ্রমণ কর্‌বেন কেন? বিশেষতঃ, চতুর মনুষ্যেরা যদি তাঁকে চিনেই ফেল্ল, তবে তাঁর ছদ্মবেশ গ্রহণের সার্থকতাই বা রইল কোথায়?

(ঙ) সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মের অবতার কথন শাস্ত্রে নাই।

ধর্ম্মের গ্লানি নিবারণের জন্য বা ভূভার হরণের জন্য কাহারও স্বর্গ হতে ধরাধামে অবতীর্ণ হওয়ার যে মত প্রচলিত আছে, সে সম্বন্ধে রামমোহন রায় এইটি প্রণিধান কর্‌তে বলেছেন যে, শাস্ত্রে কোথাও ব্রহ্মের অবতীর্ণ হওয়ার বর্ণনা নেই; কেন না, ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বনিয়ন্তা, এবং তিনি ইচ্ছামাত্র সব কর্‌তে পারেন। যে সকল দেবতাতে মানবীয় ক্ষুদ্রতা ও শক্তিহীনতা আরোপ করা হয়, শাস্ত্রে কেবল তাঁদেরই অবতীর্ণ হওয়ার বর্ণনা আছে। ফলতঃ, যিনি ঊর্দ্ধে স্বর্গলোকে বাস করেন, পৃথিবীতে সর্ব্বদা থাকেন না, তাঁরই অবতরণের কথা হ'তে পারে; যিনি দূরে থাকা প্রযুক্ত এবং শক্তিহীনতা প্রযুক্ত সকল সময়ে রাজ্য মধ্যে শৃঙ্খলা রক্ষা কর্‌তে পারেন না, তাঁরই বিশেষ বিশেষ সময়ে শান্তি স্থাপনের জন্য নেমে আস্‌তে হয়। ব্রহ্মের প্রতি এ সকল ক্ষুদ্র ভাব কখনও আরোপ করা হয় নি, এবং হতে পারে না।

(চ) 'ব্রহ্ম দেবতাদের নিকট প্রকাশিত হইয়াছিলেন'—উত্তর

কেহ কেহ রামমোহন রায়কে বল্লেন—আপনি যে কেনোপনিষৎ প্রকাশ করেছেন তাতেই ত রয়েছে, যে, ব্রহ্ম দেবতাদের সম্মুখে প্রকাশিত হয়েছিলেন এবং তাঁদের সঙ্গে বাক্যালাপ করেছিলেন।

যদিও সেই প্রকাশ বিদ্যুৎপ্রকাশের ন্যায় বা চক্ষুর নিমেষের ন্যায় ছিল, তথাপি সেই সময়ে তিনি ত এক প্রকার সাকারই হয়েছিলেন। রামমোহন রায় এর উত্তরে বল্লেন (গ্র, ১৫৮)—এরূপ আপত্তি শুন্‌লে কেবল দুঃখ উপস্থিত হয়। সে দুঃখ এই যে, লোকেরা গ্রন্থের পূর্ব্বাপর না পড়ে' এবং বিবেচনাপূর্ব্বক না দেখেই আপত্তি করেন। কেনোপনিষদে প্রথমে ব্রহ্মকে বাক্য মন দর্শন শ্রবণ ঘ্রাণ ইত্যাদি ইন্দ্রিয়ের অগোচর বলে' যতদূর সম্ভব বর্ণনা কর্‌লেন [৩৭ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত শ্লোকসকল দ্রষ্টব্য]; পরে একটি আখ্যায়িকা দ্বারা, দেখালেন যে, ব্রহ্মের প্রদত্ত শক্তিতেই অগ্নি বায়ু ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতাদের শক্তি; তাঁদের নিজের কোনও শক্তি নেই। ঐ উপনিষদে এবং তার ভাষ্যে বলা হয়েছে যে, এই উপাখ্যানটি কল্পিত; বস্তুতঃ ব্রহ্মের উপমা নেই; তিনি কখনও চক্ষুগোচর হন না। উপাখ্যানটিকে কল্পিত বলে' স্বীকার না কর্‌লে ঐ উপনিষদেরই বাক্যসকলের পূর্ব্বাপর একতা থাকে না।

(ছ) 'সগুণ হইলেই সাকার হয়'—উত্তর।

ভট্টাচার্য্য বল্লেন যে, সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা মূর্ত্তিতেই করা উচিত; অর্থাৎ সগুণ হলেই সাকার হয়। এর উত্তরে রামমোহন বল্লেন (গ্র, ৬৮৯)—এ সম্পূর্ণ বেদান্তবিরুদ্ধ ও যুক্তিবিরুদ্ধ কথা। ব্রহ্মকে সগুণ বলে' মান্‌লে সাকার বলে'ও অবশ্য মান্‌তে হবে, এমন নয়। জীবাত্মারও ত ইচ্ছা প্রভৃতি গুণ আছে; কিন্তু সেই সগুণ জীবাত্মাকে ত কেহ সাকার বলে না। পরব্রহ্ম বিশেষরহিত, অনির্ব্বচনীয়; অথচ জগতের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়ের নিয়ম দেখে' তাঁকে স্রষ্টা পাতা সংহর্ত্তা ইত্যাদি বিশেষণের দ্বারা বেদে বর্ণনা করা হয়েছে। যথা, 'যতো বা

ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি, তদ্‌বিজিজ্ঞাসস্ব, তদ্‌ব্রহ্মেতি' (তৈত্তিরীয়, ৩।১)— "যাঁহা হইতে এই সকল বিশ্ব জন্মিয়াছে, আর জন্মিয়া যাঁহার আশ্রয়ে স্থিতি করে, মৃত্যুর পরে ঐ সকল বিশ্ব যাঁহাতে লীন হয়, তাঁহাকে জানিতে ইচ্ছা কর, তিনিই ব্রহ্ম হয়েন"। বেদব্যাসও বেদান্তের দ্বিতীয় সূত্রে তটস্থ লক্ষণে ব্রহ্মকে সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়ের কর্ত্তা বলে' বর্ণন করেছেন। কিন্তু তটস্থ লক্ষণে তাঁকে সগুণ বলাতে সাকার বলা হয়েছে, এমন নয়। কারণ অন্যান্য সূত্রে এবং অসংখ্য শ্রুতিতে তাঁকে ইন্দ্রিয়ের অগোচরই বলা হয়েছে।

(জ) 'শাস্ত্রে দেবতাদিগকে ব্রহ্ম বলা হইয়াছে'—উত্তর।

এখন প্রশ্ন হল—আচ্ছা, ব্রহ্ম ইন্দ্রিয়ের অগোচর, তা যেন বুঝ্‌লাম; কিন্তু শাস্ত্রে ত অনেক দেবতাকে ব্রহ্ম বলা হয়েছে। শাস্ত্র কি মিথ্যা?

কবিতাকার অনেক বচন উদ্ধৃত করে' দেখালেন যে, পুরাণাদিতে গণেশ, শক্তি, হরি, সূর্য্য, শিব ও গঙ্গা এই ছয় দেবতাকে ব্রহ্ম বলা হয়েছে। রামমোহন রায় বল্লেন (গ্র, ৬৬৫—৬৮)—কেবল এই ছয় দেবতা কেন, আকাশ, মন, আকাশ, অন্ন, প্রাণ, ইন্দ্র, গরুড় প্রভৃতি শত শত পদার্থ, দেবতা ও মনুষ্যকেও ব্রহ্ম বলেছেন। যথা (১) 'মনো ব্রহ্মেত্যুপাসীত'—মনই ব্রহ্ম, তার উপাসনা করবে; (২) 'তং মামায়ুরমৃতমিত্যুপাস্ব মামেব বিজানীহি'—অর্থাৎ ইন্দ্রই ব্রহ্ম; (৩) 'ত্বমস্তকঃ সর্ব্বমিদং ধ্রুবাধ্রুবং'—অর্থাৎ গরুড়ই ব্রহ্ম, (৪) 'চতুষ্পাদ বৈ ব্রহ্ম, ব্রহ্ম দাসা ব্রহ্ম কিতবাঃ, সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম,—চতুষ্পাদ (পশু) প্রভৃতি ব্রহ্ম; দাসেরা ও ধূর্ত্ত ব্যক্তিরা ব্রহ্ম; এই সমস্ত সংসারই ব্রহ্ম। এরূপ বর্ণনায় ঐ সকল পদার্থের সাক্ষাৎ ব্রহ্মত্ব প্রতিপন্ন হয় না। এ সকলকে ব্রহ্ম

বলার তাৎপর্য্য ব্রহ্ম যে সর্ব্বময় তাই বোঝান। ব্রহ্মের অধ্যাস (অর্থাৎ আরোপ) করে' সকল পদার্থকে ব্রহ্মরূপে বর্ণন কর্‌বার রীতি আছে। কিন্তু পৃথক্ পৃথক্ পদার্থকে সাক্ষাৎ ব্রহ্ম বলা শাস্ত্রের তাৎপর্য্য নহে (গ্র, ২)। আর, ঐ সকল পদার্থ যদি বাস্তবিকই ব্রহ্ম হবে, তবে শাস্ত্রে তাদের নশ্বর বলে' পুনঃ পুনঃ বল্লেন কেন? অন্যান্য সকল পদার্থের ন্যায় ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশাদি দেবতাদেরও সৃষ্ট ও নশ্বর বলা হয়েছে। এর প্রমাণ স্বরূপ রামমোহন কয়েকটি বচন উদ্ধৃত করেছেন। আমি সেগুলির উল্লেখ পরে কর্‌ব [১১ (খ) দ্রষ্টব্য]।

(ঝ) সৃষ্ট বস্তুতে ব্রহ্মের অধ্যাস হয়, কিন্তু ব্রহ্মে সৃষ্ট বস্তুর অধ্যাস হয় না।

'অধ্যাস' শব্দের অর্থ আরোপ বা কল্পনা। শাস্ত্রের নিয়ম এই যে, ব্রহ্ম সর্ব্বময়, এই হেতুতে সকল সৃষ্ট বস্তুতে ব্রহ্মের অধ্যাস করা যায়; কিন্তু ব্রহ্মেতে কোনও সৃষ্ট বস্তুর অধ্যাস করা যায় না; অর্থাৎ যে-কোনও সৃষ্ট বস্তুকে ব্রহ্ম বলা যায়, কিন্তু ব্রহ্মকে সৃষ্ট বস্তু বলা যায় না। রামমোহন বল্‌চেন (গ্র, ৫৯৫)—"নামরূপবিশিষ্টকে ব্রহ্ম করিয়া বর্ণন যেখানে দেখিবেন, সেই বর্ণনকে কল্পনা [অর্থাৎ অধ্যাস, বা আরোপ] মাত্র জানিবেন। যেহেতু, বেদান্তের ৪ অধ্যায়ে ১ পাদে ৫ সূত্রে কহেন—'ব্রহ্মদৃষ্টিরুৎকর্ষাৎ'—আদিত্যাদি যাবৎ নামরূপেতে ব্রহ্মের আরোপ করিতে পারে, কিন্তু ব্রহ্মেতে আদিত্যাদির কল্পনা করিবেক না; যেহেতু আদিত্যাদি নামরূপ হইতে সুতরাং পরব্রহ্ম উৎকৃষ্ট হয়েন। যেমন লোকেতে আরোপিত করিয়া রাজার দাসবর্গে রাজবুদ্ধি করিতে পারে; কিন্তু

রাজাতে দাসবুদ্ধি করিবেক না।" অর্থাৎ, সংসারে দেখা যায়, রাজার কর্ম্মচারী যে দারোগা, তাকে যদি কেহ রাজা বলে, তাতে কোনও দোষ হয় না; কিন্তু রাজাকে দারোগা বল্লে মহা অপরাধ হয়। সেইরূপ, অপর যে-কোনও বস্তু বা ব্যক্তিকে ব্রহ্ম বল ক্ষতি নেই; কিন্তু ব্রহ্মকে অপর কিছু বলো না।'

বেদান্ত পূর্ব্বোক্ত সূত্রের দ্বারা অপর সকল বস্তু হ'তে ব্রহ্মকে পৃথক্ রাখ্‌লেন। ছান্দোগ্য উপনিষদের 'তে যদন্তরা তদ্ ব্রহ্ম (৮।১৪।১) এই বচনেও ব্রহ্মকে স্পষ্টরূপে পৃথক্ রাখা হয়েছে। এই বচনের অর্থ— নামরূপবিশিষ্ট সকল পদার্থ যাঁ হতে ভিন্ন, তিনিই ব্রহ্ম।

(ঞ) 'দেবতারা স্বয়ং আপনাদিগকে ব্রহ্ম বলিয়াছেন'—উত্তর।

কিন্তু পুনরায় প্রশ্ন হল—কেবল যে উপাসকেরা অতিরিক্ত স্তুতি করে' দেবতাদের ব্রহ্ম বলেছেন, তা ত নয়; অনেক দেবতাও নিজেকে ব্রহ্ম বলে' পরিচয় দিয়েছেন। কবিতাকার বল্লেন—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব প্রভৃতি পঞ্চ দেবতা স্বয়ং আপনাদের ব্রহ্মস্বরূপ বলেছেন। তাঁরা ত আর মিথ্যা বল্‌বেন না?

এ কথার উত্তরে আজকালকার কোনও কলেজের ছাত্র হয়ত বল্‌ত—দেবতাদের বলার অর্থ কি? তাঁরা ত নিজ হাতে শাস্ত্র লিখে' যান নি; লিখেছে মানুষই। কিন্তু রামমোহন রায় তা বল্লেন না; কারণ তিনি শাস্ত্র-বিশ্বাসী পণ্ডিতদের শাস্ত্রানুসারে বোঝাতে প্রবৃত্ত হয়েছেন। অতএব, তিনি বল্লেন (গ্র, ৬৬৮)—কেবল এই পঞ্চ দেবতাই যে আপনাকে ব্রহ্মস্বরূপ বলেছেন, তা নয়। অন্য অন্য অনেক দেবতা ও ঋষি আপনাতে ব্রহ্মকে আরোপ করে' নিজেকে ব্রহ্মরূপে বর্ণন

করেছেন। যেমন, বৃহদারণ্যক উপনিষদে ইন্দ্র বলেছেন—'মামেব বিজানীহি'—কেবল আমাকেই তুমি জান; বামদেব বলেছেন—'অহং মনুরভবম্ সূর্য্যশ্চেতি'—আমি মনু হয়েছিলাম, আমি সূর্য্য হয়েছিলাম। শাস্ত্রানুসারে প্রত্যেক ব্যক্তি অধ্যাত্ম চিন্তনের বলে আপনাকে ব্রহ্মরূপে বর্ণন কর্‌বার অধিকারী। কেবল তা নয়, স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যের আহ্নিক তত্ত্বে লিখিত বচন অনুসারে প্রত্যেককে প্রতিদিন প্রাতঃকালে স্মরণ কর্‌তে হয় 'আমি ব্রহ্ম'। সেই বচনটি এই ঃ—

"অহং দেবো নচান্যোঽস্মি ব্রহ্মৈবাস্মি ন শোকভাক্।
সচ্চিদানন্দরূপোঽস্মি নিত্যমুক্তস্বভাববান্॥"

অর্থ—আমি দেবস্বরূপ, অন্য নই; আমি ব্রহ্মই, শোকের অধীন নই। আমি সৎ চিৎ আনন্দস্বরূপ এবং নিত্যমুক্ত-স্বভাববিশিষ্ট।

আপনাকে ব্রহ্মরূপে বর্ণন কর্‌বার সিদ্ধান্ত বেদান্ত-সূত্রে মহর্ষি বাদরায়ণ করেছেন। 'শাস্ত্রদৃষ্ট্যাতূপদেশো বামদেববৎ' (১।১।৩০)—ইন্দ্র যে আপনাকে ব্রহ্ম বলেছেন, সে আপনাতে ব্রহ্ম দৃষ্টি করে', যেমন ঋষি বামদেব বলেছিলেন। এরূপ বল্‌বার অধিকারী সকলেই। অতএব, কোনও কোনও দেবতা আপনাকে ব্রহ্ম বলেছেন বলেই যে তাঁরা ব্রহ্ম হয়ে গেলেন ও আমাদের উপাস্য হলেন, তা নয়। তাঁরা সকলেই সৃষ্ট ও নশ্বর। একমাত্র ব্রহ্মই নিত্য এবং তিনিই উপাস্য। (গ্র, ৩০৫—৭ দ্রষ্টব্য)।

'ভাগবতে ও মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে সর্ব্বস্বরূপ ব্রহ্ম বলেছেন; অতএব কেবল তিনিই সাক্ষাৎ ব্রহ্ম'—এ কথা যদি কেহ বলেন, তবে তারও ঐ একই উত্তর। রামমোহন বল্‌চেন (গ্র, ৬৪০—৪১)—ভাগবতে কৃষ্ণ যেমন আপনাকে ব্রহ্ম বলেছেন, তেমনি ঐ ভাগবতেরই তৃতীয়

স্কন্ধে কপিলও আপনাকে সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মস্বরূপ ব্রহ্ম বলেছেন। আপনাতে ব্রহ্মের আরোপ করে' এরূপ বল্‌বার রীতি আছে। তাতে কেহ সত্য সত্য ব্রহ্ম হয়ে যায় না।

৬। চতুর্থ শ্রেণীর যুক্তি ও তাহার উত্তর।

(দেবতারা ঈশ্বরের স্বরূপ বা কর্ম্মচারী কি না ?)

(ক) 'দেবতারা ঈশ্বরের নানা স্বরূপের প্রকাশক'—উত্তর।

বহুদেবতা পূজার সমর্থনে চতুর্থ শ্রেণীর যুক্তি এই যে, স্বীকার করি, জগতের স্রষ্টা পাতা এক ভিন্ন দুই নন; কিন্তু তাঁর নানা স্বরূপের প্রকাশক রূপে অথবা তাঁর অধীনে নানা বিভাগে জগদ্‌ব্যাপারের পরিচালক রূপে ভিন্ন ভিন্ন দেবতার পূজা কর্‌তে বাধা কি ?

এই শ্রেণীর যুক্তির উত্তরে রামমোহন বল্‌চেন—না; তিনি যখন এক, তখন সেই একেরই উপাসনা কর্‌তে হবে। শাস্ত্র এককেই উপাসনা কর্‌তে বলেন (গ্র, ২)। শাস্ত্রানুসারে একের উপাসনা ভিন্ন মুক্তি নেই (গ্র, ৬৯০—৯১)। এর প্রমাণ স্বরূপ তিনি নিম্নলিখিত বচনগুলি উদ্ধৃত করেছেন :—

(১) "ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি
নচেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ।"—কেনোপনিষৎ, ২।৮

অর্থ—এই সংসারেই যদি ব্রহ্মকে জানা যায় তবে মঙ্গল; এখানে যদি না জানা যায় তবে মহা বিনাশ।

(২) "তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।"—শ্বেতাশ্বতর, ৩।৮

অর্থ—একমাত্র তাঁকে জেনেই মানুষ মৃত্যুকে অতিক্রম করে; অমৃতত্ব লাভের অন্য পথ নেই।

(৩) "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ"—বৃহদারণ্যক, ২।৪।৫, ৪।৫।৬

অর্থ—পরমাত্মাকেই দর্শন, শ্রবণ, মনন ও ধ্যান কর্‌বে।

শঙ্কর শাস্ত্রী বলেছিলেন—দেবতাগণ ঈশ্বরের নানা স্বরূপের প্রকাশক। এ কথার উল্লেখ অন্য প্রসঙ্গে পূর্ব্বে (৪২ পৃঃ) করেছি; কিন্তু রামমোহন রায় কি উত্তর দিলেন, বলি নি। তিনি বল্লেন (W. 97)—আপনি বল্‌চেন, দেবতারা ঈশ্বরের স্বরূপ; জিজ্ঞাসা করি, সেই সকল স্বরূপের ঈশ্বর হতে পৃথক্ ও পরস্পর হতে পৃথক্ সত্তা আছে, কি নেই? যদি বলেন 'নেই', তবে ত পৃথক্ পৃথক্ রূপে তাঁদের পূজা করা কল্পনা মাত্র এবং সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। যদি বলেন 'আছে', তবে আবার প্রশ্ন—সে সকল সত্তা নিত্য, কি অনিত্য? যদি বলেন 'নিত্য', তবে বহু নিত্য সত্তা স্বীকার কর্‌তে হয়, যা বেদান্তের 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' মতের বিরুদ্ধ। যদি বলেন 'অনিত্য', তবে ব্রহ্মের স্বরূপসকল অনিত্য হওয়াতে তিনি স্বয়ং পরিবর্ত্তনের অধীন হলেন। তা হলে আমাদের নাস্তিকতায় গিয়ে পড়্‌তে হয়। অতএব, ব্রহ্মের স্বরূপসকলের পৃথক্ পৃথক্ অস্তিত্ব থাক্‌তে পারে না। তিনি এক, অখণ্ড।

তা ছাড়া, পুরাণাদিতে দেবতাদের সম্বন্ধে যে সকল নীতিবিরুদ্ধ আচরণের বর্ণনা আছে ব্রহ্মের শুদ্ধ স্বরূপের সঙ্গে তার সামঞ্জস্য হয় কিরূপে? ঈশ্বরের স্বরূপসকল কি পাপাচরণ কর্‌তে পারে? তারা কি

পরস্পরের প্রতি ঈর্ষ্যা করতে বা পরস্পরের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হতে পারে? তারা কি মানুষের ন্যায় আহার পান করে, চলে ফিরে বা নিদ্রা যায়? অতএব, বাস্তবিক দেবতারা ঈশ্বরের স্বরূপ নন।

দেবতারা কি, সে কথা পরে আলোচনা করা যাবে [১০ (ক) দ্রষ্টব্য]।

(খ) 'দেবতারা ঈশ্বরের কর্ম্মচারী'—উত্তর।

শঙ্কর শাস্ত্রী দেবতাদিগকে 'ঈশ্বরের স্বরূপ' বলার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর অমাত্য ('Ministers')ও বলেছিলেন। যেমন রাজার কাছে যেতে হলে অমাত্যদের শরণাপন্ন হতে হয়, তাঁরাই নিয়ে গিয়ে রাজার সঙ্গে পরিচিত করে' দেন, তেমনি ঈশ্বরের কৃপা পেতে হলে তাঁর স্বরূপসকলের (দেবতাদের) পূজা দ্বারাই পেতে হবে। রামমোহন রায় এর উত্তরে বল্লেন (W. 96—97)—ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বেদান্ত মত যেরূপ ব্যাখ্যা করেছেন, এ মত তার সংপূর্ণ বিপরীত। বেদান্ত মতে ব্রহ্ম অদ্বিতীয়; তাঁর সমপ্রকৃতি বা ভিন্নপ্রকৃতি অন্য দ্বিতীয় সত্তা নেই। অথবা এমন দ্বিতীয় কেহ নেই, যাকে তাঁর অংশ বা গুণ বলা যেতে পারে। এর প্রমাণ স্বরূপ রামমোহন কয়েকটি শাস্ত্রীয় বচন উদ্ধৃত করলেন। বাহুল্য ভয়ে সে গুলি এখানে উপস্থিত করতে ক্ষান্ত রইলাম।

শঙ্কর শাস্ত্রীর ন্যায় অন্য কেহ কেহও বলেছিলেন—ব্রহ্মদর্শন যেন রাজদর্শনের ন্যায়। রাজার দর্শন পেতে হলে যেমন অগ্রে দ্বারীদিগকে তুষ্ট করতে হয়, তেমনি ব্রহ্মকে দর্শন করতে হলে প্রথমে দেবতাদের পূজা আবশ্যক। এ কথার উত্তরে রামমোহন রায় বল্লেন (গ্র, ১০)—যদিও এই বাক্য উত্তর-যোগ্য নয়, তথাপি লোকের সন্দেহ দূর করবার জন্য উত্তর দিচ্চি। যে ব্যক্তি রাজদর্শনের জন্য দ্বারীর স্তুতি করে, সে দ্বারীকে কখনও রাজা বলে না। কিন্তু এখানে তার বিপরীত দেখ্‌চি; কারণ

রূপগুণবিশিষ্ট দেবতাকেই সাক্ষাৎ ব্রহ্ম বলে' উপাসনা কর্‌চেন। দ্বিতীয়তঃ, রাজা অপেক্ষা দ্বারী নিকটস্থ এবং সহজলভ্য, এ জন্য তার সাহায্য নেওয়া হয়। এখানে তা নয়। কারণ, ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপী, সুতরাং নিকটতম। আর, যাঁকে তাঁর দ্বারী বল্‌চেন, তিনি আপনার মনের বা হস্তের নির্ম্মিত; তিনি কখনও থাকেন, কখনও থাকেন না; কখনও নিকটে, কখনও দূরে। অতএব এমন বস্তুকে কিরূপে অন্তর্য্যামী সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মা অপেক্ষা নিকটস্থ মনে করা যায় এবং তাঁকে লাভ কর্‌বার উপায় বলা যায়? তৃতীয়তঃ, চৈতন্যাদিরহিত বস্তু কিরূপে ব্রহ্মলাভের ন্যায় মহৎ কার্য্যে সহায়তা কর্‌বে?

ভট্টাচার্য্যও ব্রহ্মোপাসনাকে রাজার উপাসনার সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। এই তুলনার উত্তরে রামমোহন রায় যা বলেছিলেন, পূর্ব্বে (৩৩ পৃঃ) উল্লেখ করেছি। তদুপরি তিনি ব্যঙ্গ করে' বলেছিলেন (গ্র, ৭০৬)—

"তবে এ উপমা দেওয়াতে ভট্টাচার্য্যের 'ঐহিক' লাভ আছে; অতএব দিতে পারেন। যেহেতু পরমেশ্বরের উপাসনা আর রাজারদিগের উপাসনা এ দুইকে তুল্য করিয়া জানিলে, লোকে রাজারদিগের উপাসনায় যেমন উৎকোচ দিয়া থাকে, সেইরূপ ঈশ্বরকেও বাঞ্ছাসিদ্ধির নিমিত্ত পূজাদি দিবেক। বিশেষ এই মাত্র—রাজারদিগের নিমিত্ত যে উৎকোচ দেওয়া যায়, তাহা রাজাতে পর্য্যাপ্ত হয়, ঈশ্বরের নিমিত্ত যে উৎকোচ, তাহা ভট্টাচার্য্যের উপকারে আইসে।"

(গ) একেশ্বরবাদীর পক্ষে অন্য দেবতার পূজা অবৈধ।

রামমোহন রায় বল্‌চেন (গ্র, ৫৯৫)—যে কোনও ব্যক্তি বুদ্ধির অধিষ্ঠাতা, চৈতন্যরূপী, সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মাকে চিন্তা করেন, তাঁর পক্ষে

নামরূপবিশিষ্ট কোনও পদার্থকে পরমাত্মা বোধে আরাধনা করা সর্ব্বথা অকর্ত্তব্য। তিনি এ বিষয়ে শাস্ত্রীয় প্রমাণ দিচ্চেন ঃ—

(১) 'ন প্রতীকেন হি সঃ'—বেদান্ত সূত্র, ৪।১।৪ —বিকার-ভূত যে নামরূপ, তাহাতে পরমাত্মার বোধ করিবেক না। যে-হেতু এক নামরূপ অন্য নামরূপের আত্মা হইতে পারে না।"

(২) 'আত্মেত্যেবোপাসীত'—বৃহদারণ্যক শ্রুতি—"কেবল আত্মারি উপাসনা করিবেক"।

(৩) 'আত্মানমেব লোকমুপাসীত'—"জ্ঞানস্বরূপ আত্মারি উপাসনা করিবেক"।

(৪) 'তস্য হ ন দেবাশ্চ নাভূত্যা ঈশতে আত্মা হ্যেষাং স ভবতি যোঽন্যাং দেবতামুপাস্তে অন্যোঽসাবন্যোঽহমস্মি ন স বেদ, যথা পশুরেব স দেবানাং'—বৃহদারণ্যক শ্রুতি—"ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তির অনিষ্ট করিতে দেবতারাও পারেন না; যেহেতু সেই ব্যক্তি দেবতাদেরো আরাধ্য হয়। আর, যে কোনো ব্যক্তি আত্মা ভিন্ন অন্য কোনো দেবতার উপাসনা করে, আর কহে যে—এই দেবতা অন্য, আমি অন্য, উপাস্য-উপাসক রূপে হই—সে অজ্ঞান ব্যক্তি দেবতাদের পশু মাত্র হয়।"

এই সকল শাস্ত্রবাক্য উদ্ধৃত করে' রামমোহন বল্‌চেন (গ্র, ৫৯৭)—"প্রতিমাদিতে পরমেশ্বরের উপাসনা ব্রাহ্মেরা করিবেন না," কারণ, 'ন তস্য প্রতিমা অস্তি'—সেই পরমেশ্বরের প্রতিমা নেই (শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি, ৪।১৯)।

রামমোহন রায়ের মতে (গ্র, ৬৪০), পরমেশ্বরকে 'বিভু' অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী বলে' যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে, শ্রীমদ্ভাগবত তার প্রতি প্রতিমা-পূজা নিষেধ করেছেন। এ বিষয়ে তিনি তৃতীয় স্কন্ধের ঊনত্রিংশ অধ্যায় হতে নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি উদ্ধৃত করেছেন—

"অহং সর্ব্বেষু ভূতেষু ভূতাত্মাবস্থিতঃ সদা।
তমবজ্ঞায় মাং মর্ত্ত্যঃ কুরুতেঽর্চ্চাবিড়ম্বনং॥"

রামমোহন রায় কৃত অর্থ—"আমি সকল ভূতে আত্মাস্বরূপ হইয়া অবস্থিতি করিতেছি, এমৎরূপ আমাকে না জানিয়া মনুষ্যসকল প্রতিমাতে পূজার বিড়ম্বনা করে।"

"যো মাং সর্ব্বেষু ভূতেষু সন্তমাত্মানমীশ্বরং।
হিত্বার্চ্চাং ভজতে মৌঢ্যাদ্ ভস্মন্যেব জুহোতি সঃ॥"

রামমোহন রায় কৃত অর্থ—"যে ব্যক্তি সর্ব্বভূতব্যাপী আমি যে আত্মাস্বরূপ ঈশ্বর, আমাকে ত্যাগ করিয়া মূঢ়তাপ্রযুক্ত প্রতিমার পূজা করে, সে কেবল ভস্মেতে হোম করে।"

রামমোহন পুনরায় বল্‌চেন (গ্র, ৬৬১)—শাস্ত্রে "সর্ব্বত্র দৃঢ়-রূপে কহিয়াছেন যে, ব্রহ্মজিজ্ঞাসা যাহার হইয়াছে, তেঁহ কদাপি অবয়বের উপাসনা কোন মতে করিবেন না। এই বলে' আবার অনেক শাস্ত্রীয় প্রমাণ দিচ্চেন। তার মধ্যে একটি এই—

"অপ্রতীকালম্বনান্নয়তীতি বাদরায়ণঃ উভয়থাপ্যদোষাৎ তৎক্রতুশ্চ"—বেদান্ত সূত্র, ৪।৩।১৫

রামমোহন রায় কৃত ব্যাখ্যা—"অবয়বের উপাসক ভিন্ন, যাহারা পরব্রহ্মের উপাসনা করেন, তাহাদিগ্যেই অমানব পুরুষ ব্রহ্ম

প্রাপ্তির নিমিত্ত ব্রহ্মলোকে লইয়া যান, বাদরায়ণ কহিতেছেন। যেহেতু, দেবতার উপাসক আপন উপাস্য দেবতাকে প্রাপ্ত হয়েন, আর ব্রহ্মোপাসক ব্রহ্মলোকে গমনপূর্ব্বক পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন, এমত অঙ্গীকার করিলে কোন দোষ হয় না। আর 'তৎক্রতু' ন্যায়ও ইহাই প্রতিপন্ন করিতেছেন; অর্থাৎ, যে ব্যক্তি যাহার উপাসক, সে তাহাকেই পায়।"

অতএব, একেশ্বরবাদী, কি ঈশ্বরের বিভিন্ন স্বরূপের স্মারক রূপে, কি তাঁর কর্ম্মচারী রূপে, কি অন্য ভাবে, বহুর উপাসনা করবেন না—ইহাই রামমোহন রায়ের শাস্ত্রানুযায়ী মীমাংসা।

৭। পঞ্চম শ্রেণীর যুক্তি ও তাহার উত্তর।

(সাকার-উপাসনা নিরাকার-উপাসনার সোপান কি না?)

(ক) 'প্রথমে সাকার, পরে নিরাকার'—উত্তর।

অতঃপর আর এক শ্রেণীর যুক্তি এই যে, মান্‌লাম একেরই উপাসনা করতে হবে; এবং নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনাই শ্রেষ্ঠ। কিন্তু সে বড় উচ্চ স্তরের উপাসনা। প্রথমে সাকার দেবদেবীর উপাসনাই করা উচিত; পরে ক্রমে অধিকার জন্মালে নিরাকার পরমেশ্বরের উপাসনা করা সম্ভব হবে।

কবিতাকার বল্লেন—প্রথমে সাকার ব্রহ্মের ভজন আবশ্যক। এর উত্তরে রামমোহন রায় বল্লেন (গ্র, ৬৬০)—এ কথা সত্য যে, যে

পর্য্যন্ত ব্রহ্মজিজ্ঞাসা না হয়, সে পর্য্যন্ত সাকার-উপাসনার বিধি শাস্ত্রে আছে। কিন্তু ব্রহ্মজিজ্ঞাসার উদয় হলে আর সাকার-উপাসনার প্রয়োজন নেই। ব্রহ্মজিজ্ঞাসার জন্য চিত্তশুদ্ধির আবশ্যক বটে, কিন্তু সেই চিত্তশুদ্ধি পূর্ব্বজন্মের সাধনের ফলেও হতে পারে। যখন দেখা যাবে, কারো ব্রহ্মজিজ্ঞাসার উদয় হয়েছে, তখন বুঝ্‌তে হবে, যেরূপে হউক তার চিত্তশুদ্ধিও কথঞ্চিৎ পরিমাণে হয়েছে। তার পক্ষে আর সাকার-উপাসনার প্রয়োজন নেই; যেহেতু যথার্থ বস্তুতে অভিনিবেশ হলে, কল্পনাতে বিশ্বাস কোনও মতে থাকে না।

এই বলে' রামমোহন কয়েকটি বচন উদ্ধৃত করে' দেখালেন যে, সাকার-উপাসনা কেবল অক্ষমের জন্য। কিন্তু তাঁর মতে, যে ব্যক্তির মনে ঈশ্বর বিষয়ে চিন্তা জেগেছে, যে ঐ বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছে, সে কখনও অক্ষম নয়। পরমেশ্বরের সহিত যোগ স্থাপনের ইচ্ছা কারো মধ্যে দেখা গেলে তাকে তা হতে এই বলে' নিবৃত্ত কর্‌বার অধিকার কারো নেই, যে, সে প্রথমে সাকার-উপাসনা করে নি।

(খ) 'প্রথমে অপর সকল শাস্ত্র, পরে বেদ-বেদান্ত'—উত্তর।

কবিতাকার পূর্ব্বোক্ত আপত্তির সঙ্গে তদনুরূপ আরও কয়েকটি আপত্তি করেছিলেন। তাঁর দ্বিতীয় আপত্তি এই ছিল যে, প্রথমে অপর সকল শাস্ত্র পড়া হয়ে গেলে, তৎপর বেদান্ত পাঠে অধিকার হয়। রামমোহন বল্লেন (গ্র, ৬৫৭—৫৮)—এরূপ যদি নিয়ম করা যায় যে, অপর সকল শাস্ত্র পড়া না হয়ে গেলে বেদান্ত পড়া যাবে না, তবে আর কারো পক্ষে এ জীবনে বেদান্ত পাঠ সম্ভব হবে না। কেন না, **"শাস্ত্র শব্দে সমগ্র চারি বেদ, ও সমুদায় দর্শন, ও সকল স্মৃতি, ও পুরাণ, ও উপপুরাণ, এবং সংহিতাদি, ও অনন্ত কোটি আগম**

বুঝায়। * * *। বিশেষত কলির মনুষ্য প্রায় শতায়ুর অধিক হয়েন না। ওই সকল শাস্ত্রের যৎকিঞ্চিৎ পড়িতেই মৃত্যু উপস্থিত হইবেক ; বেদান্ত পাঠের সুতরাং সম্ভাবনা না হয়। অথচ প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে, ভগবান ভাষ্যকারের [অর্থাৎ শঙ্করাচার্য্যের] পূর্ব্বে এবং পরে এ পর্য্যন্ত উপনিষদ্ রূপ বেদান্ত ও তাহার বিবরণ বেদব্যাসকৃত সূত্রের পাঠ অনেকেই করিয়া আসিতেছেন এবং অনেকেই কৃতকার্য্য হইয়াছেন। কবিতাকার পরমেশ্বরের উপাসনা হইতে লোককে নিবৃত্ত করাতে কি ফল দেখিয়াছেন যে, এরূপ শাস্ত্রবিরুদ্ধ ও যুক্তি-বিরুদ্ধ কথার উল্লেখ করিয়া পরমার্থ সাধনে লোককে নিরুৎসাহ করিতে চেষ্টা পান ?”

রামমোহন আরও বল্লেন (গ্র, ৬৫৭—৫৮)—“তাবৎ শাস্ত্রে বিধি আছে যে, ব্রাহ্মণ আপন শাখা ও তাহার অন্তর্গত উপনিষদ্-রূপ বেদান্ত পাঠ ও তাহার অর্থ চিন্তন করিবেন ; পরে অন্য শাস্ত্র পড়িবার প্রবৃত্তি হইলে, তাহাও পড়িবেন।” এ কথার প্রমাণ স্বরূপ তিনি ধর্ম্মসংহিতার বচন উদ্ধৃত করলেন। দেখালেন যে, যজ্ঞোপবীত দেওয়ার পরেই শিষ্যকে বেদ-বেদান্ত শিক্ষা দিবার উপদেশ মনু দিয়েছেন।

(গ) ‘প্রথমে বেদের অগ্রভাগ, পরে বেদান্ত’—উত্তর।

কবিতাকারের তৃতীয় আপত্তি এই ছিল যে, প্রথমে বেদের অগ্রভাগ না পড়ে’ বেদান্ত পড়্‌লে বিড়ম্বনা হয়। এ বিষয়ে রামমোহন বল্লেন (গ্র, ৬৫৮—৫৯)—বেদের অগ্রভাগ পাঠ করা কর্ত্তব্য বটে, কিন্তু অসমর্থ

ব্রাহ্মণদের পক্ষে গায়ত্রী, রুদ্রোপস্থান, সূর্য্যোপস্থান ও পুরুষসূক্ত পাঠ করাকেই বেদাধ্যয়ন বলে' গণ্য করা হয়। এই বলে' রামমোহন পরাশরের বচন উদ্ধৃত করলেন। মনুও বলেছেন যে, কেবলমাত্র গায়ত্রী জপেতেই ব্রাহ্মণ মুক্তি লাভ করবার যোগ্য হন। অন্য কিছু করুন না করুন, এরূপ ব্রাহ্মণকে উত্তম ব্রাহ্মণ বলা যায়। অতএব যাঁরা গায়ত্র্যাদি অধ্যয়ন করেন, তাঁদের বেদান্ত পাঠে কখনও বিড়ম্বনা হয় না।

(ঘ) 'প্রথমে কর্ম্মসাধন, পরে জ্ঞানসাধন'—উত্তর

কবিতাকারের চতুর্থ আপত্তি—পূর্ব্বে কর্ম্মসাধন অর্থাৎ পূজাহোমাদি অনুষ্ঠান করতে হয়; পরে জ্ঞানসাধন বা ব্রহ্মোপাসনায় অধিকার জন্মে। রামমোহন বল্লেন (গ্র, ৬৫৯—৬০)—শাস্ত্রে এরূপ বিধি আছে বটে, যে, চিত্তশুদ্ধি হয়ে জ্ঞানসাধনে প্রবৃত্তি না জন্মান পর্য্যন্ত নিষ্কাম ভাবে পূজাহোমাদি কর্ম্ম করবে। কিন্তু এমন নিয়ম নেই যে, সকলকেই প্রথমে ঐ সকল কর্ম্ম করতেই হবে। কারণ, পূর্ব্বজন্মের পুণ্যসঞ্চয় থাকলে, ইহজন্মে ''কর্ম্মের' অনুষ্ঠান বিনাও জ্ঞানসাধনে অধিকারী হওয়া যায়।

সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর সহিত বিচারে রামমোহন বলেছিলেন (গ্র, ৪২৭—২৮) যে, বর্ণাশ্রম-কর্ম্মের অনুষ্ঠান বিনা ব্রহ্মজ্ঞান হতে পারে না, এমন নয়। বরং বেদব্যাস বেদান্ত-সূত্রে লিখেছেন যে, বর্ণাশ্রমকর্ম্মহীন ব্যক্তিদেরও ব্রহ্মবিদ্যাতে অধিকার আছে। 'অন্তরা চাপিতু তদ্দৃষ্টেঃ', এবং 'অপি চ স্মর্য্যতে', এই দুই সূত্রের ব্যাখ্যায় শঙ্করাচার্য্যও দৃষ্টান্ত দিয়েছেন যে, রৈক্ক, বাচক্নবী প্রভৃতি আশ্রমকর্ম্মহীন ব্যক্তিদের ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়েছিল। সম্বর্ত প্রভৃতি যাঁরা সর্ব্বদা বিবস্ত্র থাকতেন, তাঁদের ত বর্ণাশ্রমকর্ম্ম ছিল না; তথাপি তাঁরাও মহাযোগী হয়েছিলেন। মৈত্রেয়ী,

সুলভা প্রভৃতি নারীগণও হোমপূজাদি না করে' ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করেছিলেন। আর, বিদুর, ধর্ম্মব্যাধ প্রভৃতি শূদ্রগণ বেদাধ্যয়নহীন হয়েও পরম জ্ঞানী হয়েছিলেন। অতএব, পূর্ব্বে যাগযজ্ঞাদি 'কর্ম্মসাধন' না করলে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় না, এ কথা সত্য নয়।

৮। ষষ্ঠ শ্রেণীর যুক্তি ও তাহার উত্তর।

(বিবিধ আপত্তি)

(ক) 'পুরাণ-ইতিহাসই বর্ত্তমান কালের বেদ'—উত্তর।

এ পর্য্যন্ত যে পাঁচ শ্রেণীর যুক্তির আলোচনা করা হ'ল, তা ছাড়া আর এক শ্রেণীর যুক্তি অনেকে উপস্থিত করেছিলেন। সেগুলিকে ঠিক যুক্তি বা শাস্ত্রীয় বিচার বলা যায় না। সেগুলি যেন ব্রহ্মোপাসনাকে এড়াবার জন্য অলসের আপত্তি মাত্র। এক্ষণে সেরূপ কতকগুলি আপত্তির আলোচনায় প্রবৃত্ত হচ্চি। সেগুলির সংখ্যাও নিতান্ত অল্প নয়।

প্রথম আপত্তি এই যে, বেদার্থের নির্ণয়কর্ত্তা মুনিদের বাক্যে পরস্পর অনেক বিরোধ দেখা যায়; অর্থাৎ, কেহ ব্রহ্মোপাসনার বিধি দেন, কেহ বা দেবোপাসনার বিধি দেন। অতএব, পুরাণ-ইতিহাসকেই বর্ত্তমান কালে অনুসরণ করা উচিত; এগুলিই বর্ত্তমান যুগের বেদ।

গোস্বামী মহাশয় এই যুক্তিতে সাকার-উপাসনা রক্ষার চেষ্টা করেছিলেন। রামমোহন রায় এর উত্তরে বল্লেন (গ্র, ৬১৯—২০)—বিরোধ

থাক্‌লেই যদি শাস্ত্র পরিত্যাজ্য হয়, তবে পুরাণ-ইতিহাসকেও ত পরিত্যাগ করতে হয়; কারণ তাতেও ত বিরোধ অল্প নয়। তা হলে যে সকল ধর্ম্মের লোপ হয়। দ্বিতীয়তঃ, অর্থনির্ণয় কঠিন বলেই যদি বেদ অব্যবহার্য্য হয়, তবে আপনারা গায়ত্রী, সন্ধ্যা, দশসংস্কার প্রভৃতি বেদ-মন্ত্রে করেন কি করে'? পুরাণ-মন্ত্রে করেন না কেন? পুরাণাদিতে বেদার্থকে ও নানাপ্রকার নীতিকে অজ্ঞ জনসাধারণের জন্য উপাখ্যানের আকারে ব্যক্ত করা হয়েছে, এই কারণেই ঐ সকল শাস্ত্র মান্য। কিন্তু পুরাণাদি সাক্ষাৎ বেদ নন। সাক্ষাৎ বেদ হলে শূদ্রাদির নিকট সেগুলি পাঠ করা হত না। আর, তা হলে, আপনার মতে (পরস্পর-বিরোধী বাক্য থাকা হেতু) সেই বেদ অনুসরণীয়ও হত না। অতএব, সাকার-উপাসনাকে প্রাধান্য দেবার উদ্দেশ্যে বেদকে অগ্রাহ্য করবেন না।

পুরাণাদিরও চরম সিদ্ধান্ত যে ব্রহ্মোপাসনা, সে কথা রামমোহন এ স্থলে বল্লেন না। সে বিষয়ে তাঁর উক্তি পূর্ব্বে (১৬—১৮ পৃঃ) উল্লেখ করা হয়েছে। পুরাণাদি অনুসারেও ব্রহ্মোপাসনাই মুখ্য।

(খ) 'চিত্তশুদ্ধি না হইলে ব্রহ্মোপাসনায় প্রবৃত্ত হওয়া অনুচিত'—উত্তর।

কেহ কেহ বল্লেন—অগ্রে চিত্তশুদ্ধি না হলে ব্রহ্মোপাসনায় প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নয়। রামমোহন রায় এ কথার এই উত্তর দিলেন (গ্র, ১৫৫—৫৬)—শাস্ত্রে আছে, চিত্তশুদ্ধি হলেই ব্রহ্মজ্ঞানের ইচ্ছা হয়। অতএব, ব্রহ্মজ্ঞানের ইচ্ছা কোনও মানুষে দেখ্‌লে বুঝ্‌তে হবে যে, তার চিত্তশুদ্ধি হয়েছে; যেহেতু, কারণ না থাক্‌লে কার্য্যের উৎপত্তি হয় না। তবে, কি উপায়ে সেই ব্যক্তির চিত্তশুদ্ধি হয়েছে, তা আমরা নাও জান্‌তে পারি। সাধনের দ্বারা, বা সৎসঙ্গের গুণে, বা পূর্ব্বজন্মের

পুণ্যফলে, অথবা গুরুর প্রসাদে হয়ে থাকতে পারে। রামমোহন রায় আরও বল্লেন যে, যাঁরা এই আপত্তি করেন, তাঁরা কি জানেন না যে, তন্ত্রশাস্ত্রে দীক্ষা প্রকরণে আছে—

"শান্তো বিনীতঃ শুদ্ধাত্মা শ্রদ্ধাবান্ ধারণক্ষমঃ।
সমর্থশ্চ কুলীনশ্চ প্রাজ্ঞঃ সচ্চরিতো যতী।
এবমাদিগুণৈর্যুক্তঃ শিষ্যো ভবতি নান্যথা॥"

অর্থ—যে ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয়, বিনীত, শুদ্ধাত্মা, শ্রদ্ধাবান্, ধারণাতে সক্ষম, শক্তিমান্, আচারাদি ধর্ম্মবিশিষ্ট, বুদ্ধিমান্, সচ্চরিত্র, সংযত ও এইরূপ অন্যান্য গুণবিশিষ্ট, তিনিই দীক্ষার অধিকারী; অন্য কেহ নয়।

আপত্তিকারীরা কি এইরূপ অধিকারী নির্ব্বাচন করে' মন্ত্র দান করেন? যদি না করেন, তবে ব্রহ্মোপাসনার বেলায় কেন বলেন যে, চিত্তশুদ্ধি না হলে তাতে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নয়?

(গ) 'ব্রহ্মোপাসনার নিয়মসকল সম্যক্ পালন করা অসম্ভব'—ঐ

কেহ কেহ বল্লেন—ব্রহ্মোপাসনার আনুষঙ্গিক যে সকল নিয়ম শাস্ত্রে লিখিত আছে, তা সম্যক্‌রূপে পালন করা অসম্ভব। সাকার-উপাসনা সহজসাধ্য; অতএব তাই ভাল। এ আপত্তির উত্তরে রামমোহন বল্লেন (গ্র, ৭১৪)—সাকার-উপাসনার নিয়মসকলই কি সম্যক্ পালন করা যায়? কাকেও ত দেখি না যে, সে সব নিয়ম সম্যক্ পালন করেন। সম্যক্ অনুষ্ঠান সকল প্রকার উপাসনাতেই অতি দুঃসাধ্য; কিন্তু যথাসাধ্য যত্ন করতে হবে, এই বিধি। বরং যজ্ঞাদি ও প্রতিমাপূজাদি কর্ম্মকাণ্ডে স্থান কাল ও দ্রব্যাদি-সংগ্রহ শাস্ত্রানুসারে হয়ে উঠে না বলে' ক্রিয়া নিষ্ফল

হয়; কিন্তু ব্রহ্মোপাসনায় জ্ঞানার্জ্জনের জন্য যত্ন থাক্‌লেই হল। কেবল যত্ন কর্‌বার বিধিই মনু দিয়েছেন; যথা,—'আত্মজ্ঞানে শমে চ স্যাদ্ বেদাভ্যাসে চ যত্নবান্'—ব্রহ্মজ্ঞান উপার্জ্জন, ইন্দ্রিয়সংযম ও বেদাভ্যাসে যত্নবান্ হবে।

(ঘ) 'ব্রহ্মজ্ঞানে গৃহস্থের অধিকার নাই'—উত্তর।

বহু লোকের ধারণা এই যে, ব্রহ্মোপাসনা সন্ন্যাসীদের জন্য; গৃহস্থ-দের দেব-দেবীর উপাসনা নিয়ে থাকাই সঙ্গত। এবিষয়ে রামমোহন রায় বল্লেন (গ্র, ১৪৯—৫১)—"এরূপ আশঙ্কা কদাপি করিতে পারিবে না। যেহেতু বেদে এবং বেদান্ত-শাস্ত্রে, আর মনু প্রভৃতি স্মৃতিতে গৃহস্থের আত্মোপাসনা কর্ত্তব্য এরূপ অনেক প্রমাণ আছে। তাহার কিঞ্চিৎ লিখিতেছি।" এই বলে' তিনি অনেক বচন উপস্থিত কর্‌লেন; এবং দেখালেন যে, গৃহস্থের পঞ্চযজ্ঞাদি অনুষ্ঠান ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারাও সম্পন্ন করা যায়। এ স্থলে তা'হতে কেবল দুটিমাত্র বচন উদ্ধৃত করা যাচ্চে। তন্মধ্যে একটি পূর্ব্বে (১৮—১৯ পৃঃ) অন্য প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করা হয়েছে। সেটি এই :—

"যথোক্তান্যপি কর্ম্মাণি পরিহায় দ্বিজোত্তমঃ।
আত্মজ্ঞানে শমে চ স্যাদ্ বেদাভ্যাসে চ যত্নবান্ ॥—মনুঃ

এই বচনে ব্রহ্মজ্ঞান, ইন্দ্রিয়সংযম ও বেদাভ্যাসের বিধি গৃহস্থেরই জন্য। দ্বিতীয় বচনটি এই :—

"ন্যায়ার্জ্জিতধনস্তত্ত্বজ্ঞাননিষ্ঠোঽতিথিপ্রিয়ঃ।
শ্রাদ্ধকৃৎ সত্যবাদী চ গৃহস্থোঽপি বিমুচ্যতে ॥"

—যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতিঃ

অর্থ—যিনি ন্যায়সঙ্গত উপায়ে ধন উপার্জ্জন করেন, যাঁর তত্ত্বজ্ঞানে নিষ্ঠা আছে, যিনি অতিথি-সেবায় তৎপর, যিনি শ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠান করেন এবং যিনি সত্যবাদী, তিনি গৃহস্থ হয়েও মুক্তি লাভ করেন।

অন্যান্য অনেক বচনের উল্লেখ করে' রামমোহন পরিশেষে বল্লেন (গ্র, ১৫১)—"অতএব, স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রে গৃহস্থের প্রতি নিত্যনৈমিত্তিকাদি কর্ম্মের যেমন বিধি আছে, সেইরূপ, কর্ম্মের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক বা কর্ম্মত্যাগপূর্ব্বক, ব্রহ্মোপাসনারো বিধি আছে। বরঞ্চ ব্রহ্মোপাসনা বিনা কেবল কর্ম্মের দ্বারা মুক্তি হয় না, এমত স্থানে স্থানে পাওয়া যাইতেছে।"

শাস্ত্রে অনেক স্থলে 'কর্ম্ম' শব্দে কেবল যাগযজ্ঞ ও পূজার্চ্চনাদি ক্রিয়ানুষ্ঠান বোঝায়। রামমোহন এ স্থলে সেই অর্থে 'কর্ম্ম' শব্দ ব্যবহার করেছেন।

(ঙ) 'ব্রহ্মোপাসনায় অব্রাহ্মণ ও নারীদের অধিকার নাই'—উত্তর।

সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী বল্লেন—অব্রাহ্মণ ও নারীদের ব্রহ্মোপাসনায় অধিকার নেই; প্রচলিত দেবোপাসনা নিয়ে থাকাই তাদের কর্ত্তব্য। এর উত্তরে রামমোহন যা বল্লেন, তার উল্লেখ পূর্ব্বে (৬৫—৬৬ পৃঃ) করা হয়েছে। তিনি শাস্ত্রের প্রমাণ দিয়ে দেখালেন যে, ব্রহ্মবিদ্যায় সকলেরই অধিকার আছে এবং পূর্ব্বকালে অনেক শূদ্র ও নারী ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেছিলেন।

(চ) 'বিশ্বাস থাকিলে সাকারোপাসনাতেও উত্তম ফল পাওয়া যায়'—উত্তর।

ব্রহ্মোপাসনাকে এড়াবার জন্য অনেকে আর একটি যুক্তি এই দিলেন যে, সাকারোপাসনা মিথ্যা হলেও, বিশ্বাস থাকলে তার দ্বারাই উত্তম ফল পাওয়া যাবে। এ কথার উত্তরে রামমোহন বল্লেন (গ্র, ১৫২)—"এক জনের বিশ্বাস দ্বারা বস্তুর শক্তি বিপরীত হয় না। যেহেতু প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে, দুগ্ধের বিশ্বাসে বিষ খাইলে, বিষ আপনার শক্তি অবশ্য প্রকাশ করে।"

(ছ) 'মন্দিরে মস্‌জিদে বা গির্জায় উপাসনা করাও পৌত্তলিকতা'—উত্তর।

ভট্টাচার্য্য বল্লেন—"যদি মন্দির মস্‌জিদ গিরিজা প্রভৃতি যে কোন স্থানে যে কোন বিহিত ক্রিয়ার দ্বারা শূন্য স্থানে ঈশ্বর উপাস্য হয়েন, তবে কি সুগঠিত স্বর্ণ, মৃত্তিকা, পাষাণ কাষ্ঠাদিতে ঐ ঈশ্বরের উপাসনা করাতে ঈশ্বরের অসম্মান করা হয়?" এ প্রশ্নের উত্তরে রামমোহন বল্লেন (গ্র, ৭১১)—মস্‌জিদ-গির্জায় ঈশ্বরের উপাসনা, আর প্রতিমাতে উপাসনা, এ দুয়ের সাদৃশ্য দেখান অতিশয় অযুক্ত। কারণ, মস্‌জিদ-গির্জায় যাঁরা উপাসনা করেন, তাঁরা মস্‌জিদ্-গির্জাকে ঈশ্বর বলেন না; কিন্তু মূর্ত্তিতে যাঁরা উপাসনা করেন, তাঁরা মূর্ত্তিকেই ঈশ্বর বলেন। আর, আশ্চর্য্য এই যে, তাঁরা সেই মূর্ত্তিকে ভোগ দেন, শয়ন করান, শীত নিবারণের জন্য বস্ত্র দেন, ও গ্রীষ্ম নিবারণের জন্য বায়ু ব্যজন করেন। এই সকল ভোগশয়নাদি ঈশ্বর-ধর্ম্মের অত্যন্ত বিপরীত।

রামমোহন আরও বল্লেন (গ্র, ৭১১—১২)—"বস্তুতঃ পরমেশ্বরের উপাসনাতে মস্‌জিদ গিরিজা মন্দির ইত্যাদি স্থানের কোন বিশেষ নাই। যেখানে চিত্ত স্থির হয়, সেই স্থানেই উপাসনা করিবেক। 'যত্রৈকাগ্রতা তত্রাবিশেষাৎ' (বেদান্ত সূত্রং)— যেখানে চিত্ত স্থির হয়, সেই স্থানে আত্মোপাসনা করিবেক। তীর্থাদি স্থানের বিশেষ নাই।"

(জ) 'প্রাচীন যবনাদি শাস্ত্রেও প্রতিমা-পূজা ছিল'—উত্তর।

ভট্টাচার্য্য বল্লেন—"প্রাচীন যবনাদি শাস্ত্রেতেও প্রতিমাদি পূজা এবং যাগাদি কর্ম্ম প্রসিদ্ধ আছে। নব্যদিগের বুদ্ধিমত্তাধিক্যে [তাহা] ধিক্কৃত হইয়াছে"। অর্থাৎ, প্রাচীন কালে আরব, মিশর, গ্রীস, ইটালি প্রভৃতি দেশেও ত মূর্ত্তিপূজা ছিল; আধুনিক লোকেরা অধিক বুদ্ধিমান্, তাই তা পরিত্যাগ করেছেন। 'নব্যদিগের বুদ্ধিমত্তাধিক্যে ধিক্কৃত হইয়াছে' এ কথাটি ভট্টাচার্য্য মহাশয় বিদ্রূপাত্মক ভাবে বলেছিলেন, কি সত্য ভাবে বলেছিলেন, বোঝা যাচ্চে না; কিন্তু রামমোহন রায় সত্য ভাবেই গ্রহণ কর্‌লেন; এবং বল্লেন (গ্র, ৬৯৬)—বুদ্ধিমত্তা হলে প্রতিমাপূজা ধিক্কৃত হয়, এই স্বীকারোক্তিতে প্রকাশ পাচ্চে যে, ভট্টাচার্য্যের মতে বর্ত্তমানে এ দেশীয় লোকের বুদ্ধিমত্তা নেই, এবং সে জন্যই প্রতিমাপূজা আজ পর্য্যন্ত ধিক্কৃত হয় নি। বাস্তবিক, শাস্ত্রেও পুনঃ পুনঃ লিখেছেন যে, অজ্ঞানদের জন্যই বাহ্যপূজাদি কল্পনা করা হয়েছে।

(ঝ) 'বেদান্ত সূত্রের ভাষ্যকার স্বয়ং সাকার দেবতার স্তব করিয়াছেন'—উত্তর।

কবিতাকার বল্লেন—বেদান্ত সূত্রের ভাষ্যকার (শঙ্করাচার্য্য) স্বয়ং সাকার ব্রহ্ম মেনে 'আনন্দলহরী' স্তব করেছেন। তবে আমরা সাকার ব্রহ্ম মান্‌ব না কেন? এর উত্তরে রামমোহন বল্লেন, (গ্র, ৬৭৪)—বেদান্ত সূত্রের ভাষ্য প্রস্তুত আছে; কবিতাকারের দেখান উচিত ছিল, কোন্ স্থানে ভাষ্যকার সাকারকে ব্রহ্ম বলে' স্বীকার করেছেন। "তবে, 'আনন্দলহরী' 'দেবী সুরেশ্বরী' ইত্যাদি গঙ্গার স্তব, 'নমো শঙ্কটাকষ্টহারিণী ভবানী' ইত্যাদি অনেক অনেক স্তবকে, এবং একখান সত্যপীরের পুস্তককেও শঙ্করাচার্য্যের রচিত কহিয়া সেই সেই দেবতার পূজকের প্রসিদ্ধ করিয়াছেন। এ সকল স্তব বেদান্তের ভাষ্যকার আচার্য্যকৃত, ইহাতে প্রমাণ কিছু নাই। প্রধান লোকের নামে আপন আপন কবিতা বিখ্যাত করিলে চলিত হইবেক, এই নিমিত্ত আচার্য্যের নামে এই সকল স্তবস্তুতি প্রসিদ্ধ করিয়াছেন।"

(ঞ) 'ব্রহ্মোপাসনায় লৌকিক ভদ্রাভদ্র জ্ঞান লোপ পায়'—উত্তর।

আর এক আপত্তি এই উঠেছিল যে, ব্রহ্মোপাসক সকল বস্তুতে ব্রহ্মকে দর্শন করে' অভেদ-জ্ঞানে জ্ঞানী হন। তাঁর আর লৌকিক ভদ্রাভদ্র বোধ থাকে না—পঙ্ক-চন্দন, অগ্নি-জল, চোর-সাধু তাঁর কাছে সমান হয়ে যায়। এরূপ হলে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করা অসম্ভব। অতএব, আমাদের ও পথে গিয়ে কাজ নেই।

এই আপত্তির উত্তরে রামমোহন রায় বল্লেন (গ্র, ৫, ১৫৩—৫৪, ৬৫৫—৫৬)—আপনারা কি প্রমাণে এই কথা বলেন? আপনারা ত স্বীকার করেন যে, নারদ, জনক, সনৎকুমার, শুক, বশিষ্ঠ, ব্যাস, পরাশর, কপিল, যাজ্ঞবল্ক্য, শৌনক, রৈক্ক, চক্রায়ণ, অঙ্গিরা প্রভৃতি ব্যক্তিগণ ব্রহ্মজ্ঞানী ছিলেন। অথচ, এঁরা সকলেই অগ্নিকে অগ্নিরূপে, জলকে জলরূপে ব্যবহার করতেন; এবং কেহ রাজকার্য্য, কেহ গার্হস্থ্য-কর্ম্ম করতেন; কেহ বা শিষ্যদের যথাযোগ্য জ্ঞানোপদেশ দিতেন। তবে কিরূপে বলেন যে, ব্রহ্মজ্ঞানীর ভদ্রাভদ্র জ্ঞান থাকে না? আশ্চর্য্য, এমন কথাতেও লোকের বিশ্বাস হয় যে, ব্রহ্মের উপাসনা করলে মানুষ ভদ্রাভদ্র জ্ঞানের বহির্ভূত হয়ে ক্ষিপ্ততা প্রাপ্ত হয়!

যদি বলেন, সর্ব্বত্র ব্রহ্মদৃষ্টি হলে ভেদজ্ঞান কেন থাকবে? এর উত্তর এই যে, লোকযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য পূর্ব্ব পূর্ব্ব ব্রহ্মজ্ঞানীদের ন্যায়, চক্ষুকর্ণ হস্তাদির কর্ম্ম চক্ষুকর্ণ হস্তাদির দ্বারা অবশ্য করতে হয়, এবং পুত্রের প্রতি পিতার কর্ত্তব্য, পিতার প্রতি পুত্রের কর্ত্তব্য করতে হয়; যেহেতু ব্রহ্মই এ সকল নিয়মের কর্ত্তা।

আরও দেখুন, শ্রীকৃষ্ণ গৃহস্থ অর্জ্জুনকে ব্রহ্মবিদ্যাস্বরূপ গীতার দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষা দিয়েছিলেন। তাতে অর্জ্জুন লৌকিক জ্ঞানশূন্য হওয়া দূরে থাক, বরং তাতে পটু হয়ে রাজ্যশাসনাদি সম্পন্ন করেছিলেন। বশিষ্ঠদেব রামচন্দ্রকে উপদেশ করেছিলেন—

"বহির্ব্ব্যাপারসংরম্ভো হৃদি সঙ্কল্পবর্জ্জিতঃ।
কর্ত্তা বহিরকর্ত্তান্তরেবং বিহর রাঘব॥"

অর্থ—হে রাম, তুমি বাহিরে ব্যাপারবিশিষ্ট হয়ে, কিন্তু অন্তরে সঙ্কল্পবর্জ্জিত থেকে, এবং বাহিরে কর্ত্তা হয়ে, কিন্তু অন্তরে অকর্ত্তা থেকে, লোকযাত্রা নির্ব্বাহ কর।

রামচন্দ্রও সর্ব্বদা এই উপদেশ অনুসারে আচরণ করেছিলেন।

এই গেল এক উত্তর। রামমোহন রায় পূর্ব্বোক্ত আপত্তির দ্বিতীয় উত্তর এই দিলেন (গ্র, ১৫৪) যে, যদি সকল ব্রহ্মময় দেখ্‌লেই ভদ্রাভদ্র জ্ঞান লোপ পায়, তবে ত সাকারোপাসকেরও তাই হবে। কারণ, যিনি দেবীর উপাসনা করেন, তিনি দেবীকে ব্রহ্মময়ী বলে' বিশ্বাস করেন, এবং 'সর্ব্বস্বরূপে সর্ব্বেশি' (দেবী মাহাত্ম্য) বলে' সম্বোধন করেন। যিনি বিষ্ণুর উপাসক, তিনি বলেন, 'সর্ব্বং বিষ্ণুময়ং জগৎ'। সকল দেবতার উপাসকেরাই এইরূপ বলেন। অথচ তাঁরা ত পঙ্কচন্দনের ও শত্রুমিত্রের ভেদ করেন। অতএব, কেবল ব্রহ্মোপাসনার বিরুদ্ধে এই আপত্তি উপস্থিত করা কি নিতান্ত অসঙ্গত নয়?

কবিতাকার বল্লেন যে, যে ব্যক্তি ব্রহ্মজ্ঞানী হয়, সে সর্ব্বদা মৌনী হয়ে নির্জ্জনে বাস করে। রামমোহন রায় এর এই উত্তর দিলেন (গ্র, ৬৫৪)—"**সর্ব্বকাল মৌন ও নির্জ্জনে থাকা, ইহা ব্রাহ্মের নিত্যধর্ম্ম নহে। যেহেতু উপনিষদাদির পাঠ ও তাহার উপদেশ করিতে বেদে ও মন্বাদি শাস্ত্রে পুনঃ পুনঃ বিধি আছে। এবং সত্যকাল হইতে এ পর্য্যন্ত বশিষ্ঠাদি ব্রহ্মনিষ্ঠসকল, কি জ্ঞান-সাধন সময়ে, কি সিদ্ধাবস্থায়, অধ্যাত্ম শাস্ত্রের পাঠ ও শ্রবণ ও উপদেশ এবং গার্হস্থ্য করিয়া আসিতেছেন।**"

(ট) 'তোমরা ব্রহ্মজ্ঞানীর মত কি কার্য্য কর?'—উত্তর।

ব্রহ্মোপাসনা গ্রহণ করার বিরুদ্ধে আর এক আপত্তি এই হল যে, তোমরা যে ব্রহ্মজ্ঞানী, তোমরা তদনুরূপ কি কার্য্য কর? অর্থাৎ যদি নিজেরাই ঐ ধর্ম্মের যথোচিত অনুষ্ঠান করতে না পার, তবে অপরকে আহ্বান কর কেন?

রামমোহন রায় বল্লেন (গ্র, ১৫৪—৫৫)—"এ যথার্থ বটে যে, যেরূপ কর্ত্তব্য এ ধর্ম্মের, তাহা আমাদের হইতে হয় নাই। তাহাতে আমরা সর্ব্বদা সাপরাধ আছি। কিন্তু শাস্ত্রের ভরসা আছে। গীতা—

"পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যতে।
ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্দুর্গতিং তাত গচ্ছতি॥"

রামমোহন-কৃত অর্থ—"যে কোন ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি জ্ঞানের অভ্যাসে যথার্থ রূপ যত্ন না করিতে পারে, তাহার ইহলোকে পাতিত্য [বা] পরলোকে নরকোৎপত্তি হয় না; যেহেতু, শুভকারীর, হে অর্জ্জুন, কদাপি দুর্গতি জন্মে না।"

রামমোহন এই মর্ম্মে আরও বল্লেন (গ্র, ১৫৫)—কিন্তু ঐ পণ্ডিতদের জিজ্ঞাসা করি, প্রাতঃকাল হতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণের যে যে ধর্ম্ম শাস্ত্রে লিখিত আছে, তাঁরা তার লক্ষ ভাগের এক ভাগ করেন কি না? বৈষ্ণবের, শৈবের ও শাক্তের যে যে ধর্ম্ম বিহিত আছে, তার শতাংশের একাংশ তাঁরা করে' থাকেন কি? যদি না করেও তাঁরা কেহ ব্রাহ্মণ, কেহ বৈষ্ণব, কেহ শৈব ইত্যাদি রূপে গণ্য হতে পারেন, তবে ব্রহ্মোপাসকদের ব্যঙ্গ করেন কেন? মহাভারতে উক্ত হয়েছে—

"রাজন্ সর্ষপমাত্রাণি পরচ্ছিদ্রাণি পশ্যতি।
আত্মনো বিল্বমাত্রাণি পশ্যন্নপি ন পশ্যতি॥"

অর্থ—হে রাজন্! পরের দোষ সর্ষপমাত্র হলেও লোকে দেখে; কিন্তু আপনার দোষ বিল্বপ্রমাণ হলেও, দেখেও দেখে না।

বস্তুতঃ, সম্পূর্ণ অনুষ্ঠান না করতে পারলে যদি উপাসনা সিদ্ধ না হয়, তবে কারো উপাসনাই সিদ্ধ হতে পারে না।

(ঠ) 'মূর্ত্তিপূজা পরম্পরা-সিদ্ধ'—উত্তর।

ব্রহ্মোপাসনা অবলম্বনের বিরুদ্ধে আর কয়েকটি আপত্তি উঠেছিল; বল্‌তে গেলে, সেগুলিই আসল আপত্তি, অর্থাৎ আপত্তিকারীদের মনের ভিতরকার কথা। তার মধ্যে একটি প্রধান আপত্তি এই যে, মূর্ত্তিপূজা পরম্পরা-সিদ্ধ, সুতরাং তাই ভাল। এরূপ আপত্তিকে মনের ভিতরকার কথা বল্‌চি এই জন্য যে,যে প্রথা সমাজে সর্ব্বদা চলে' আস্‌চে, শৈশবাবধি যার মধ্যে বর্দ্ধিত হয়েছি, যার প্রতি অনুরাগ মনের সংস্কারে পরিণত হয়ে গিয়েছে, তা পরিত্যাগ করে' নূতন কোনও প্রথা গ্রহণ করা বড় কঠিন। তাতে অনেক চিন্তা কর্‌তে হয়, দীর্ঘকালের আলোচনা ও চেষ্টা দ্বারা পূর্ব্ব-সংস্কার ভেঙ্গে নূতন সংস্কার গড়্‌তে হয়। গার্হস্থ্য ও সামাজিক ধর্ম্মানুষ্ঠানের প্রণালীসকল বদ্‌লাতে হয়; তার ফলে প্রাচীন-পন্থীদের অপ্রিয় হতে হয়, হয়ত তাঁদের হস্তে নিগ্রহ ভোগ কর্‌তে হয়। 'পরম্পরা-সিদ্ধ' প্রথা নিয়ে থাক্‌লে চিন্তার শ্রম বা কোনও প্রকার ত্যাগস্বীকারের প্রয়োজন হয় না।

যা হোক্, রামমোহন রায় এই আপত্তির কি উত্তর দিলেন, দেখা যাক্। তিনি বল্লেন (গ্র, ৭০৪)—যখন কোনও মত, ভ্রমবশতঃই হোক্ বা যথার্থ বিচার দ্বারাই হোক্, কতক লোকের মধ্যে একবার গৃহীত হয়ে যায়, তার পর আর সেই মতের লোপ প্রায় হয় না; হলেও বহুকাল পরে হয়। প্রতিমাপূজা প্রথমতঃ কতক লোকের দ্বারা গৃহীত হয়ে পরম্পরা চলে আস্‌চে। আবার ব্রহ্মোপাসনাও কতক লোকের দ্বারা চিরকাল হয়ে আস্‌চে। সুবোধ নির্ব্বোধ সর্ব্বকালেই ছিল ও আছে; এবং তাদের অনুষ্ঠিত পৃথক্ পৃথক্ মতও পরম্পরা চলে' আস্‌চে। কিন্তু বর্ত্তমান কাল অপেক্ষা পূর্ব্বকালে যে প্রতিমাপূজা অল্প ছিল, তাতে

কোনও সন্দেহ নেই। যাঁর সন্দেহ হয়, তিনি যদি এই ভারতবর্ষের মধ্যে যে-কোনও স্থানের চতুর্দ্দিকে বিশ ক্রোশের একটী মণ্ডলী ভ্রমণ করেন, তবে বোধ করি তাঁর কাছে প্রকাশ পাবে যে, ঐ মণ্ডলীর মধ্যে কেবল বিশ ভাগের এক ভাগ মাত্র প্রতিমা এক শ বৎসরের অধিক পুরাতন ; অবশিষ্ট উনিশ ভাগ বিগত এক শ বৎসরের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

অতঃপর রামমোহন বল্লেন—"বস্তুতঃ যে যে দেশে ধনের বৃদ্ধি আর জ্ঞানের ত্রুটি হয়, সেই সেই দেশে পরমার্থসাধন বিধিমতে না হইয়া লৌকিক খেলার ন্যায় হইয়া উঠে"।

রামমোহন অন্যত্র বলেছেন (গ্র, ৬৪৩) "বৈষ্ণব, শৈব [ও] শাক্ত-কৃত নানাপ্রকার নবীন নবীন বিগ্রহ এ দেশে অল্প কাল অবধি প্রসিদ্ধ হইয়াছে।" আর এক স্থলে তিনি দৃষ্টান্ত দিয়ে জিজ্ঞাসা করেছেন (গ্র, ১৫৩)—"জগদ্ধাত্রী, রটন্তী ইত্যাদি পূজা, আর মহাপ্রভুর [ও] নিত্যানন্দ প্রভুর বিগ্রহ, এ কোন্ পরম্পরায় হইয়া আসিতেছিল ?"

অতএব, রামমোহন রায়ের মতে (গ্র, ১৫৩) প্রতিমাপূজা পরম্পরা-সিদ্ধ নয়,বরং সর্ব্বশাস্ত্রসম্মত ব্রহ্মোপাসনাই অনাদিপরম্পরা-ক্রমে প্রচলিত আছে; কেবল কোনও কোনও দেশে ইহার প্রচারের অল্পতা ঘটেছে মাত্র।

ব্রহ্মোপাসনাই যে পরম্পরা-সিদ্ধ, তা দেখাবার জন্য রামমোহন গায়ত্রী মন্ত্রের অর্থ পুস্তিকাকারে (গ্র, ৫২৯—৩৬) প্রকাশ করেছিলেন। যে মন্ত্র ভারতবর্ষের প্রত্যেক ব্রাহ্মণ ত্রিসন্ধ্যা জপ করেন, যা যথারীতি জপ না করলে তাঁদের ব্রাহ্মণত্ব লোপ পায়, তার বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করে রামমোহন দেখিয়েছিলেন যে, ঐ মন্ত্র ব্রহ্মোপাসনারই মন্ত্র। প্রাচীন

ব্যাখ্যাকারদের অনুযায়ী বিস্তৃত ব্যাখ্যা দিয়ে, সর্ব্বশেষে তিনি ঐ মন্ত্রের অর্থের যে সার নির্য্যাস দিয়েছিলেন, তা এই—

"সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়ের কারণ যে পরমাত্মা, তেঁহ ভূর্লোকাদি বিশ্বময় হয়েন। সূর্য্যদেবের অন্তর্যামি সেই প্রার্থনীয় সর্ব্বব্যাপি পরমাত্মাকে আমাদের অন্তর্যামিরূপে আমরা চিন্তা করি, যে পরমাত্মা আমাদের বুদ্ধির বৃত্তিসকলকে প্রেরণ করিতেছেন।"

এ কি বাস্তবিকই ব্রহ্মোপাসনার মন্ত্র নয়? ব্রাহ্মণেরা, কেহ কেহ জেনে, অনেকে না জেনে, চিরদিন ব্রহ্মোপাসনাই করে' আস্‌চেন। অথচ, সেই সঙ্গে পুরাণ-কল্পিত নানা দেবদেবীর পূজা অবলম্বন করাতে সেই ব্রহ্মোপাসনার ফল হতে বঞ্চিত হচ্চেন। ব্রহ্মকে জানেন এবং ব্রহ্মের উপাসনা করেন বলেই নাম হয়েছিল 'ব্রাহ্মণ'। কিন্তু হায়! আমাদের কি মনোগতি! আমরা গায়ত্রীর অর্থ জেনে, তার সাহায্যে ব্রহ্মোপাসনা করা দূরে থাক্, গায়ত্রীকেই আর একটি নূতন দেবীরূপে কল্পনা করে' তাঁর পূজায় প্রবৃত্ত হয়েছি; গায়ত্রী দেবীর ধ্যানমন্ত্র ও প্রণামমন্ত্র রচিত হয়েছে!

প্রসঙ্গক্রমে মনে পড়্‌ল, গীতা গ্রন্থের দ্বারা ব্রহ্মবিদ্যা লাভ না করে', আমরা গীতাকেও আর একটি দেবী করে' তুলেছি। তাঁরও অঙ্গন্যাস ও করন্যাসের মন্ত্র, ধ্যানমন্ত্র, ও প্রণামমন্ত্র রচিত হয়েছে!

রামমোহন রায় 'গায়ত্র্যা ব্রহ্মোপাসনাবিধানম্' নামে আর একখানা পুস্তিকা (গ্র, ৪০৭—১২) প্রচার করেছিলেন। তাতেও প্রাচীনদের অনুসারে গায়ত্রী মন্ত্রের অর্থ ও মাহাত্ম্য বিশদরূপে বর্ণিত আছে। তা হতেও দেখা যায়, গায়ত্রী ব্রহ্মোপাসনারই মন্ত্র এবং বাস্তবিক ব্রহ্মোপাসনাই পরম্পরা-সিদ্ধ।

প্রতিমাপূজা পৌরাণিক যুগে দুর্ব্বল অধিকারীদের মধ্যে প্রচলিত ছিল বটে, কিন্তু তাঁরা যে ভাবে উহা কর্‌তেন এবং বর্ত্তমান কালে যে ভাবে করা হয়, রামমোহন রায়ের মতে, তার মধ্যে বিশেষ প্রভেদ আছে। তিনি বল্‌চেন (গ্র, ৬৪২)—পূর্ব্বে দুর্ব্বল অধিকারীরা মন স্থির কর্‌বার জন্য যে কাল্পনিক মূর্ত্তির পূজা কর্‌তেন, তাকে ঈশ্বরলাভের উপায় মাত্র মনে কর্‌তেন। তাঁরা সেই পরিমিত কাল্পনিক মূর্ত্তিকে সর্ব্বব্যাপী ও নিত্য পরমেশ্বর মনে কর্‌তেন না; কারণ পরিমিতকে অপরিমিত ও অনিত্যকে নিত্য জ্ঞান করা বেদ ও যুক্তি উভয়েরই বিরুদ্ধ। কাল্পনিক মূর্ত্তিকে সর্ব্বব্যাপী ও নিত্য মনে করা অল্প কাল যাবৎ এদেশে প্রচলিত হয়েছে।

(ড) পরম্পরা-বিরুদ্ধ নূতন প্রথাও সমাজে সর্ব্বদা গৃহীত হয়

ব্রহ্মোপাসনা যদি পরম্পরা-বিরুদ্ধও হত, তবু উহা গ্রহণ কর্‌তে আপত্তি করা সঙ্গত হত না; কারণ, অপর কত পরম্পরা-বিরুদ্ধ নূতন প্রথা জনসমাজে সর্ব্বদা গৃহীত হচ্চে। এ বিষয়ে রামমোহন রায় বল্‌চেন (গ্র, ১৫২—৫৩)—যে ব্রহ্মোপাসনা শাস্ত্রসম্মত এবং যার দ্বারা ঐহিক পারত্রিক সকল প্রকার কল্যাণ হয়, তা গ্রহণ কর্‌তে বল্লে লোকেরা বলেন, উহা পরম্পরা-সিদ্ধ নয়, কিরূপে গ্রহণ করি? কিন্তু অপর কত বিষয়ে শাস্ত্রবিরুদ্ধ নূতন নূতন প্রথা বিনা বাক্যব্যয়ে গ্রহণ কর্‌চেন। "যেমন আধুনিক কুলের নিয়ম [অর্থাৎ কৌলীন্য প্রথা] যাহা পূর্ব্বপরম্পরার বিপরীত এবং শাস্ত্রবিরুদ্ধ। আর ইঙ্গ্‌রেজ, যাঁহাকে ম্লেচ্ছ কহেন, তাঁহাকে অধ্যয়ন করান কোন্ শাস্ত্রে আর কোন্ পূর্ব্বপরম্পরায় ছিল? আর কাগজ্ যে সাক্ষাৎ যবনের অন্ন, তাহাকে স্পর্শ করা আর তাহাতে গ্রন্থাদি লেখা কোন্

শাস্ত্রবিহিত আর পরম্পরা-সিদ্ধ হয়? ইঙ্গ্রেজের উচ্ছিষ্ট করা আর্দ্র ওয়ফর [wafer] দিয়া বন্ধ করা পত্র যত্নপূর্ব্বক হস্তে গ্রহণ করা কোন্ পূর্ব্বপরম্পরাতে পাওয়া যায়? আর, আপনার বাটীতে দেবতার পূজাতে, যাঁহাকে ম্লেচ্ছ কহেন তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করা, আর দেবতা সমীপে আহারাদি করান কোন্ পরম্পরা-সিদ্ধ হয়? এইরূপ নানা প্রকার কর্ম্ম যাহা অত্যন্ত শিষ্ট-পরম্পরা-বিরুদ্ধ হয়, প্রত্যহ করা যাইতেছে। * * * তবে সর্ব্বশাস্ত্রসিদ্ধ আত্মোপাসনা, যাহা অনাদিপরম্পরা-ক্রমে সিদ্ধ আছে, কেবল অতি অল্প কাল কোনো কোনো দেশে ইহার প্রচারের ন্যূনতা জন্মিয়াছে, ইহা কর্ত্তব্য কেন না হয়?"

(চ) 'পিতা-পিতামহ ও স্ববর্গের মত পরিত্যাগ করা অন্যায়'—উত্তর।

আর একটি আপত্তি পূর্ব্বোক্ত আপত্তিরই অনুরূপ। তা এই যে, পিতা-পিতামহ এবং স্ববর্গেরা যে মত অবলম্বন করে' চলেছিলেন ও চল্‌চেন, তার অন্যথা করা অত্যন্ত অন্যায়। এর উত্তরে রামমোহন রায় বল্লেন (গ্র, ৪)—পূর্ব্বপুরুষ ও স্ববর্গের প্রতি সকলেরই অত্যন্ত স্নেহ; সুতরাং এই বাক্যকে পূর্ব্বাপর বিবেচনা না করে' অনেকে গ্রহণ করেন। কিন্তু, কেবল 'স্ববর্গের মত' এই হেতুতে কোনও মত গ্রহণ করা মানুষের ধর্ম্ম নয়; বুদ্ধিবিবেচনাহীন পশু-জাতির ধর্ম্ম। পশুরাই সর্ব্বদা স্ববর্গের ক্রিয়া অনুসারে কার্য্য করে। মনুষ্যের সৎ-অসৎ বিবেচনার শক্তি আছে; সে কিরূপে কার্য্যের দোষ-গুণ বিবেচনা না করে, কেবল 'স্ববর্গে

করেন' এই যুক্তিতে, সাংসারিক ও পারমার্থিক কার্য্য নির্ব্বাহ কর্‌তে পারে?

আর, এটাও ভেবে দেখা উচিত যে, স্ববর্গের অনুসরণের নিয়ম সকল দেশে সকল কালে প্রতিপালিত হয় না। তা যদি হত, তবে সংসারে আজ এত পৃথক্ পৃথক্ মত দেখা যেত না। তদ্ভিন্ন, আপনাদেরই মধ্যে দেখ্‌ছি, এক জন বৈষ্ণবকুলে জন্মগ্রহণ করে' শাক্ত হচ্চে; আর এক জন শাক্তকুলে জন্মগ্রহণ করে' বৈষ্ণব হচ্চে। আর, স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যের সময় হতে এ দেশে স্নান-দান, ব্রত-উপবাস প্রভৃতি যাবতীয় পরমার্থ কর্ম্ম পূর্ব্বপ্রচলিত নিয়মে না হয়ে, নূতন নিয়মে হচ্চে। এই পরিবর্ত্তন ত এক শ বৎসরের মধ্যেই হয়েছে। এইরূপ অন্য অন্য অনেক পরিবর্ত্তনও হয়েছে। অতএব, এমন অযৌক্তিক বাক্যে বিশ্বাস করে' পরমার্থ বিষয়ে উত্তম পথ আশ্রয় কর্‌তে কেন পরাঙ্মুখ হন?

(ণ) 'অন্য লোকের মত গ্রহণ করা অসঙ্গত'—উত্তর।

কেহ কেহ বল্লেন—পৃথিবীর সকল লোকের মত পরিত্যাগ করে' দুই এক ব্যক্তির কথা কে গ্রাহ্য করে? আর, পূর্ব্বে কি কেহ পণ্ডিত ছিলেন না, এখনও কি সংসারে অন্য কেহ পণ্ডিত নেই, যে, তাঁরা এই ব্রহ্মোপাসনার মত জান্‌লেন না এবং উপদেশ কর্‌লেন না?

এ সকল কথার উত্তরে রামমোহন রায় বল্লেন (গ্র, ১১)—"**যদ্যপিও এমত সকল প্রশ্নের শ্রবণে কেবল মানস দুঃখ জন্মে, তত্রাপি কার্য্যানুরোধে উত্তর দিয়া যাইতেছে।**" এই বলে' তিনি ভূগোল শাস্ত্রের কিঞ্চিৎ বিবরণ দিয়ে বোঝালেন যে, পৃথিবী অতি বৃহৎ এবং পৃথিবীর সকল লোক প্রতিমাপূজা করে না। বল্লেন—

"এ কাল পর্য্যন্ত পৃথিবীর যে সীমা আমরা নির্দ্ধারণ করিয়াছি এবং যাতায়াত করিতেছি, তাহার বিংশতি অংশের এক অংশ [ও] এই হিন্দোস্থান না হয়। হিন্দুরা যে দেশেতে প্রচুররূপে বাস করেন, তাহাকে হিন্দোস্থান কহা যায়। এই হিন্দোস্থান ভিন্ন, অর্দ্ধেক হইতে অধিক পৃথিবীতে এক নিরঞ্জন পরব্রহ্মের উপাসনা লোকে করিয়া থাকেন। * * তবে কিরূপে কহেন যে, তাবৎ পৃথিবীর মতের বহির্ভূত এই ব্রহ্মোপাসনার মত হয়?

"আর, পূর্ব্বেও পণ্ডিতেরা যদি এই মতকে কেহো না জানিতেন এবং উপদেশ না করিতেন, তবে ভগবান্ বেদব্যাস এই সকল সূত্র কিরূপ করিয়া লোকের উপকারের নিমিত্ত প্রকাশ করিলেন? এবং বাদরি-বশিষ্ঠাদি আচার্য্যেরা কি প্রকারে এইরূপ ব্রহ্মোপদেশে প্রচুর গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন? ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য এবং ভাষ্যের টীকাকার সকলেই কেবল ব্রহ্ম স্থাপন এবং ব্রহ্মোপাসনার উপদেশ করিয়াছেন। নব্য আচার্য্য গুরু নানক প্রভৃতি এই ব্রহ্মোপাসনাকে গৃহস্থ এবং বিরক্তের প্রতি উপদেশ করেন; এবং আধুনিকের মধ্যে এই দেশ অবধি পঞ্জাব পর্য্যন্ত সহস্র সহস্র লোক ব্রহ্মোপাসক এবং ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশকর্ত্তা আছেন। তবে, আমি যাহা না জানি সে বস্তু অপ্রসিদ্ধ হয়, এমত নিয়ম যদি করহ, তবে ইহার উত্তর নাই।"

ব্রহ্মোপাসনা শুধু 'অল্প লোকের মত' নয়, একা রামমোহন রায়েরই মত, এই আপত্তিও উঠেছিল। রামমোহন যখন শাস্ত্রগ্রন্থসকল বঙ্গানুবাদ সহ প্রকাশ কর্‌তে লাগ্‌লেন, তখন অনেকে বন্ধুবান্ধবদের ও অনুগত ব্যক্তিদের বল্লেন—'তোমরা এ সব কেন পড়? এ সব ত রামমোহন রায়ের মত'। এই প্রকার উক্তি শুনে' রামমোহন ঈশোপনিষদের 'অনুষ্ঠান' নামক মুখবন্ধে লিখ্‌লেন (গ্র, ১৫৭—৫৮)—

"অত্যন্ত দুঃখ এই যে, সুবুদ্ধি ব্যক্তিরা এমত সকল অপ্রামাণ্য বাক্যকে কিরূপে কর্ণে স্থান দেন। কোনো শাস্ত্রকে ভাষায় বিবরণ করিলে, সে শাস্ত্র যদি সেই বিবরণকর্ত্তার মত হয়, তবে ভগবদ্গীতা, যাহাকে বাঙ্গালি ভাষায় এবং হিন্দোস্থানি ভাষায় কয়েক জন বিবরণ করিয়াছেন, [তাহাও] সেই সকল ব্যক্তির মত হইতে পারে! ও রামায়ণকে কীর্ত্তিবাস আর মহাভারতের কতক কতক কাশীদাস ভাষায় বিবরণ করেন, তবে এ সকল গ্রন্থ তাঁহাদের মত হইল! আর মনু প্রভৃতি গ্রন্থের অন্য অন্য দেশীয় ভাষাতে বিবরণ দেখিতেছি, তাহাও সেই সেই দেশীয় লোকের মত তাঁহাদের বিবেচনায় হইতে পারে; ইহা হইলে অনেক গ্রন্থের প্রমাণ্য উঠিয়া যায়। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিসকল বিবেচনা করিলে অনায়াসেই জানিবেন যে, এ কেবল দুষ্প্রবৃত্তিজনক বাক্য হয়। এ সকল শাস্ত্রের শ্রমপূর্ব্বক ভাষা করিবার উদ্দেশ্য এই যে, ইহার মত জ্ঞান স্বদেশীয় লোকসকলের অনায়াসে হইয়া এ অকিঞ্চনের প্রতি তুষ্ট হয়েন। কিন্তু মনোদুঃখ এই যে, অনেক স্থানে তাহার বিপরীত দেখা যায়।"

এই প্রকার আরও কত আপত্তির উত্তর রামমোহন রায়কে ধৈর্য্যের সহিত দিতে হয়েছিল। বাহুল্য-ভয়ে সে সকলের উল্লেখ করা হল না। বস্তুতঃ, ব্রহ্মোপাসনার বিরুদ্ধে ও মূর্ত্তিপূজার সমর্থনে আজ পর্য্যন্ত এমন যুক্তি বড় শোনা যায় না, যার উত্তর শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে রামমোহন রায় দিয়ে যান নি।

৯। মূর্ত্তিপূজা নিম্নাধিকারীর জন্য।

(ক) মূর্ত্তিপূজা নিম্ন স্তরের সাধনা।

মূর্ত্তিপূজা যে নিম্ন স্তরের সাধনা, এ বিষয়ে মতদ্বৈধ নেই। 'প্রথমে সাকারোপাসনা, পরে নিরাকারোপাসনা' এই যে আপত্তির আলোচনা পূর্ব্বে (৬২—৬৩ পৃঃ) করা হয়েছে, তাতেও আপত্তিকারীরা স্বয়ং এ কথা প্রকারান্তরে স্বীকার করেছেন। আদি কাল হতে এ পর্য্যন্ত কেহ কখনও বলেন নি যে, 'প্রথমে নিরাকারোপাসনা, পরে সাকারোপাসনা', অথবা, 'উভয় প্রকার উপাসনা সমান'। সকলেই স্বীকার করেন, মূর্ত্তিপূজা নিম্নাধিকারীর জন্য। তথাপি, শাস্ত্রকারেরা এ বিষয়ে কি বলেছেন, তা সর্ব্বসাধারণের জানা প্রয়োজন। রামমোহন রায় এ সম্বন্ধে অসংখ্য শাস্ত্রীয় বচন নানা সময়ে উদ্ধৃত করেছিলেন। তার মধ্যে কতকগুলির উল্লেখ এখানে করা যাচ্ছে :—

(১) আহ্নিকতত্ত্ব-ধৃত শাতাতপ বচন :—

"অপ্‌সু দেবা মনুষ্যাণাং দিবি দেবা মনীষিণাং।
কাষ্ঠলোষ্ট্রেষু মূর্খাণাং যুক্তস্যাত্মনি দেবতা ॥"

রামমোহন-কৃত অর্থ—"জলেতে ঈশ্বরবোধ ইতর মনুষ্যের হয় ; গ্রহাদিতে ঈশ্বরবোধ দৈবজ্ঞানীরা করেন ; কাষ্ঠ, মৃত্তিকা ইত্যাদিতে ঈশ্বরবোধ মূর্খেরা করে ; আত্মাতে ঈশ্বরবোধ জ্ঞানীরা করেন।" (গ্র, ১৪৬, ২৮০)

(২) "শ্রীভাগবতের দশম স্কন্ধে চৌরাশি অধ্যায়ে ব্যাসাদির প্রতি ভগবদ্‌বাক্য ঃ—

"কিং স্বল্পতপসাং নৃণামর্চ্চায়াং দেবচক্ষুষাং।
দর্শন স্পর্শন প্রশ্ন প্রহ্ব পাদার্চ্চনাদিকং॥

"ভগবান্ শ্রীধর স্বামীর ব্যাখ্যা—তীর্থস্নানাদিতে তপস্যাবুদ্ধি যাহাদের, আর প্রতিমাতে দেবতাজ্ঞান যাহাদের, এমতরূপ ব্যক্তিসকলের যোগেশ্বরেদের দর্শন স্পর্শন নমস্কার আর পাদার্চ্চন অসম্ভাবনীয় হয়।" (গ্র, ১৪৬)

(৩) ঐ ঃ—

"যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে
স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ।
যত্তীর্থবুদ্ধিশ্চ জলে ন কর্হিচি-
জ্জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ॥"

রামমোহন-কৃত অর্থ—"যে ব্যক্তির কফপিত্তবায়ুময় শরীরেতে আত্মার বোধ হয় [অর্থাৎ যে ব্যক্তি শরীরকে আত্মা মনে করে] আর স্ত্রীপুত্রাদিকে আত্মভাব [অর্থাৎ 'আমার' এই বোধ], আর মৃত্তিকানির্ম্মিত বস্তুতে দেবতাজ্ঞান হয়, আর জলেতে তীর্থবোধ

হয়, আর এ সকল জ্ঞান তত্ত্বজ্ঞানীতে না হয়, সে ব্যক্তি বড় গরু, অর্থাৎ অতি মূঢ়, হয়।" (গ্র, ১৪৬-৪৭, ২৭৯-৮০)

(৪) মাণ্ডুক্য উপনিষদের ভাষ্যে ধৃত বচন :—

"আশ্রমাস্ত্রিবিধা হীনমধ্যমোৎকৃষ্টদৃষ্টয়ঃ।
উপাসনোপদিষ্টেয়ং তদর্থমনুকম্পয়া॥"

রামমোহন-কৃত অর্থ—"আশ্রমী তিন প্রকার হয়েন—উত্তম, মধ্যম, অধম। অতএব, তাহাতে মধ্যম ও অধমের নিমিত্ত এই [সাকার] উপাসনা বেদে কৃপা করিয়া কহিয়াছেন।" (গ্র, ৬৬০-৬১)

(৫) মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে :—

"এবং গুণানুসারেণ রূপাণি বিবিধানি চ।
কল্পিতানি হিতার্থায় ভক্তানামল্পমেধসাং॥"

রামমোহন-কৃত অর্থ—"এইরূপ গুণের অনুসারে নানাপ্রকার রূপ অল্পবুদ্ধি ভক্তদিগের হিতের নিমিত্তে কল্পনা করা গিয়াছে।" (গ্র, ১৪৭, ৪৭০, ৬৬৪)

(৬) "অসমর্থো মনো ধাতুং নিত্যে নির্ব্বিষয়ে বিভৌ।
শব্দৈঃ প্রতীকৈরর্চ্চাভিরুপাসীত যথাক্রমং॥"

রামমোহন-কৃত অর্থ—"নিত্য, উপাধিশূন্য, সর্ব্বব্যাপি পরমেশ্বরেতে মনকে স্থাপন করিতে যে ব্যক্তি অসমর্থ হয়, সে শব্দের দ্বারা কিম্বা অবয়বের কল্পনা দ্বারা অথবা প্রতিমার দ্বারা যথাক্রমে উপাসনা করিবেক।" (গ্র, ৬৬১)

(৭) মাণ্ডুক্য উপনিষদের ভাষ্যে ধৃত বচন :—

"নির্ব্বিশেষং পরং ব্রহ্ম সাক্ষাৎ কর্ত্তুমনীশ্বরাঃ।
যে মন্দাস্তেঽনুকল্প্যন্তে সবিশেষনিরূপণৈঃ॥"

রামমোহন-কৃত অর্থ—"যে সকল মন্দবুদ্ধি ব্যক্তি নির্ব্বিশেষ পরব্রহ্মের উপাসনা করিতে অসমর্থ হয়, তাহারা রূপ কল্পনা করিয়া উপাসনা করিবেক [করে ?]। (গ্র, ৬৬৪, ৪৭০)

(৮) কুলার্ণব তন্ত্রের নবম উল্লাসে :—

"বিদিতেতু পরে তত্ত্বে বর্ণাতীতে হ্যবিক্রিয়ে।
কিঙ্করত্বং হি গচ্ছন্তি মন্ত্রা মন্ত্রাধিপৈঃ সহ॥"

রামমোহন-কৃত অর্থ—"ক্রিয়াহীন, বর্ণাতীত যে ব্রহ্মতত্ত্ব, তাহা বিদিত হইলে, মন্ত্রসকল মন্ত্রের অধিপতি দেবতার সহিত দাসত্ব প্রাপ্ত হয়েন।" (গ্র,, ১৪৭)

(৯) "পরে ব্রহ্মণি বিজ্ঞাতে সমস্তৈর্নিয়মৈরলং।
তালবৃন্তেন কিং কার্য্যং লব্ধে মলয়মারুতে॥"

রামমোহন-কৃত অর্থ—"পরব্রহ্ম জ্ঞান হইলে কোন নিয়মের প্রয়োজন থাকে না; যেমন মলয়ের বাতাস পাইলে তালের পাখা কোনো কার্য্যে আইসে না।" (গ্র, ১৪৭)

অতএব, শাস্ত্রসকল একবাক্যে বলেছেন যে, কল্পিত দেবদেবীর পূজা নিম্নস্তরের সাধনা।

(খ) যজ্ঞাদি কর্ম্ম নিকৃষ্ট সাধন।

'প্রথমে কর্ম্মসাধন, পরে জ্ঞান সাধন' এই আলোচনাতেও (৬৫—৬৬ পৃঃ) যজ্ঞাদি 'কর্ম্মের' হীনতা ও ব্রহ্মজ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব আপত্তিকারীরা

স্বয়ং প্রকারান্তরে স্বীকার করেছেন। ইহা স্বীকার না করে' উপায় নেই ; কারণ, শাস্ত্রে জ্ঞানপন্থীরা সর্ব্বত্রই 'কর্ম্মের' তীব্র নিন্দা করেছেন ; কিন্তু কর্ম্মপন্থীরা কুত্রাপি জ্ঞানের নিন্দা করতে সাহস পান নি। তাঁরা 'কর্ম্মের' সমর্থন জন্য শুধু এই পর্য্যন্ত বলতে পেরেছেন যে, 'কর্ম্ম' দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হয়ে জ্ঞানসাধনের উপযুক্ত হয়। জ্ঞানপন্থীদের যে সকল তিরস্কার বাক্য রামমোহন রায় উদ্ধৃত করেছেন, তার কয়েকটি এই—

(১) "প্লবাহ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা
অষ্টাদশোক্তমবরং যেষু কর্ম্ম।
এতচ্ছ্রেয়ো যেঽভিনন্দন্তি মূঢ়া
জরামৃত্যুং তে পুনরেবাপিয়ন্তি॥"

মুণ্ডক শ্রুতি, ১।২।৭

রামমোহন-কৃত অর্থ—"অষ্টাদশাঙ্গ যে যজ্ঞরূপ কর্ম্ম, তাহা সকল বিনাশি হয় ; ঐ বিনাশি কর্ম্মকে যে সকল ব্যক্তি শ্রেয় করিয়া জানে তাহারা পুনঃপুনঃ জন্মজরামৃত্যুকে প্রাপ্ত হয়।" (গ্র, ২৩১)

(২) "অবিদ্যায়াং বহুধা বর্ত্তমানা
বয়ং কৃতার্থা ইত্যভিমন্যন্তি বালাঃ।
যৎ কর্ম্মিণো ন প্রবেদয়ন্তি রাগাৎ
তেনাতুরাঃ ক্ষীণলোকাশ্চ্যবন্তে॥"

মুণ্ডক শ্রুতি, ১।২।৯

রামমোহন-কৃত অর্থ—"যে সকল ব্যক্তি অজ্ঞানরূপ কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠানে বহু প্রকারে নিযুক্ত থাকিয়া অভিমান করে যে, আমরা কৃতকার্য্য হই, সে অজ্ঞান লোকেরা কর্ম্মফলের বাসনাতে অন্ধ

হইয়া তত্ত্বজ্ঞান জানিতে পারে না। অতএব, সেই সকল ব্যক্তি কর্ম্মফল ক্ষয় হইলে, দুঃখে মগ্ন হইয়া স্বর্গ হইতে চ্যুত হয়।"

(গ্র, ২৩১)

(৩) "সকল স্মৃতি-পুরাণ-ইতিহাসের সার যে ভগবদ্গীতা, তাহাতে লিখিতেছেন—

"যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতিবাদিনঃ॥
কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্ম্মফলপ্রদাঃ।
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি॥
ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাং।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে॥"

(গীতা, ২।৪২-৪৪)

রামমোহন-কৃত অর্থ—"যে সকল মূঢ়েরা বেদের ফল-শ্রবণ বাক্যে রত হইয়া, আপাতত প্রিয়কারী যে ঐ ফলশ্রুতি, তাহাকেই পরমার্থসাধক করিয়া কহে, আর কহে যে, ইহার পর অন্য ঈশ্বর-তত্ত্ব নাই, ঐ সকল কামনাতে আকুলিতচিত্ত ব্যক্তিরা দেবতা-স্থান যে স্বর্গ তাহাকে পরম পুরুষার্থ করিয়া জানে; আর, জন্ম ও কর্ম্ম ও তাহার ফল প্রদান করে এবং ভোগ-ঐশ্বর্য্যের প্রলোভ দেখায় এমৎরূপ নানা ক্রিয়াতে পরিপূর্ণ যে সকল বাক্য আছে, এমৎ বাক্যসকলকে পরমার্থসাধন কহে। অতএব ভোগৈশ্বর্য্যেতে আসক্তচিত্ত এমৎরূপ ব্যক্তিসকলের পরমেশ্বরে চিত্তের নিষ্ঠা হয় না।" (গ্র, ১৭৩)

শাস্ত্রে এইরূপ ভূরি ভূরি বাক্যে যজ্ঞাদি 'কর্ম্মের' নিন্দা আছে।

(গ) প্রকৃত নিম্নাধিকারী কাহারা?

কিন্তু, শাস্ত্রে মূর্ত্তিপূজা ও যজ্ঞাদি কর্ম্মের নিন্দা থাকা সত্ত্বেও, অনেক স্থলে আবার এ সকলের বিধানও দেখা যায়। এর তাৎপর্য্য এই যে, এ সকল বিধান নিম্নাধিকারীর জন্য। এক্ষণে প্রশ্ন এই—নিম্নাধিকারী কারা? যে-কেহ আপনাকে নিম্নাধিকারী বলে' ব্রহ্মজ্ঞান সাধনের শ্রম এড়াতে চায়, সেই কি নিম্নাধিকারী?

এ বিষয়ে রামমোহন রায় শাস্ত্রের মর্ম্মানুসারে সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে, যারা উপযুক্ত আচার্য্যের সাহায্য নিয়ে যথাসাধ্য যত্ন করেও কিছুতেই পরমেশ্বরকে সর্ব্বব্যাপী ও চিন্ময় বলে' ধারণা কর্‌তে পারে না, কেবল তারাই নিম্নাধিকারী। যারা চেষ্টা কর্‌লে, অভ্যাস কর্‌লে, তাঁকে ঐরূপে ধারণা কর্‌তে সক্ষম, তারা যদি সেই শ্রমে বিমুখ হয়ে মূর্ত্তিপূজা ও যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানে রত থাকে এবং বলে, 'আমরা নিম্নাধিকারী', তবে তারা আত্ম-বঞ্চিত। তাদের সম্বন্ধেই ভাগবতে উক্ত হয়েছে—যে ব্যক্তি সর্ব্বভূতে অবস্থিত আত্মাস্বরূপ ঈশ্বরকে অবজ্ঞা করে' (অথবা পরিত্যাগ করে') প্রতিমাদি পূজা করে, সে পূজার বিড়ম্বনা করে; তার সেই পূজা ভস্মে ঘৃতাহুতির ন্যায় নিষ্ফল হয় (৬১ পৃষ্ঠায় লিখিত শ্লোকদ্বয় দ্রষ্টব্য)। যারা শক্তি থাকা সত্ত্বেও 'সর্ব্বভূতে অবস্থিত, আত্মাস্বরূপ' ঈশ্বরের উপাসনা করুচে না, তারা তাঁকে 'অবজ্ঞা করেছে' বা 'পরিত্যাগ করেছে' বলা যায়। আর, তাদের অবলম্বিত প্রতিমাদি পূজা যখন দীর্ঘকালেও তাদিগকে পরমেশ্বরের উপাসনায় নিয়ে যাচ্চে না, তখন সে সকল যে নিষ্ফল হচ্ছে, তাতেই বা সন্দেহ কি?

রামমোহন রায় ভাগবতের ঐ দুই বচন (গ্র, ৩০৪-৫, ৫৯৮, ৬৪০) ও অন্য নানা শাস্ত্রের বচন হতে নিম্নাধিকারীর পূর্ব্বোক্ত সংজ্ঞা নির্ণয় করেছিলেন।

মুণ্ডকোপনিষদের ইংরাজী অনুবাদের ভূমিকায় (W. 21) তিনি বল্‌চেন—ধর্ম্মোপদেষ্টারা অনবরত শিক্ষা দান কর্‌লেও যারা সৃষ্টি-কার্য্যের পর্য্যালোচনা দ্বারা পরমেশ্বরের মহত্ত্ব স্পষ্টরূপে বুঝ্‌তে সক্ষম হয় না, বেদসকল কেবল তাদেরই জন্য মূর্ত্তিপূজা ছেড়ে দিয়েছেন। তাঁরা অপর সকলকে উন্নততর উপাসনা অবলম্বন কর্‌তে পুনঃপুনঃ উপদেশ দিয়েছেন ও উৎসাহিত করেছেন।

(ঘ) শিক্ষা দিলে 'নিম্নাধিকারী' উচ্চাধিকারী হয়।

উপরের উক্তিতে 'অনবরত শিক্ষা দান কর্‌লেও' এই কথাটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। আমাদের সমাজে প্রকৃত ঈশ্বর-তত্ত্ব শিক্ষা দানের কোনও প্রকার ব্যবস্থা বহু শতাব্দী যাবৎ প্রায় ছিল না; বরং লোকে বাল্যকাল হতে যজ্ঞাদির ও মূর্ত্তিপূজার শিক্ষার মধ্যেই বর্দ্ধিত হত। এ অবস্থায় পণ্ডিতমূর্খনির্ব্বিশেষে সকল লোককে যে নিম্নাধিকারী বলে' গণ্য করা হচ্ছিল, এতে রামমোহন রায়ের উদার প্রাণ ব্যথিত হত। তিনি হিন্দুজাতির অন্তর্নিহিত শক্তি জানতেন; তাই প্রথমে আত্মীয়-সভা (১৮১৫ খ্রীঃ) ও পরে ব্রাহ্মসমাজ (১৮২৮ খ্রীঃ) স্থাপন করে' ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষাদানের সূচনা কর্‌লেন। তাঁর সকল গ্রন্থপ্রচার ও তর্কবিচারেরও একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া। শিক্ষা দিলে যে তথাকথিত 'নিম্নাধিকারী' উচ্চাধিকারী হয়ে উঠে, তার প্রমাণ তিনি অল্পকালের মধ্যেই পেয়েছিলেন। কলকাতায় স্থায়ীভাবে বসে' শিক্ষাদান-চেষ্টা আরম্ভ কর্‌বার চার

বৎসর মাত্র পরেই তিনি কঠোপনিষদের ইংরাজী অনুবাদের ভূমিকায় (W. 45) আনন্দ প্রকাশ করে' লিখেছিলেন যে, দেশের বিস্তর বুদ্ধিমান্ লোক তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ [বেদান্ত সূত্র, বেদান্ত সার ও কয়েকখানা উপনিষদ্] পাঠ করে' মূর্ত্তিপূজা পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রহ্মোপাসনা আরম্ভ করেছেন। আর, আমরা স্বচক্ষেও দেখ্‌তে পাচ্চি, শিক্ষাদানের যে ব্যবস্থা রামমোহন রায় প্রবর্ত্তন করে' গিয়েছেন, তার ফলে এই শতাধিক বৎসরে সহস্র সহস্র 'নিম্নাধিকারী' ব্যক্তি উচ্চাধিকারী হয়েছেন এবং পুরুষ-নারী, ব্রাহ্মণ-শূদ্র, পণ্ডিত-মূর্খ অনেকে ব্রহ্মোপাসনার দ্বারা উন্নতি লাভ করে' আপনাদিগকে কৃতার্থ বোধ কর্‌চেন। তাঁরা নিজেদের অভিজ্ঞতায় বুঝ্‌তে পেরেছেন যে, এ দেশে এমন লোক অতি অল্পই আছেন, যাঁরা উপযুক্ত শিক্ষা পেলে ব্রহ্মোপাসনা না কর্‌তে পারেন।

(ঙ) মূর্ত্তিপূজার ব্যবস্থা কেবল 'নিম্নাধিকারীকে' উচ্চাধিকারে তোল্‌বার জন্য।

নিম্নাধিকারীদের প্রতি শাস্ত্রে যে দেবদেবী-পূজার অনুমতি দেওয়া হয়েছে, রামমোহন রায়ের মতে, তার উদ্দেশ্য এই ছিল যে, সত্য ঈশ্বরের উপাসনা হতে বঞ্চিত থাকাতে তাদের যে দুর্ভাগ্য, তার যেন কিঞ্চিৎ উপশম হয় (W. 108); আর, ঐ সকল পূজার ফলে ঈশ্বর-তত্ত্বের অনুসন্ধান জন্মালে, তারা যেন সেই ভ্রম পরিত্যাগ করে' সত্য ঈশ্বরের উপাসনায় প্রবৃত্ত হয়। লোকে আজীবন ঐ সকল নিয়েই থাক্‌বে এবং পুত্রপৌত্রাদির জন্য ঐ ব্যবস্থাই স্থায়ী করে' যাবে, শাস্ত্রকারদের এমন অভিপ্রায় ছিল না।

রামমোহন বল্‌চেন (গ্র, ৪৭০)—পুরাণাদি শাস্ত্রে সর্ব্বথা ঈশ্বরকে বেদান্তানুসারে অতীন্দ্রিয়, আকাররহিত কহেন। পুরাণে অধিক এই যে, মন্দবুদ্ধি লোক অতীন্দ্রিয় নিরাকার পরমেশ্বরকে অবলম্বন করিতে অসমর্থ হইয়া সম্যক্ প্রকারে পরমার্থসাধন বিনা জন্ম ক্ষেপ করিবেক, কিম্বা দুষ্কর্ম্মে প্রবর্ত্ত হইবেক, অতএব নিরবলম্বন হইতে ও দুষ্কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করিবার নিমিত্ত, ঈশ্বরকে মনুষ্যাদি আকারে, ও যে যে চেষ্টা মনুষ্যাদির সর্ব্বদা গ্রহ হয়, তদ্বিশিষ্ট করিয়া বর্ণন করিয়াছেন; যাহাতে তাহাদের ঈশ্বর উদ্দেশ হয়, [এবং] পরে পরে যত্ন করিলে যথার্থ জ্ঞানের সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু বারংবার ঐ পুরাণাদি সাবধানপূর্ব্বক কহিয়াছেন যে, এ সকল রূপাদি-বর্ণন কেবল কল্পনা করিয়া মন্দবুদ্ধির নিমিত্ত লিখিলাম; বস্তুত পরমেশ্বর নামরূপহীন ও ইন্দ্রিয়গ্রাম [ও] বিষয়ভোগ রহিত হয়েন।" এই বলে' তিনি শাস্ত্রীয় বচনসকল উদ্ধৃত করেছেন। সে সকল বচনের কয়েকটি পূর্ব্বে (৮৭-৮৮ পৃষ্ঠায়) উল্লেখ করা হয়েছে।

মন্দবুদ্ধি ব্যক্তিরা কিরূপে কাল্পনিক উপাসনার প্রতি শীঘ্র আকৃষ্ট হয়, এবং পরে কিরূপেই বা তা পরিত্যাগ করে' তাদের সত্য ঈশ্বরের উপাসনায় প্রবৃত্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, রামমোহন সে কথা এইরূপে বর্ণনা করেছেন (গ্র, ৬৯৬)—"প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে, ইতর [অর্থাৎ অজ্ঞান] লোককে যদি এরূপ উপদেশ করা যায় যে, এ জগতের স্রষ্টা পাতা সংহর্ত্তা এক পরমেশ্বর আছেন, তিনি সকলের নিয়ন্তা, তাঁহার স্বরূপ আমরা জানি না, [কিন্তু] তাঁহার

আরাধনাতে সর্ব্বসিদ্ধ হয়, তাঁহারই আরাধনা কর, [তবে] সে ইতর ব্যক্তির এ উপদেশ বোধগম্য না হইয়া চিত্তের অস্থৈর্য্য হইবার সম্ভাবনা আছে। আর, যদি সেই ইতর ব্যক্তিকে এরূপ উপদেশ করা যায় যে, যাঁহার হস্তির ন্যায় মস্তক [ও] মনুষ্যের ন্যায় হস্তপদাদি, তিনি ঈশ্বর হয়েন, [তবে] সে ব্যক্তি এ উপদেশকে শীঘ্র বোধগম্য করিয়া ঈশ্বরোদ্দেশে সেই মূর্ত্তিতে চিত্ত স্থির রাখে, এবং শাস্ত্রাদির অনুশীলন করে; এবং তাহার দ্বারা পরে পরে বুঝে যে, এ কেবল দুর্ব্বলাধিকারির জন্যে অরূপবিশিষ্ট ঈশ্বরের রূপকল্পনা হইয়াছে; অপরিমিত যে পরমাত্মা তিনি কি প্রকারে দৃষ্টির পরিমাণে আসিতে পারেন? কোথা বাক্যমনের অগোচর ব্রহ্ম, আর কোথায় হস্তির মস্তক! এইরূপ মননাদি দ্বারা সে ব্যক্তি ব্রহ্মতত্ত্বের জিজ্ঞাসু হইয়া কৃতকার্য্য হয়।”

এই উক্তিটিতে রামমোহন রায় বল্‌তে চাচ্চেন যে, পুরাণকারেরা অজ্ঞান লোকদের মনোযোগ শীঘ্র আকর্ষণ কর্‌বার জন্যই অদ্ভুত মূর্ত্তির বর্ণনা ও তার পূজার ব্যবস্থা করেছেন, যেন তার দ্বারা শীঘ্র আকৃষ্ট হয়ে এসে তারা শাস্ত্রাদির অনুশীলন করে এবং তার ফলে ক্রমে সত্য ঈশ্বরের পরিচয় পায়।

একটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে এ কথাটি বোঝা যেতে পারে। মনে করুন, কোনও সদাশয় পাদ্‌রি সাহেব সহরের নিম্নশ্রেণীর বালকবালিকাদের জন্য একটি শিক্ষালয় স্থাপন করে' তাদের কল্যাণ সাধন কর্‌তে চান। কিন্তু তিনি অভিভাবকদের অনেক বলে' কয়ে' দুচারটি ছাত্রছাত্রী ও

যোগাড় করুতে পারলেন না। তারা কেহ শিক্ষার উপকারিতা বোঝে না। এ অবস্থায় সাহেব অনেক চিন্তা করে' এক উপায় স্থির করলেন। এক দিন আপন ভৃত্যের দুইটি ছেলেকে সিংহের মুখোস পরিয়ে তিনি তাঁর গাড়ীতে বসালেন। তাদের এক জন তাঁর আদেশে গান আরম্ভ করল, অপর জন ঢোল বাজাতে লাগ্‌ল। এই ভাবে সাহেব সহরের রাস্তা দিয়ে খোলা গাড়ী হাঁকিয়ে চল্লেন। সিংহের মুখে গান শুনে' ও সিংহের ঢোল-বাদ্য শ্রবণ করে' অগণ্য ছেলেমেয়ে গাড়ীর পিছু পিছু ছুট্‌ল। সাহেবও সহর ঘুরে' অবশেষে আপন মিশন কম্পাউণ্ডে এসে প্রবেশ করলেন। গাড়ী হতে নেমে তিনি সমাগত ছেলে-মেয়েদের আদর করলেন ও মিষ্টদ্রব্য খেতে দিলেন। ছোট ছোট ছবি দিলেন এবং সেই সঙ্গে শ্লেট-পেন্সিলও দিলেন। সকলের নাম-ধাম লিখে' নিয়ে বলে' দিলেন, 'তোমরা রোজ এসো; রোজ এখানে নানা রকম তামাসা হবে, আর মিঠাই-মণ্ডা দেওয়া হবে, ছবি দেওয়া হবে'। এইরূপে বালকবালিকাদের আকৃষ্ট করে' সাহেব কার্য্য আরম্ভ করলেন, এবং কিছু দিনের মধ্যে স্কুলটি গড়ে' তুল্লেন। ক্রমে যখন ছাত্রছাত্রীরা পড়াশুনায় আনন্দ পেতে লাগ্‌ল, তিনিও একে একে সকল তামাসা-দেখান, খাওয়ান প্রভৃতি তুলে' দিলেন।

এটি কল্পনা নয়। ইংলণ্ডে কোনও সাহেব এরূপ উপায় অবলম্বন করে' সত্যসত্যই শ্রমজীবীদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের সূচনা করেছিলেন। রামমোহন রায়ের অভিপ্রায় এই যে, মূর্ত্তিপূজা এইরূপ উদ্দেশ্য নিয়েই প্রবর্ত্তন করা হয়েছিল। তিনি যখন বল্‌তেন 'মূর্ত্তিপূজা অজ্ঞান লোকদের চিত্তের স্থিরতার জন্য কল্পিত', তখন সে কথা এই অর্থেই বল্‌তেন যে, অজ্ঞান লোকেরা এর দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে এসে 'নিরবলম্বন' হতে ও 'দুষ্কর্ম্ম' হইতে নিবৃত্ত হবে (গ্র, ৪৭০), নাস্তিকতা হতে রক্ষা

পাবে (গ্র, ৫৯৯), পুরাণ-কর্ত্তাদের এই উদ্দেশ্য। মূর্ত্তিপূজা উপাসকদের 'হিতের' জন্য কল্পিত, পুরাণাদির এ কথাও তিনি এই অর্থেই গ্রহণ করতেন। কিন্তু মূর্ত্তি দ্বারা ব্রহ্মচিন্তার সহায়তা হয়, রামমোহন রায় এরূপ কখনও মনে করতেন না। কেননা, যিনি অমূর্ত্ত, মূর্ত্তিচিন্তায় তাঁর চিন্তার সহায়তা হওয়া দূরে থাক্, বরং গুরুতর ব্যাঘাতই ঘটে।

কিন্তু, মূর্ত্তিপূজার প্রবর্ত্তন বিষয়ে রামমোহন রায়ের উল্লিখিত অনুমানটি ঐতিহাসিক ভাবে সত্য কি না, এ বিষয়ে সন্দেহ করবার কারণ আছে। কোনও কোনও অসভ্য পার্ব্বত্যজাতির মধ্যে আর্য্য-সভ্যতা বিস্তার করবার জন্য প্রাচীন কালের ধর্ম্ম-প্রচারকেরা এরূপ কৌশল অবলম্বন করেছিলেন, এ কথা বল্লে বরং বিশ্বাসযোগ্য হত; কিন্তু, তাঁরা আপন বংশধরদের এই উপায়ে ব্রহ্মোপাসনার প্রতি আকৃষ্ট করতে চেষ্টা করে-ছিলেন বল্লে সহজে বিশ্বাস করা যায় না। নিজ সন্তানসন্ততিদের যোগ্যতা সম্বন্ধে এমন হীন ধারণা পোষণ করবার কি তাঁদের কোনও উপযুক্ত কারণ ছিল? লোকে নিজে যা বিশ্বাস করে, পুত্রকন্যাকে তাই শিক্ষা দেয়। অতএব, যাঁরা মূর্ত্তিপূজার বিধি দিয়েছিলেন, তাঁরা তাতে বিশ্বাসী ছিলেন, এ অনুমানই অধিক যুক্তিযুক্ত। আর, যাঁরা ব্রহ্মোপাসনার আস্বাদন লাভ করেছিলেন, মূর্ত্তিপূজার নিন্দা তাঁরাই করে' থাকবেন। মূর্ত্তিপূজা নিম্নাধিকারীর জন্য, এ কথাও সম্ভবতঃ শেষোক্ত শ্রেণীর ব্যক্তিদিগেরই উক্তি।

আর্য্যেরা অনার্য্যদের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত কৌশলে মূর্ত্তিপূজা প্রবর্ত্তিত করেছিলেন এবং স্বয়ং উহা হতে মুক্ত ছিলেন, ইতিহাসে এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় কি না, জানি না। বরং ঐতিহাসিকেরা বলেন, অনার্য্যদের থেকেই আর্য্যেরা অনেক দেবতার পূজা অতর্কিতে গ্রহণ করেছিলেন। যে গণেশ দেবতার দৃষ্টান্ত রামমোহন রায় দিয়েছেন

(৯৪—৯৫ পৃঃ), কোনও কোনও ঐতিহাসিকের মতে, তাঁর মূর্ত্তি প্রাচীন ভারতীয় বণিকেরা যাভা দ্বীপ হতে প্রথমে এ দেশে এনেছিলেন। যা হোক্, এ কথা আমাদের বর্ত্তমান আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্গত নয়।

রামমোহন রায় যদিও বলেছেন, অজ্ঞ লোকদের চিত্তকে পরমার্থের দিকে শীঘ্র আকর্ষণ কর্‌বার জন্যই পুরাণকারগণ মূর্ত্তিপূজার প্রবর্ত্তন করেছিলেন, তথাপি তিনি স্বয়ং প্রায় কাকেও এমন বুদ্ধিহীন মনে কর্‌তেন না যে, বাল্যাবধি উপযুক্ত শিক্ষা পেলেও সত্য ঈশ্বরকে কিছুমাত্র বুঝ্‌তে সক্ষম হবে না। হিন্দুজাতি বর্ত্তমানে অধঃপতিত,এ বিষয়ে মতদ্বৈধ নেই; কিন্তু এ অবস্থায়ও এই জাতির মধ্যে রামমোহন রায় অনেক উন্নতির সম্ভাবনা দেখ্‌তেন। তিনি হিন্দুজাতির সম্বন্ধে বলেছিলেন (W. 74)—"A race, who, I cannot help thinking, are capable of better things"—হিন্দুগণ এমন এক জাতি যার অন্তর্গত লোকেরা চেষ্টা কর্‌লে অনেক উন্নতির পরিচয় দিতে পার্‌তেন। রামমোহন রায়ের মতে, হিন্দুরা সাধারণতঃ সত্য ঈশ্বরের উপাসনা কর্‌তে সক্ষম; কেবল যারা নিতান্ত নির্ব্বোধ, বা মানসিক বিকারগ্রস্ত, তারাই অক্ষম, তারাই নিম্নাধিকারী।

(চ) উচ্চাধিকার অলভনীয় নয়।

শাস্ত্রের মতেও তাই। ব্রহ্মজিজ্ঞাসা যার হয়েছে, 'ঈশ্বর কে? তিনি কেমন? তিনি কোথায়?' এরূপ প্রশ্ন কর্‌তে যে আরম্ভ করেছে, সে-ই যখন শাস্ত্রানুসারে উচ্চাধিকারী, তখন আর 'নিম্নাধিকারী' কয় জন অবশিষ্ট থাকে? সভ্যসমাজে ক্ষুদ্র শিশুরাও এ সকল প্রশ্ন করে। এরূপ দেখা গিয়েছে, একটি তিন বৎসরের বালক পিতাকে প্রশ্ন করল—"বাবা,

ঈশ্বর কি জলের মধ্যেও আছেন?” পিতা বল্লেন—“হাঁ!”। শিশু আবার প্রশ্ন কর্‌ল—“তবে আমরা যখন জল খাই, তখন ঈশ্বরকেও খাই?” আর এক দিন উনুনে কাঠ জ্বল্‌চে দেখে’ ঐ শিশুটি জিজ্ঞেস্ কর্‌ল—“বাবা, ঈশ্বর ত কাঠের মধ্যেও আছেন? তবে তিনি পুড়ে’ যান না?” এ সব প্রশ্নকে কি ব্রহ্মজিজ্ঞাসা বল্‌বেন না? আমি বলি, এই ত ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার আরম্ভ। শিশু বুঝ্‌তে চাচ্চে, ঈশ্বর যে সর্ব্বব্যাপী, সে কি রকম? সত্য বটে, সে ঈশ্বরকে অদৃশ্য, কিন্তু জড়ধর্ম্মী, মনে কর্‌চে। তিনি যে জড়ধর্ম্মী নন, জ্ঞানরূপী, শক্তিরূপী, সে কথা তাকে সাবধানে ক্রমে ক্রমে বুঝিয়ে দিতে হবে। বোঝাবার উপায় আছে। কিন্তু ‘নিম্নাধিকারী’ বলে’ তার এই ব্রহ্মজিজ্ঞাসাকে অঙ্কুরে বিনষ্ট করে’ দিলে তার কি গতি হবে? বিজ্ঞ লোকেরা বলেন, পদার্থ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে শিশুরা যে সব প্রশ্ন করে, তার যথাযথ উত্তর সহজ ভাষায় দিতে পার্‌লে এবং ঐরূপ অনুসন্ধানে তাদের উৎসাহ দিলে, কালে তারা উৎকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক হয়ে উঠে। সেইরূপ, ঈশ্বর ও ধর্ম্ম বিষয়ক প্রশ্নসকলেরও উপযুক্ত উত্তর দিতে পার্‌লে কালে শিশুরা উন্নত ধার্ম্মিক হবে, তাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু শিশুদের অনুসন্ধিৎসাকে অবজ্ঞা, বিরক্তি-প্রকাশ বা মিথ্যা উত্তর দানের দ্বারা অকালে মেরে ফেল্লে, যেমন বিজ্ঞানরাজ্যে, তেমনি ধর্ম্মরাজ্যে, তাদের গুরুতর ক্ষতি করা হয়। ভেবে দেখুন, কত কত শিশু আত্মাকে উভয় রাজ্যে এইরূপে মেরে ফেলা হয়েছে, এবং নিত্য মেরে ফেলা হচ্চে! ব্রহ্মজিজ্ঞাসু ব্যক্তিকে মূর্ত্তিপূজার উপদেশ দেওয়া কি মিথ্যা উত্তর দান নয়? এই মিথ্যা উত্তর দানের দ্বারা সমগ্র হিন্দুজাতির প্রতিভাকে বহু শতাব্দী যাবৎ পঙ্গু করে’ রাখা হয়েছে বল্লে কি দোষ হয়?

যে শিশুটির কথা বল্লাম, সে ব্রহ্মোপাসক পরিবারের সন্তান ছিল। দেবোপাসক পরিবারের শিশুরাও কি অনেক সময় ব্রহ্মজিজ্ঞাসার পরিচয়

দেয় না? "বাবা! কালী ত মন্দিরে রয়েছেন; তিনি ওখান থেকেই আমাদের কথা শুন্‌তে পান? খুব আস্তে বল্লেও শোনেন?" "মা! আমরা যে খাবার জিনিষ দিই, ঠাকুর ও সব সত্যি খান?" এরূপ সরল পবিত্র প্রশ্নসকল কি ব্রহ্মজিজ্ঞাসার পরিচায়ক নয়? কিন্তু হায়, কোটি কোটি শিশুর এই সুকোমল ব্রহ্মজিজ্ঞাসা সাহায্যের অভাবে অথবা কুশিক্ষার চাপে অঙ্কুরেই বিনষ্ট হচ্চে। ব্রহ্মজিজ্ঞাসার যে মহোচ্চ যোগ্যতা বেদান্ত-গ্রন্থের প্রথম সূত্রের ভাষ্যে ব্যাখ্যাত হয়েছে, তাই স্মরণ করে' আমরা কি শিশুদের ও অপর সকল মানুষের অন্তরের নিত্য-উদিত ব্রহ্মজিজ্ঞাসাকে তুচ্ছ কর্‌ব এবং অগণ্য আত্মার অকাল-মৃত্যু চেয়ে চেয়ে দেখ্‌ব? তাদের সাহায্য কর্‌বার কোনও ব্যবস্থা কর্‌ব না?

দ্বিতীয়তঃ, ঈশ্বর এক, এই জান্‌লেই যখন বহুর পূজা পরিত্যাগ কর্‌বার উপদেশ শাস্ত্রে রয়েছে, তখন বহু নিয়ে থাক্‌বার মত 'নিম্নাধিকারী' কে? 'ঈশ্বর এক' এ কথা সভ্যসমাজে কে না শুনেছেন এবং কে না স্বীকার করেন?

তৃতীয়তঃ, 'ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী' এই জ্ঞান হলেই যখন তাঁকে দেশে কালে পরিচ্ছিন্ন মনে না কর্‌বার উপদেশ শাস্ত্রকারেরা দিচ্চেন, তখন 'নিম্নাধিকারী' কে রইল? তাঁকে সর্ব্বব্যাপী বলে' কে না বোঝেন?

(ছ) উচ্চাধিকার লাভের জন্য চেষ্টার প্রয়োজন।

কিন্তু শাস্ত্রের সকল উপদেশেরই কদর্থ করে' আপন আচরণের সমর্থন করা সম্ভব। আমরা পুরুষানুক্রমে শাস্ত্রোক্ত এই অধিকারী-ভেদের দোহাই দিয়ে আপনাদের 'নিম্নাধিকারকে' চিরস্থায়ী করে' রেখেছি। জীবনের অপর সকল বিভাগে উচ্চাধিকারের দাবী করি। রাজ্যশাসনে উচ্চাধিকার লাভ কর্‌বার জন্য কত সংগ্রাম ও কত স্বার্থত্যাগ কর্‌চি।

জাতিভেদের সোপান-শ্রেণীর মধ্যে যারা যে সোপানে আছি, তার চেয়ে উচ্চতর সোপানে উঠ্‌বার জন্য কত চেষ্টা কর্‌চি। কিন্তু ধর্ম্মের ক্ষেত্রে অধিকারকে বাড়াবার চেষ্টা দূরে থাক্, যাতে আমাদের 'নিম্নাধিকার' অনন্ত কাল অক্ষুণ্ণ থাকে, তারই জন্য বদ্ধপরিকর হই।

স্কুলের ছেলে বার্ষিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারে নি; তবুও সে আপনাকে প্রমোশনের যোগ্য ভেবে হেড্ মাষ্টারের বাড়ী গিয়ে ধন্না দেয়! অভিভাবকও গিয়ে কত কাকুতি মিনতি করেন; বলেন—'মশায়, এবার দয়া করে' প্রমোশন্‌টা দিন; এখন থেকে বাড়ীতে মাষ্টার রেখে ছেলেকে ভাল করে' পড়াব।' কিন্তু, কি আশ্চর্য্য! ধর্ম্মের বিভাগে প্রমোশন পাওয়াটাই হল অধর্ম্ম! যে ব্যক্তি প্রমোশন পেতে চায়, সে সমাজচ্যুত হবার উপযুক্ত! আর, যে ধৃষ্ট ব্যক্তি আমাদের 'উচ্চাধিকারী' বলে এবং প্রমোশনের সহায়তা করে, সে দেশের ঘোর শত্রু! তার সম্বন্ধে কুৎসা রটনা করে' সর্ব্বসাধারণের মনে তাঁর প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মান চাই; যাতে তার কথা কেউ না শোনে!

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্য্য তাঁর প্রতিবাদ পুস্তিকায় মূর্ত্তিপূজার সমর্থনে বলেছিলেন—যাদের বুদ্ধি অল্প, যারা ঈশ্বরকে সর্ব্বব্যাপী বলে' বুঝ্‌তে পারে না, তাদের প্রতি কোনও সৃষ্ট বস্তুর অবলম্বনে উপাসনা কর্‌বার বিধি শাস্ত্রে রয়েছে। রামমোহন রায় এ কথা কখনও অস্বীকার করেন নি; তিনিও এ কথাই পুনঃ পুনঃ বলেছিলেন। কিন্তু তিনি বলেছিলেন, যাতে লোকে আত্মসম্মান অনুভব করে' উচ্চাধিকার লাভের চেষ্টা করে, সে জন্য; আর, বিদ্যালঙ্কার মহাশয় বল্লেন, যাতে নিম্নাধিকার নিয়ে বর্ত্তমান অবস্থায় চিরদিন নিরুদ্বেগে থাকা যায়, তার জন্য। এক জন শাস্ত্রোক্তিকে ব্যবহার কর্‌লেন, সকলকে নীচের ক্লাস্ হতে উপরের ক্লাসে তোল্‌বার জন্য; অপর জন ব্যবহার

করলেন, নীচের ক্লাসে অনন্ত কাল নিজে থাক্‌বার জন্য ও অপর সকলকে রাখ্‌বার জন্য! প্রচলিত প্রথার কি মোহিনী শক্তি! যা হোক্, রামমোহন রায় পণ্ডিত মহাশয়ের এ কথাটা ধরলেন; ধরে' বল্লেন (W. 109)—'বেশ; এই স্বীকারোক্তি দ্বারা ভট্টাচার্য্য আমার সকল কথার সত্যতা দৃঢ় করেছেন। অতএব, এখন এর সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত এই যে, তিনি ও তাঁর অনুবর্ত্তিগণ, হয় অবিলম্বে পৌত্তলিকতা বর্জ্জন করুন, না হয় বুদ্ধিমত্তার সকল দাবী পরিত্যাগ করুন।' কিন্তু হায়! পৌত্তলিকতা বর্জ্জন করা কি সহজ কার্য্য? শতাব্দীর পর শতাব্দী পণ্ডিতেরা পৌত্তলিকতার সহস্র বন্ধনে সমাজকে এমন দৃঢ়রূপে বেঁধেছেন যে, এখন এর থেকে নিষ্ক্রান্ত হওয়া নিজেদের পক্ষেই অসম্ভব হয়ে পড়েছে। কার সাধ্য পৌত্তলিকতা বর্জ্জন করে? তার চেয়ে নীরবে বুদ্ধিমত্তার দাবী পরিত্যাগ করে' যাওয়াই ভাল! ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাই করলেন; আর উত্তর দিলেন না।

এখন আপনারা ভেবে দেখুন, এত বড় শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতও যদি আপনাকে নিম্নাধিকারী বলেন, তবে ঋষিগণ বেদ-বেদান্ত রচনা করে' ব্রহ্মোপাসনার উপদেশ দিয়েছিলেন কার জন্য?

(জ) নিম্নাধিকারে সন্তুষ্ট থাকার কুফল।

শতাধিক বৎসর পরে, আজও আমরা অনেক পরিমাণে সেই অবস্থায়ই রয়েছি। আজও আমাদের বড় বড় পণ্ডিতগণ আপনাদের নিম্নাধিকারী বলতে কুণ্ঠিত হচ্ছেন না! সর্ব্বোচ্চ প্রাচ্য জ্ঞানের সঙ্গে সর্ব্বোচ্চ প্রতীচ্য জ্ঞানকে যাঁরা চিত্তে ধারণ করেছেন, তাঁরাও আপনাদের নিম্নাধিকারী বলেন! বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম উপাধিধারী অধ্যাপকগণ, যাঁরা দেশবিদেশের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দার্শনিক ও

বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বোঝেন, তাঁরাও বলেন, নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনা কেমন করে' হতে পারে, বুঝ্‌তে পারি না! উপনিষদের ব্রহ্মপ্রতিপাদক বচনসকল নাকি সম্পূর্ণ অবোধ্য! কিছু কাল পূর্ব্বে কোনও বিশ্ব-বিদ্যালয়ের এক জন সুবিখ্যাত অধ্যাপক এক বক্তৃতায় উপনিষদের একটি বচন আবৃত্তি করে' সর্ব্বসমক্ষে বল্লেন, এর কোনও অর্থ হয় না! সেই অবোধ্য (!) বচনটি এই:—

"অপাণিপাদো জবনো গৃহীতা
পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।
স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা
তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্॥"—শ্বেতাশ্বতর, ৩।১৯

এই বচনের শব্দার্থ ত দেখা যাচ্চে এই—তাঁর হস্ত নেই, তথাপি তিনি গ্রহণ করেন, পদ নেই তথাপি গমন করেন; তিনি চক্ষুহীন হয়েও দর্শন করেন, কর্ণহীন হয়েও শ্রবণ করেন। তিনি সকল জ্ঞেয় বস্তুকে জানেন, কিন্তু তাঁর জ্ঞাতা কেহ নেই। ব্রহ্মবিদ্‌গণ তাঁকে আদি ও মহান পুরুষ বলে' বর্ণনা করেছেন।

কিন্তু, চক্ষুকর্ণ না থাক্‌লে তিনি কি করে' দেখ্‌বেন-শুন্‌বেন? হস্তপদ না থাক্‌লে তিনি কি করে' ধর্‌বেন বা চল্‌বেন? এই হল সমস্যা! এটা অসম্ভব কথা! হেঁয়ালির ন্যায় শোনায়! অতএব, উক্ত বক্তা মহা পণ্ডিত এবং ধর্ম্মসাধক হয়েও বল্লেন—"এর মাথামুণ্ডু কি অর্থ হয়, আপনারা বুঝুন গিয়ে!" অর্থাৎ তাঁর বিবেচনায় সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়-কর্ত্তা পরমেশ্বরের মনুষ্যের ন্যায় শরীর আছে, এবং চক্ষুকর্ণাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় ও হস্তপদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয় আছে; না থাক্‌লে তিনি জগৎ-সংসার দেখ্‌বেন-শুন্‌বেন ও পরিচালন কর্‌বেন কেমন করে'?

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ও বলেছিলেন, পরমাত্মার দেহ আছে; সে কথার আলোচনা পূর্ব্বে (৪৬ পৃঃ) করেছি। শতাধিক বৎসর পরে, আজও সেই কথা! শাস্ত্রে কিন্তু সহস্র বার বলা হয়েছে যে, ব্রহ্ম দেহধারী নন; কেন না, দেহধারী হলেই তিনি আকাশের মধ্যগত হয়ে পরিমিত হলেন, এবং পরিমিত হলেই তিনি আর অসীম বা সর্ব্বব্যাপী রইলেন না; তাঁর ব্রহ্মত্ব লোপ হয়ে গেল। অথচ, তিনি যে জগৎ-সংসারকে দেখ্‌চেন-শুন্‌চেন ও পরিচালন কর্‌চেন, তা ত অস্বীকার করা যায় না। শাস্ত্র এই ভাবে কত বুঝিয়েছেন। কিন্তু আমরা ত বুঝি না! বড় বড় পণ্ডিতেরাও বোঝেন না! যদি এ যুগের লোকের পক্ষে নিরবয়ব ব্রহ্মের তত্ত্ব বোঝা অসম্ভবই হয়, তবে আর আমাদের প্রাচীন মুনিঋষিদের নাম নিয়ে গৌরব কর্‌বার প্রয়োজন কি? শাস্ত্ররূপ বিশাল লৌহ-সিন্ধুকের চাবি যদি এ যুগে কারো হাতেই না রইল, তবে আর এই মর্‌চে-পড়া প্রাচীন সিন্ধুক ঘরে রেখে ফল কি? একে সকলে মিলে ধরাধরি করে' বঙ্গোপসাগরে বিসর্জ্জন করে' এলেই হয়!

আচ্ছা, আমি আপনাদের সসম্মানে জিজ্ঞেস্ কর্‌চি, আমাদের গৌরবান্বিত হিন্দুজাতি যে আজ এ অবস্থায় এসে পৌছেচে, একে কি ঘোর দুর্গতি বলা অন্যায় হবে? একে চরম দুর্গতি না বলে' আপনারা আর কি বল্‌বেন?

এখন বলুন, এই দুর্গতির কারণ কি? কেন আমাদের বড় বড় পণ্ডিতেরাও ব্রহ্মকে নিরবয়ব বলে' ধারণা কর্‌তে পার্‌চেন না? শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ তত্ত্বসকল কেন তাঁদের কাছে এমন দুর্ব্বোধ্য হয়ে উঠেছে? পুরুষানুক্রমে 'নিম্নাধিকার' নিয়ে তৃপ্ত থাকাই কি এর কারণ নয়? সর্ব্বদা আকার ভেবে ভেবেই কি আমরা নিরাকার পরমেশ্বরকে ধারণা কর্‌বার ক্ষমতা হারাই নি?

হে পুরাণকারগণ! আপনারা একবার এসে দেখুন। আপনারা নাকি আমাদের 'হিতের জন্য' সাকার দেবদেবীর পূজার ব্যবস্থা করেছিলেন? এসে দেখুন, তাতে চরমে আমাদের কি পরিমাণ 'হিত' হয়েছে। আপনারা নাকি ব্রহ্মজ্ঞানের সোপান-রূপে দেবোপাসনার বিধি দিয়েছিলেন? এসে দেখুন, ঐ সোপান দ্বারা আমরা সহস্রাধিক বৎসরে ক্রমে উর্দ্ধে উঠেছি, কি কেবলই নিম্নে অবতরণ কর্‌চি। এসে দেখুন, আমরা এত কালের দেবোপাসনায় ক্রমে ব্রহ্মোপাসনার অধিকারী হয়েছি, কি ব্রহ্মোপাসনাকে একান্ত অসম্ভব ও অশেষ অনিষ্টকর ভেবে তার বিরোধী হয়েছি। আপনারা একবার এসে আপনাদের কার্য্যের ফলাফল বিচার করুন।

কিন্তু, পুরাণকারদের দোষ দিয়ে কি হবে? তাঁরা ত সকল কথাই খুলে' বলেছিলেন; তাঁরা ত সত্যকে সত্য ও কল্পনাকে কল্পনা বলে' স্পষ্টাক্ষরে ঘোষণা করেছিলেন। আমরাই বুদ্ধিদোষে মণিকে পরিত্যাগ করে' কাচখণ্ড গ্রহণ করেছি। রামমোহন রায় আমাদের ভ্রম বুঝিয়ে দিয়েছেন এবং বল্‌চেন—যা হবার হয়েছে; এখন ভবিষ্যতের কল্যাণের জন্য কাচখণ্ড পরিত্যাগপূর্ব্বক মণিকে পুনরায় গ্রহণ কর।

১০। দেবমূর্ত্তিসকল কি ঈশ্বরের প্রতিমা?

(ক) ঐশ্বরিক ও মানবিক উভয় ভাবের মিশ্রণে দেবতার সৃষ্টি।

দেবোপাসনা নিম্নাধিকারীদের উপযোগী হল কিসে? কোন্ গুণেই বা উহা আমাদের এত কাল মুগ্ধ করে' রেখেছে? সে কারণ এই যে, দেবতাদের উপাখ্যানে ঐশ্বরিক শক্তি ও স্বভাব এবং মানবিক দুর্ব্বলতা ও

ত্রুটি উভয় এক সঙ্গে মিশ্রিত করা হয়েছে। দেবতাদের চরিত্র বর্ণনায় মানবিক ভাব না থাক্‌লে, অজ্ঞান লোকদের চিত্ত তৎপ্রতি আকৃষ্ট হত না; আবার, ঐশ্বরিক ভাব কিয়ৎপরিমাণে না থাক্‌লে তাদের গোপন ধর্ম্মপিপাসাও চরিতার্থ হত না। দেবতাদের মধ্যে ঐশ্বরিক ভাব ও মানবিক ভাবের সংমিশ্রণ কিরূপ? না, তাঁরা এক দিকে স্থানে কালে পরিচ্ছিন্ন, অপর দিকে সর্ব্বব্যাপী; এক দিকে জন্মমৃত্যুর অধীন, অপর দিকে সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়-কর্ত্তা; এক দিকে অসুরদের দ্বারা বারংবার পরাভূত, অপর দিকে সর্ব্বশক্তিমান্; এক দিকে শারীরিক অভাবগ্রস্ত, অন্নজলের প্রার্থী, অপর দিকে সর্ব্বজীবের প্রতিপালক; এক দিকে কামক্রোধ-লোভের বশ, অপর দিকে মানুষের পরিত্রাতা, ইত্যাদি। বস্তুতঃ, কেবল মানবিক ভাব নিয়েও দেবতা হয় না, কেবল ঐশ্বরিক ভাব নিয়েও দেবতা হয় না; উভয় ভাবের সংমিশ্রণে দেবতার সৃষ্টি।

পূজা-কালেও দেবতাদের প্রতি ঐশ্বরিক ও মানবিক উভয় ভাবের আরোপ করা হয়। সেই সময়ে মানবিক ভাবের আরোপ কার্য্যতঃ কত দূর যায়, রামমোহন রায় ঈশোপনিষদের ইংরাজী অনুবাদের ভূমিকায় (W. 68) তার কিঞ্চিৎ বর্ণনা করেছেন। সে বর্ণনার মর্ম্মানুবাদ এই:—

"যখনই কোনও হিন্দু একটি মূর্ত্তি বাজারে ক্রয় করেন, বা নিজ হস্তে নির্ম্মাণ করেন, অথবা আপন তত্ত্বাবধানে অন্যের দ্বারা প্রস্তুত করান, তখন 'প্রাণ-প্রতিষ্ঠা' নামক একটি অত্যাবশ্যক অনুষ্ঠান করেন। তিনি বিশ্বাস করেন যে, এই অনুষ্ঠান দ্বারা সেই জড়ীয় উপাদানে গঠিত মূর্ত্তিটি জীবন লাভ করে এবং অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন হয়। অতঃপর, সেই মূর্ত্তি পুরুষ হলে, তিনি তার সঙ্গে একটি দেবীমূর্ত্তির বিবাহ দেন। সেই বিবাহ-অনুষ্ঠানে তাঁর নিজের পুত্রকন্যার বিবাহ অপেক্ষা অল্প আড়ম্বর হয় না। ঐ রহস্যময় ক্রিয়ানুষ্ঠান তখন সম্পূর্ণ হয়; এবং তখন

হতে সেই দেব ও দেবীকে তিনি নিজের ভাগ্য-নিয়ন্তা বলে' মনে করেন এবং পরম ভক্তির সহিত তাঁদের পূজা কর্‌তে থাকেন।

"এতদ্ভিন্ন, মূর্ত্তির উপাসক মূর্ত্তিসমূহে মানবীয় ও অতিমানবীয় দুই প্রকার স্বভাব এক সঙ্গে আরোপ করেন। প্রাণবান্ জীবের যেমন নানাপ্রকার অভাব থাকে, তাদের সম্বন্ধে সেইরূপ অভাব কল্পনা করে', তিনি প্রতিদিন প্রাতে ও সন্ধ্যায় তাদের 'খাওয়ান' অর্থাৎ খাওয়াবার ভাণ করেন। গ্রীষ্মকালে তিনি যত্নপূর্ব্বক তাদের শরীরে বায়ু ব্যজন করেন; এবং শীতকালে আরাম দেবার জন্য সমান যত্নে দিবাভাগে গরম কাপড়ে আবৃত রাখেন ও রাত্রিকালে কোমল শয্যায় শয়ন করান। কুসংস্কারের এখানেই পরিসমাপ্তি হয় না! দেবতাদের বাক্য ও কার্য্য এবং তাঁদের নানা আকৃতি ও বর্ণ-পরিগ্রহ সম্বন্ধীয় উপাখ্যানসকল ব্রাহ্মণেরা গম্ভীরভাবে বর্ণনা করেন; এবং তাঁদের মোহমুগ্ধ অনুযায়িবর্গ সেই সকল কাহিনী গভীর ভক্তির সহিত শ্রবণ করেন ও তাতে দৃঢ় আস্থা স্থাপন করেন। এতদ্ব্যতীত, ঐ সকল মূর্ত্তি সম্পর্কে এমন কোনো কোনো কার্য্যও করা হয়, যার বর্ণনা কর্‌তে আমি শ্লীলতার অনুরোধে অক্ষম।"

দেবতাদের চরিত-কাহিনীতে ও তাঁদের পূজার ব্যাপারে এইরূপ মানবিক ভাব মিশ্রিত থাকাতে তাঁদিগকে ঈশ্বর বলা যায় না, এবং তাঁদের পূজায় ঈশ্বরের সাধনাও হয় না।

(খ) দেবতাতে মানবিক ভাবের আরোপ ঈশ্বর-সাধনার বিঘ্ন।

এ কথা বলা নিষ্প্রয়োজন যে, দেবোপাসনা দ্বারা যেটুকু সুফল হওয়ার সম্ভাবনা, তা শুধু দেবতাদের প্রতি আরোপিত ঐশ্বরিক ভাব-

সকলের চিন্তার দ্বারা। কিন্তু মানবিক ভাব মিশ্রিত করাতে সেই সুফলও পূর্ণমাত্রায় ফল্‌তে পারে না। অপরিচ্ছিন্নকে পুনঃপুনঃ পরিচ্ছিন্ন মনে করাতে, সর্ব্বব্যাপীকে বারংবার স্থানে কালে আবদ্ধ ভাবাতে, অভাবহীনকে অভাবগ্রস্ত মনে করে' নৈবেদ্যাদি দেওয়াতে, নিষ্কলঙ্ক নিরঞ্জনকে কামক্রোধাদির অধীন বলে' চিন্তা করাতে, ঈশ্বর-সাধনার পথে অনবরত বিঘ্ন উপস্থিত হয়। সাধকেরা যে পরিমাণে এই বিঘ্ন কাটিয়ে উঠ্‌তে পারেন, অর্থাৎ যে পরিমাণে মানবিক ভাবসকলকে চিন্তার বাহিরে রেখে ঐশ্বরিক ভাবসকলের প্রতি মনোযোগ রাখ্‌তে পারেন, সেই পরিমাণে ধর্ম্ম-জীবনে উন্নতি লাভ করেন। রামপ্রসাদ, রামকৃষ্ণ প্রভৃতি যে সকল সাধক দেবপূজার মধ্য দিয়ে সিদ্ধি লাভ করেছিলেন, তাঁরা এইরূপেই করেছিলেন। তাঁদের সঙ্গীত ও উক্তি সকলের মধ্যে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন, "তারা আমার নিরাকারা", "ত্রিভুবন যে মায়ের মূর্ত্তি জেনেও কি তাই জান না?" "জগৎকে খাওয়াচ্চেন যে মা দিয়ে নিত্য খাদ্য নানা, কোন্ লাজে খাওয়াতে চাস্ তাঁয় আলো চাল আর বুটভিজানা?" ইত্যাদি। এ সকল উক্তি ঐশ্বরিক-ভাব চিন্তারই পরিচায়ক। তাঁদের মত প্রতিভাশালী ও ব্যাকুল সাধকদের পক্ষে এইরূপে বিঘ্ন কাটিয়ে অধ্যাত্মরাজ্যে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয়েছিল; সর্ব্বসাধারণের পক্ষে সম্ভব হয় না। অতএব যাঁরা বলেন, ঐ সকল সাধকের সিদ্ধি দেবপূজার সাহায্যে হয়েছিল, তাঁদের কথা সত্য নয়; দেবপূজার প্রতিকূলতা সত্ত্বেও হয়েছিল, এ কথাই সত্য।

(গ) উহাতে ভাবমুগ্ধতা জন্মায়।

কিন্তু সাধারণ মানুষ কেবল যে ঐ প্রতিকূলতা অতিক্রম কর্‌তে অক্ষম, তা নয়; অতিক্রম কর্‌তে চায়ও না। "সিদ্ধি চায় কয় জন?

সিদ্ধি কি, বোঝেই বা কয় জন? মানবিক ভাবের আরোপের ফলে এক প্রকার ভাবমুগ্ধতা জন্মে; সাধারণ মানুষ তাতেই তৃপ্ত থাকে। রামমোহন রায় একে 'মনোরঞ্জন' বলেছেন [১১ (চ) ও ১২ (খ) দ্রষ্টব্য]। ভাবমুগ্ধতা কিরূপ আমি নিজের অভিজ্ঞতা হতে একটু ভেঙ্গে বলি। এ যদিও রামমোহন রায়ের কথা নয়, তবু আশা করি এর দ্বারা তাঁর ভাবই স্পষ্ট হবে।

আমরা অনেকেই শৈশবাবধি দেবপূজা দেখেছি এবং তার মধ্যে বর্দ্ধিত হয়েছি; সুতরাং ভাবমুগ্ধতা আমাদের কাছে অজ্ঞাত নয়। আমি যা বল্‌ব, সেরূপ অভিজ্ঞতা আপনাদের মধ্যে অনেকেরই হয়ত আছে।

আমি বাল্যাবধি প্রতি বৎসর নিজ বাটীতে দুর্গোৎসবের সময় দেখ্‌তাম, বিল্বষষ্ঠীর দিন (অর্থাৎ পূজা আরম্ভের পূর্ব্বদিন) সায়ংকালে একটি ছোট কদলী বৃক্ষ সমূলে তুলে' এনে, তার সঙ্গে অন্য আট প্রকার শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট ছোট ছোট উদ্ভিদ বেঁধে, তাকে কাপড় পরিয়ে একটি বধূর ন্যায় প্রস্তুত করা হত। কলা গাছটির একটি ছোট বক্র শাখা সাম্‌নের দিকে নুয়ে এসেছে; তার উপর ঘোম্‌টা দিয়ে দেওয়াতে গাছটিকে বাস্তবিকই একটি রহস্যময়ী বউ বলে' মনে হত। কদলী সহ নয় প্রকার পত্র দ্বারা নির্ম্মিত বলে' বউটির নাম 'নবপত্রিকা'। বঙ্গদেশের কোনও কোনও অঞ্চলে তাঁকে 'কলা বউ' বলা হয়। বাগানে বেল গাছের গোড়ায় ষষ্ঠীর সন্ধ্যায় তাঁর প্রথম পূজা হত। পরদিন প্রাতে পুরোহিত মশায় সেই 'নবপত্রিকা' নাম্নী দেবীকে বেল গাছের গোড়া হতে এনে পূজামণ্ডপে, দুর্গার কাঠামোর ডান দিকে, স্থাপন কর্‌তেন। সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী, তিন দিন দুর্গার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরও পূজা হত। আমরা তাঁকে দুর্গারই আর এক রূপ মনে কর্‌তাম; শাস্ত্রানুসারে তিনি

কে এবং কেনই বা দুর্গার সঙ্গে তাঁর পূজা করা হয়, কিছুই জান্‌তাম না। তিন দিন যথারীতি পূজা, আহারাদি ও আমোদ-আহ্লাদ হওয়ার পর, দশমীর রাত্রিতে দুর্গার বিসর্জ্জন। সন্ধ্যাকালে যখন লোকজন এসে বাড়ী কোলাহলময় করেছে; পূর্ব্ব তিন দিনের ন্যায় ধূপধূনো দেওয়া হয়েছে; তখন পুরোহিত মশায় এসে শুদ্ধশান্ত ভাবে সেই নবপত্রিকাকে দুর্গামণ্ডপ হতে তুলে' বাড়ীর মধ্যে নিয়ে যেতেন। সেখানে গৃহের মধ্যস্থল পূর্ব্বেই গোময়াদি দ্বারা লেপন করে', তথায় দেবীর জন্য ধৌত পিঁড়ী পেতে রাখা হত। পুরোহিত সেই পিঁড়ীর উপর দেবীকে দাঁড় করাতেন এবং বাম হস্তে তাঁকে ধরে' তাঁর ডান দিকে মেজেতে নিজে বস্‌তেন। তখন আমার মা-খুড়ীরা ধান্য-দূর্ব্বা দ্বারা দেবীকে অভ্যর্থনা কর্‌তেন ও প্রণাম কর্‌তেন এবং তাঁর আহারের জন্য একখানা পাথর-থালায় খই, দই, কলা, গুড়, ইত্যাদি দ্রব্য এনে উপস্থিত কর্‌তেন। পুরোহিত সে সব একত্র মেখে গ্রাস প্রস্তুত করে' দেবীর ঘোম্‌টার কাছে ধর্‌তেন এবং পরে উচ্ছিষ্টের ন্যায় সেই গ্রাসটি একটি পৃথক্ বাটিতে ফেলে দিতেন। এইরূপে কয়েক গ্রাস খাইয়ে দেবীকে আচমন করাতেন; অর্থাৎ গণ্ডূষ গণ্ডূষ জল দেবীর ঘোম্‌টার কাছে নিয়ে ঐ বাটিতে ফেলে দিতেন। খড়্‌কে কাঠি দ্বারা দেবীর দন্তধাবন করাতেন—যদিও তাঁর মুখও নেই, দন্তও নেই, কেবল কলা গাছের শাখার উপরে ঘোম্‌টা। আমরা, বাড়ীর সকল লোক, চার দিকে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে এই গম্ভীর দৃশ্য দেখ্‌তাম। আমার স্মরণ আছে, সেই সময় আমার বালক-শরীরে রোমাঞ্চ হত; বিশেষতঃ ঐ 'দন্তধাবনের' সময়। আর মনে হত, 'হায়! এক বৎসরের মত দেবী আমাদের গৃহ হতে শেষ আহার করে' বিদায় নিচ্চেন! অল্পক্ষণ পরেই তাঁকে আর দেখ্‌তে পাব না!' এই ভেবে আমার চোখে জল আস্‌ত।

বাস্তবিক, দশমীর সায়ংকালকে কি দুঃখের সময় বলেই মনে হত! যখন দুর্গার কাঠামো ও সেই সঙ্গে এই নবপত্রিকাকে ঢাক ঢোল বাজিয়ে পুকুর পারে নেওয়া হত এবং ক্রমে বিসর্জ্জন করা হত, তখন গভীর দুঃখে সকলেরই প্রাণ অধীর হয়ে উঠ্‌ত। চার দিন ধরে' কত আমোদ-আহ্লাদ হয়েছে; বৎসরান্তে মা ঘরে (পিত্রালয়ে) এসেছিলেন, তাঁর কত প্রকার অভ্যর্থনা হয়েছে; আজ তিনি পুনরায় কৈলাসে (স্বামী গৃহে) চলে' যাচ্চেন। এই ভেবে, পুরুষনারী বালক-বালিকা সকলেরই হৃদয় ভারাক্রান্ত হত। যখন বিসর্জ্জনান্তে পুরুষেরা কীর্ত্তন ধর্‌তেন—"মাকে ভাসায়ে জলে কি লয়ে বঞ্চিমু ঘরে? কাল হল গো মা, কাল হল বিজয়া দশমী!"—তখন চোখের জল ধরে' রাখে কার সাধ্য?

তার পর শূন্যমনে বাড়ী ফিরে' এসে গুরুজনদিগকে প্রণাম ও পরস্পর আলিঙ্গনের পালা। আর বাজ্‌না নেই; ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি নেই; বাড়ী ক্রমে নিস্তব্ধ। কোনও রূপে দুটি আহার করে', বা আহার না করেই, দুঃখে নিদ্রা যেতাম।

এরই নাম ভাবমুগ্ধতা। হিমালয় পর্ব্বতের কন্যা দুর্গার বৎসরান্তে স্বামীগৃহ কৈলাস হতে পিত্রালয় ভারত-ভূমে আগমন, তিন দিন সন্তানদের ভক্তি-পূজা গ্রহণ ও তাদিগকে আশীর্ব্বাদ দান, পরে আবার স্বামীগৃহে প্রতিগমন, এ সকল স্মরণে প্রাণ হর্ষ-বিষাদে কত আন্দোলিত হত; নানা প্রকার ভাবতরঙ্গ উত্থিত হয়ে হৃদয়সিন্ধুকে কিরূপ উদ্বেলিত করে' তুল্‌ত। অথচ সত্য ঈশ্বরের সঙ্গে এ সব কাহিনীর কিছুমাত্র সংশ্রব নেই! ঈশ্বরের কি স্বামীগৃহ বা পিত্রালয় আছে? ঈশ্বর কি তিন দিনের জন্য আসেন, আবার তিন দিন পরে চলে যান? কল্পিত কাহিনীর কি ঘোর মোহে সমগ্র বাঙ্গালী জাতি বৎসরে বৎসরে

এইরূপে মুগ্ধ হন! এ সকল ব্যাপারকেই রামমোহন রায় 'dream of error' বলেছিলেন (W. 5)।

(ঘ) ভাবমুগ্ধতা ভক্তি নয়।

এই যে দেবতার কল্পিত আগমনে হর্ষ, কল্পিত বিদায়ে দুঃখ ও অশ্রু-পাত, এই যে তাঁকে আহারাদি করিয়ে ও বস্ত্রালঙ্কার দিয়ে সুখ, ইহাকে এক সময় 'ভক্তি' মনে করেছি; কিন্তু এ ভক্তি নয়, ভাবমুগ্ধতা। জড়ীয় মূর্ত্তিতে কল্পনাযোগে মানবীয় ভাব আরোপ কর্‌লে এরূপ ভাবমুগ্ধতা সহজেই হৃদয়কে অধিকার করে। দেবমূর্ত্তি না হয়ে অন্য সাধারণ মূর্ত্তি হলেও এই ভাবমুগ্ধতা আসতে পারে। তার একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি; সেটি শুন্‌লে আপনারা বিচার কর্‌তে পার্‌বেন, কল্পনা-জাত ভাবমুগ্ধতাকে 'ভক্তি' বলা চলে কি না।

একবার কোনও স্থানে ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে মাঘোৎসবের সময় একটি ব্যাপার হল। সকলেই জানেন, উৎসবের মধ্যে বালকবালিকাদের নির্দ্দোষ আনন্দ ও সেই সঙ্গে কিঞ্চিৎ নীতিধর্ম্ম শিক্ষার জন্য একটি দিন নির্দ্দিষ্ট থাকে। সে দিন বালকবালিকারা সঙ্গীত, আবৃত্তি, নীতি-উপদেশপূর্ণ ক্ষুদ্র অভিনয় ইত্যাদি করে' আপনারা খুসী হয় এবং অভিভাবকদেরও মনোরঞ্জন করে। আমি যে স্থানের কথা বল্‌চি, সেখানকার বালকবালিকারা সেবারে 'ভারত মাতা' সম্বন্ধীয় একটি সঙ্গীত অভিনয় সহকারে গান কর্‌বে। তারা আপনাদের মধ্য হতে একটি সুশ্রী মেয়েকে বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিত করে' 'ভারত মাতা' সাজাল। কাগজের একটি বৃহৎ পদ্মপুষ্প প্রস্তুত করে', তার উপরে মেয়েটিকে দাঁড় করাল। মেয়েটি পদ্মপুষ্পের মধ্যে স্থাপিত একখানা ক্ষুদ্র জলচৌকির উপরে পা দু'খানা রেখে দেবী মূর্ত্তির ন্যায় স্থির ভাবে দণ্ডায়মান হল। তার সম্মুখে

অপর কয়েকটি বালকবালিকা যখন মিষ্টকণ্ঠে গান ধরল—"যে দিন সুনীল জলধি হইতে উঠিলে জননী ভারতবর্ষ! উঠিল বিশ্বে সে কি কলরব, সে কি মা ভক্তি, সে কি মা হর্ষ!" ইত্যাদি, তখন দর্শকদের মনে হতে লাগ্‌ল যেন সুনীল ভারত-সমুদ্র হতে সত্য সত্য 'ভারত-মাতা' দেবীরূপে উত্থিত হচ্চেন। দর্শকদের মধ্যে যাঁরা কিঞ্চিৎ ভাবপ্রবণ ছিলেন, তাঁরা এই দৃশ্যে আত্মহারা হলেন; এবং আশ্চর্য্যের বিষয়, কারো কারো চক্ষে জল দেখা দিল! বল্‌তে কি, আমি নিজেও তার মধ্যে এক জন ছিলাম।

এখন ভাবুন দেখি, এই ভাবাবেগের কারণ কি? আমরা ত কেহ ঐ মেয়েটিকে সত্য সত্য ভারত-মাতা মনে করি নি; ভারত-মাতা বলে' কোনও দেবী কোথাও আছেন, তাও কেহ কস্মিন্‌কালে ভাবি নি; তবে কেন আমাদের হৃদয়ে এমন উচ্ছ্বাস এল যে, আমরা ভাবাশ্রু সম্বরণ কর্‌তে পার্‌লাম না? এটি কল্পনার প্রভাব—মানবীকরণের (personification-এর) ফল। অস্তিত্বহীন পদার্থকেও যদি কল্পনা-বলে মানবীয় রূপ দেওয়া যায়, এবং তন্ময় হয়ে তার চিন্তা করা যায়, তবে এইরূপ মুগ্ধতা সহজেই আসে। তার সঙ্গে যদি 'ইনি আমার উপাস্য' এরূপ বিশ্বাসের যোগ হয়, তবে ত আর কথাই নেই। তখন সেই মুগ্ধতাকে 'ভক্তি' বলে' মনে হওয়া কিছুই আশ্চর্য্য নয়। কিন্তু এ কি বাস্তবিক 'ভক্তি'? প্রকৃত ভক্তি ভক্তি-পাত্রের চরিত্রের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা হতে জন্মে। যে দৃষ্টান্তটি দেওয়া হল, তাতে সেরূপ কিছু ছিল না। স্বদেশানুরাগ ছিল বটে; কিন্তু মানবীকরণ ভিন্ন কেবল স্বদেশানুরাগ এই মুগ্ধতা উৎপন্ন কর্‌তে পার্‌ত না। মানবীকরণে স্বদেশানুরাগও ব্যর্থ ভাবুকতার আকার ধারণ করেছিল।

নবপত্রিকার আহার ও আচমনাদি দেখে’ আমার যে ভাবোচ্ছ্বাস হত, অথবা প্রতিমার বিসর্জ্জন দেখে’ যে অশ্রুপাত হত, তাও কি মানবীকরণের ফল নয়? উহাকে কি ‘ভক্তি’ বলা যায়?

উপাস্যের চরিত্রের প্রতি শ্রদ্ধাজনিত যে ভক্তি, তাতেই উপাসকের হৃদয়কে পবিত্র করে ও জীবনকে উন্নত করে। কিন্তু পূর্ব্বোক্তরূপ ভাবমুগ্ধতাতে হৃদয় সাময়িকভাবে একটু কোমল হয় মাত্র; কোনও স্থায়ী উপকার হয় না। আর, কল্পনামূলক হওয়াতে উহা দ্বারা মোক্ষলাভের কোনও সহায়তা হওয়া সম্ভব বলে’ মনে হয় না। কল্পনা দ্বারা ভাবসম্ভোগ-লালসা চরিতার্থ করাকেই রামমোহন রায় ‘মনোরঞ্জন” বল্‌তেন (গ্র, ১৫২, ৬৪৪)। অবশ্য ‘মনোরঞ্জন’ কথাটির মধ্যে বাহিরের আমোদ-প্রমোদের ইঙ্গিতও রয়েছে। ঢাকঢোল, কাঁসরশঙ্খ বাদ্যে মনে এক প্রকার উন্মাদনা-মিশ্রিত ভাবরসের সঞ্চার হয়; তাও ‘মনোরঞ্জন’। এ সকলকে ভক্তি মনে করা সঙ্গত নয়।

(৬) মূর্ত্তিসকল সত্য ঈশ্বরকে প্রকাশ করে না।

এখন আমরা স্বভাবতঃ এই প্রশ্নে উপস্থিত হচ্চি যে, যে সকল মূর্ত্তির পূজা করা হয়, তারা কি বাস্তবিক ঈশ্বরের মূর্ত্তি? তারা কি সত্য ঈশ্বরকে প্রকাশ করে? ইতিপূর্ব্বে (১০৫—৭ পৃঃ) যা বলা হয়েছে, তাতে এই প্রশ্নের উত্তর এক প্রকার হয়ে গিয়েছে। দেবতারা যখন ঐশ্বরিক ও মানবিক উভয় ভাবের সংমিশ্রণ এবং তাঁরা যখন কল্পিত, তখন তাঁরা ঈশ্বর নন। ঈশ্বরে মানবীয় ক্ষুদ্রতা ও ত্রুটি-দুর্ব্বলতা থাক্‌তে পারে না; তিনি ক্ষুধাতৃষ্ণা বা কামক্রোধাদির অধীন হতে পারেন না। অতএব মূর্ত্তিসকল কল্পিত দেবতাদেরই মূর্ত্তি; ঈশ্বরের

মূর্ত্তি নয়। সে সকলের দ্বারা ঈশ্বরের যথার্থ স্বরূপ ও স্বভাব প্রকাশ পায় না। বাস্তবিক ঈশ্বরের মূর্ত্তি বা প্রতিমা হতেই পারে না। রামমোহন রায় শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের (৪।১৯) এই বাক্যটি বারংবার উদ্ধৃত করেছেন (গ্র, ৫৯৭ ও অন্যত্র)—"ন তস্য প্রতিমা অস্তি যস্য নাম মহদ্‌যশঃ"—যাঁর নাম মহদ্‌যশ (অর্থাৎ যিনি অনন্ত মহিমাময়), তাঁর প্রতিমা নেই।

রামমোহন মনে কর্‌তেন, মূর্ত্তিপূজায় কেবল যে অপরিমিত ও অবিনাশী ঈশ্বরকে পরিমিত ও বিনাশশীল করা হয়, তা নয়; মানবীয় ভাব আরোপের দ্বারা তাঁর যথার্থ স্বরূপ ও স্বভাবকে নানা প্রকারে বিকৃত করা হয়। এরূপ বিকৃত করাকে তিনি পরমেশ্বরের প্রতি 'অপবাদ দেওয়া' বল্‌তেন। মাণ্ডুক্য উপনিষদের ভূমিকায় তিনি বলেছিলেন (গ্র, ৫৯৭)—"যে কোনো বস্তু চক্ষুগোচর হয়, সে অনিত্য এবং অস্থায়ি ও পরিমিত। অতএব পরমাত্মা রূপ-বিশিষ্ট হইয়া চক্ষুগোচর হয়েন, এমৎ অপবাদ পরমেশ্বরকে দিবেন না। তাঁহার জন্ম হইয়াছে, এমৎ অপবাদও দিবেন না। তাঁহার কাম ক্রোধ লোভ মোহ আছে এবং তেঁহ স্ত্রীসংগ্রহ ও যুদ্ধবিগ্রহাদি করেন, এমৎ অপবাদও দিবেন না।"

দেবতাদের সম্বন্ধে পুরাণাদিতে যে সকল নীতিবিরুদ্ধ আচরণের বর্ণনা আছে, যা সচরাচর পঠিত, কথিত, গীত ও অভিনীত হয়, তার প্রতি লক্ষ্য করে' রামমোহন বলেছিলেন (গ্র, ২৬৭)—"যাঁহারা পরমেশ্বরের প্রতি নানাবিধ কুৎসা ও অপবাদ গানবাদ্যপূর্ব্বক দিতে পারেন, তাঁহারা যে মনুষ্যের কুৎসা করিবেন, ইহার আশ্চর্য্য কি?"

আর এক স্থলে বলেছিলেন (গ্র, ৬৫০)—"যে সকল ব্যক্তি পরমেশ্বরকে জন্ম, মরণ ইত্যাদি অপবাদ দিতে পারেন, তাঁহারা অকিঞ্চন মনুষ্যের প্রতি দ্বেষ হইলে যে মিথ্যা অপবাদ দিবেন, ইহাতে কি আশ্চর্য্য আছে? অতএব, এমৎ সকল ব্যক্তির মিথ্যা অপবাদ দিবাতে ক্ষোভ কি?"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁর ইংরাজী গ্রন্থে বলেছিলেন—যেমন কোনও দূরস্থ প্রিয় বন্ধুর স্মৃতি উজ্জ্বল কর্‌বার জন্য তাঁর প্রতিকৃতি সম্মুখে রাখা হয়, দেবমূর্ত্তিসকল তদ্রূপ। এ কথার উত্তরে রামমোহন ইংরাজীতে যা বল্লেন (W. 117), তার মর্ম্ম এই—ভট্টাচার্য্যের এই উক্তি শুনে' আমার স্বভাবতঃ মনে হচ্চে যে, তিনি ঈশ্বরের সম্বন্ধে অতি অদ্ভুত ও অতি হীন ধারণা পোষণ করেন। কারণ, ঈশ্বর সকল সৃষ্টবস্তু অপেক্ষা মহৎ, এই ধারণা যে ব্যক্তির আছে, তার পক্ষে এ কথা বলা সম্ভব নয় যে, হিন্দুরা যে সকল লজ্জাজনক মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করেন, তদ্দ্বারা ঈশ্বরকেই প্রকাশ করা হয়। তাঁরা অনেক সময় এমন সকল মূর্ত্তি প্রস্তুত করেন, যার বর্ণনা শ্লীলতা রক্ষা করে' করা যায় না। অনেক সময় ক্ষেমঙ্করী নামক চিলের আকারে, বা নীলকণ্ঠ পক্ষীর আকারে, অথবা শৃগাল প্রভৃতি পশুর আকারে 'পরমেশ্বরের মূর্ত্তি' নির্ম্মাণ করা হয়। এ সকল কি অদ্ভুত ও হাস্যজনক ব্যাপার! বস্তুতঃ, এ কথা বিশ্বাস করাই কঠিন যে, কোনও বুদ্ধিবিশিষ্ট জীব পূর্ণস্বরূপ সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরকে স্মরণ কর্‌বার জন্য ঐ সকল পদার্থের সাহায্য নিতে পারে।

ভট্টাচার্য্য এই প্রশ্নও করেছিলেন—দেবমূর্ত্তিসকল কি দেখ্‌তে অপ্রীতিকর? রামমোহন বল্লেন (W. 118-19)—এ প্রশ্নের উত্তরে আমি

বল্‌ব, 'নিশ্চয়ই অপ্রীতিকর'। যে ব্যক্তির চিত্তের শুদ্ধতা হীন কুসংস্কারের দ্বারা নষ্ট হয় নি, তার নিকট মূর্ত্তিসকল অপ্রীতিকর বলেই বোধ হবে। কারণ, অনেক সময় ঐ সকল মূর্ত্তি অতি জঘন্য ও অশ্লীলভাবে নির্ম্মিত হয় এবং দর্শকের মনে বিরক্তি উৎপন্ন করে। কল্‌কাতা হতে চার মাইল মাত্র দূরে কালীঘাটে বা বরাহনগরে গেলেই পাঠক বুঝ্‌তে পার্‌বেন, ভট্টাচার্য্য ও তাঁর অনুবর্ত্তীদের প্রিয় মূর্ত্তিসকল অপ্রীতিকর কি না।

রামমোহন রায় কি কি কারণে মূর্ত্তিপূজার বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, সেই প্রসঙ্গেও তিনি ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে বলেছিলেন (৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য) যে, অনেক সময় অতিশয় লজ্জাজনক মূর্ত্তি প্রস্তুত করে' কদর্য্য ভাষায় এবং অশ্লীল সঙ্গীত ও অঙ্গভঙ্গী সহকারে তার আরাধনা করা হয়।

অতএব, রামমোহন রায়ের মতে (১) পুরাণাদিবর্ণিত দেবচরিত্র, (২) সেই দেবতাদের মূর্ত্তি, এবং (৩) তাঁদের আরাধনার প্রণালী, কিছুই সত্য ঈশ্বরের যথার্থ পরিচয় প্রদান করে না।

(চ) মূর্ত্তিপূজা ঈশ্বরের অবমাননা।

কেবল তা নয়, রামমোহন রায় মনে কর্‌তেন, মূর্ত্তিপূজা দ্বারা ঈশ্বরের অবমাননা করা হয়। মহান্‌, অনন্ত, সর্ব্বশক্তিমান্‌, পবিত্রস্বরূপ পরমেশ্বরকে ক্ষুদ্র, দুর্ব্বল ও নানা ত্রুটিসমন্বিত মানুষরূপে উপস্থিত করাই ত তাঁর অবমাননা; তদুপরি তাঁকে অনেক সময় পশুপক্ষীর আকারেও চিত্রিত করা হয়।

ভট্টাচার্য্য প্রশ্ন করেছিলেন—কোনও প্রিয় বন্ধু ঘরে এলে তাঁকে যদি চেয়ারে বসান যায় এবং সুগন্ধি পুষ্প ও অন্যান্য উপহার প্রদান করা যায়, তবে কি তাঁকে অপমান করা হয়? এই প্রশ্নের উত্তরে রামমোহন বল্লেন (W. 119)—না, তাতে বন্ধুর অপমান করা হয় না। কিন্তু যে বন্ধু ভক্তির পাত্র, তাঁকে যদি কখন কখন এমন আকারে চিত্রিত করা যায় যার উল্লেখমাত্র করলে সাধারণের শ্লীলতা-জ্ঞানে গুরুতর আঘাত পড়ে[১], এবং তাঁকে যদি কখন কখন বানরের আকারে[২], মৎস্যের আকারে[৩], শূকরের আকারে[৪], বা হস্তীর আকারে[৫] চিত্রিত করা যায়, অথবা সকল প্রকার সদ্‌গুণবিহীন ও নিতান্ত ঘৃণিত পাপী বলে' বর্ণনা করা যায়, তা হলে তিনি নিশ্চয়ই খুসী হবেন না। আর, গৃহস্থ যদি অভ্যাগত বন্ধুর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে, তাঁকে পরিত্যাগ করে', তাঁর ছবির সম্মুখে পুষ্পফল অর্পণ করতে থাকেন, তা হলে সেই বন্ধু কখনও মনে করবেন না যে, উক্ত গৃহস্থের বিন্দুমাত্রও জ্ঞানবুদ্ধি আছে।

এই সকল কঠিন বাক্যের দ্বারা রামমোহন রায় দেশবাসীর মনে এই জ্ঞানই জন্মিয়ে দিতে চেয়েছিলেন যে, সচরাচর যে সকল মূর্ত্তির পূজা করা হয়, তদ্দ্বারা সত্য ঈশ্বরের ভাব কিছুমাত্র ব্যক্ত হয় না; বরং তাঁর স্বরূপ ও স্বভাবকে এমন বিকৃত ও হীন করা হয় যে, ইহাকে তাঁর অবমাননা ভিন্ন অন্য কিছু বলা যায় না। তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, 'মূর্ত্তিপূজায় ঈশ্বরেরই পূজা হয়' এই ধারণা ভ্রান্ত; এ কেবল আত্মপ্রবোধ মাত্র।

কবিতাকার মনে করেছিলেন, প্রচলিত মূর্ত্তিপূজা যারা পরিত্যাগ করে, তাদের মধ্যে ধর্ম্ম কিছুমাত্র অবশিষ্ট থাকে না। এজন্য তিনি

১ হইতে ৫—রামমোহন রায় ফুটনোটে দৃষ্টান্ত দিয়েছেন:— ১। শিবলিঙ্গ, ২। হনুমান, ৩। বিষ্ণুর প্রথম অবতার, ৪। বিষ্ণুর তৃতীয় অবতার, ৫। গণেশ।

রামমোহন রায় ও তাঁর বন্ধুদের 'নাস্তিক' বলেছিলেন। তার উত্তরে রামমোহন বল্লেন (গ্র, ৬৭৯)—"কবিতাকারকে বিবেচনা করা উচিত যে, সর্ব্বব্যাপি, ইন্দ্রিয়ের অগোচর, চৈতন্যমাত্র, সর্ব্ব-নিয়ন্তা পরমেশ্বরের উপাসক 'নাস্তিক' শব্দের প্রতিপাদ্য হয়, কিম্বা অনিত্য, পরিমিত, কামক্রোধাদিবিশিষ্ট অবয়বকে যে ঈশ্বর কহে, সে 'নাস্তিক' শব্দের বাচ্য হয়। যেমন মনুষ্য আপন জন্মদাতাকে পিতা কহিলে পিতৃবিষয়ে নাস্তিক হয় না, কিন্তু পশ্বাদি অথবা স্থাবরাদি, তাহাকে পিতা কহিলে পিতৃ-বিষয়ে নাস্তিক অবশ্য হয়।"

রামমোহন রায়ের মতে সৃষ্টবস্তুকে স্রষ্টা জ্ঞানে পূজা করা নাস্তি-কতারই তুল্য; কারণ, তাতে স্রষ্টার যথার্থ পরিচয় অবরুদ্ধ থাকে।

(ছ) মূর্ত্তিসকল দেবতাদেরই প্রতিমা, ঈশ্বরের নয়।

বাস্তবিক, মূর্ত্তিসকল যে দেবতাদেরই প্রতিমা; ঈশ্বরের নয়, এ কথা কার্য্যকালে সকলেই স্বীকার করেন। কেহ কেহ বলেন—মূর্ত্তিপূজায় না হয় ঈশ্বরের পূজা না-ই হ'ল; দেবতাদের পূজা ত হয়? তাতেই বা দোষ কি? ভট্টাচার্য্য এই প্রশ্নও করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন—মৃৎপাষাণাদি প্রতিমা দেববিগ্রহের স্মারক, তাঁদের শাস্ত্রবিহিত পূজাদি করতে বাধা কি?

এই প্রশ্নের মধ্যে সরলতা ছিল; দেবতা ও ঈশ্বর যে এক নন, তা এই প্রশ্নে স্বীকৃত হয়েছে। রামমোহন রায় এই প্রশ্নের উত্তরে বল্লেন (গ্র, ৬৯৫)—"প্রতিমাদিতে দেবতার আরাধনা করা ইতর অধি-কারির নিমিত্তে শাস্ত্রে দেখিতেছি; কিন্তু ভট্টাচার্য্য এবং

তাদৃশ লোকসকল আপন আপন লাভের কারণ ঐ বিধি সর্ব্বসাধারণকে প্রেরণা করেন। ব্রহ্মজিজ্ঞাসা যাঁহারদিগের হইয়াছে, তাঁহারদিগের প্রতিমাদির দ্বারা অথবা মানস দ্বারা দেবতার আরাধনা করাতে স্পৃহা এবং আবশ্যকতা থাকে না।" অর্থাৎ যাঁরা যথার্থই নিম্নাধিকারী (৯১—৯২ পৃঃ দ্রষ্টব্য), ঈশ্বরকে সর্ব্বব্যাপী ও চিন্ময় বলে' কিছুতেই বুঝ্‌তে পারে না, কেবল তাদেরই জন্য দেবপূজার অনুমতি শাস্ত্রে আছে। অন্যেরা ঈশ্বরেরই উপাসনা কর্‌বে।

১১। দেবতারা বাস্তবিক আছেন কি না?

(ক) বেদান্তানুসারে দেবতারা আছেন, কিন্তু উপাস্য নহেন।

এক্ষণে প্রশ্ন এই—মূর্ত্তিসকল যাঁদের প্রতিমা, সেই দেবতাগণ বাস্তবিক আছেন কি না? যদি থাকেন এবং মনুষ্যের উপরে তাঁদের ক্ষমতা থাকে, তবে ত তাঁদের পূজা না কর্‌লে ইহলোকে বা পরলোকে ইষ্টহানি ও অনিষ্টোৎপত্তি হতে পারে। এ বিষয়ে শাস্ত্রেরই বা মত কি, আর রামমোহন রায়ই বা কি মনে কর্‌তেন?

শাস্ত্রের মধ্যে বেদান্তসূত্র দেবতাদের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন (১৷৩৷২৬-২৭); কিন্তু তাঁরা সৃষ্ট ও নশ্বর, এই হেতুতে তাঁদের উপাস্য বলে' স্বীকার করেন নি (৩৷৩৷৬৭, ৪৷১৷৪, ৪৷৩৷১৫-১৬)। বেদান্তানুসারে রামমোহন রায়ও বিচারকালে সময় সময় দেবতাদের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন।

কবিতাকার বলেছিলেন যে, রামমোহন রায় রাম, কৃষ্ণ, মহাদেব প্রভৃতিকে দ্বেষ করেন। এই অভিযোগের উত্তরে রামমোহন বল্লেন (গ্র, ৬৪৯)—"**হরিহরের দ্বেষ করা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে ? যেহেতু যে স্থানে আমাদের প্রকাশিত পুস্তকে তাঁহাদের নাম গ্রহণ হইয়াছে, তথায় 'ভগবান্' শব্দ, কি 'পরমারাধ্য' শব্দ পূর্ব্বক তাঁহাদের নামকে সকলে দেখিতে পাইবেন।**" বস্তুতঃ রামমোহন তাঁর বিচারগ্রন্থসমূহে দেবতা ও ঋষিদিগের নামের পূর্ব্বে 'ভগবান্' প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার করতেন। এ বিষয়ে তাঁর সৌজন্য সময় সময় অতিরিক্ত হয়ে পড়ত। কিন্তু আপনারা ইতিপূর্ব্বে দেখেছেন এবং পরে আরও দেখবেন যে, দেবতাদের চরিত্রের যে সকল কলঙ্ক পুরাণাদিতে বর্ণিত আছে, তদ্দ্বারা যে উপাসকদের নীতির হীনতা ঘটে সে কথা বুঝিয়ে দিতে তিনি কখনও সঙ্কুচিত হন নি।

দেবতাদের অস্তিত্ব বিষয়ে তিনি এক স্থলে বলেছেন (গ্র, ৭০০)—"**বেদান্ত মতে দেবতাদিগের শরীর প্রসিদ্ধ আছে ; সুতরাং আমরাও ঐ দেবতাদিগের বিগ্রহ স্বীকার করি। কিন্তু ঐ বেদান্ত-নিদর্শনে ঐ বিগ্রহকে অস্মদাদির দেহবৎ মায়িক ও নশ্বর করিয়া জানি।**"

(খ) দেবতারা সৃষ্ট ও নশ্বর।

দেবতারা যে সৃষ্ট, রামমোহন রায় তার শাস্ত্রীয় প্রমাণ দিচ্চেন (W. 110-11) :—

"**যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্ যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ।**
তস্মাদেতদ্ ব্রহ্ম নামরূপমন্নঞ্চ জায়তে॥"—মুণ্ডক, ১।৯

রামমোহন-কৃত অর্থ—"যিনি সামান্যরূপে সকলকে জানিতেছেন, এবং বিশেষরূপে সকলকে জানেন, আর যাঁহার জ্ঞানমাত্র তাবৎ সৃষ্টির উপায় হইয়াছে, সেই অবিনাশি ব্রহ্ম হইতে এই ব্রহ্মা অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ, আর নামরূপ, এবং অন্ন অর্থাৎ ব্রীহিযবাদি সকল জন্মিতেছে।" (গ্র, ৫৭৭—৭৮)

কোনও কোনও দেবতার জন্মকাহিনী পুরাণাদিতে বর্ণিত আছে; যেমন, ব্রহ্মা, দুর্গা, কার্ত্তিক, গণেশ প্রভৃতির।

দেবতারা যে মৃত্যুর অধীন, তার প্রমাণস্বরূপ রামমোহন রায় নিম্নোক্ত বচনগুলি উদ্ধৃত করেছেন :—

(১) কুলার্ণব তন্ত্রের প্রথম উল্লাসে :—

"ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশাদি দেবতা ভূতজাতয়ঃ।
সর্ব্বে নাশং প্রযাস্যন্তি তস্মাচ্ছ্রেয়ঃ সমাচরেৎ॥"

রামমোহন কৃত অর্থ—"ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব প্রভৃতি দেবতা, এবং যাবৎ শরীরবিশিষ্ট বস্তু, সকলে নাশকে পাইবেন; অতএব আপন আপন মঙ্গল-চেষ্টা করিবেক।" (গ্র, ১৪৮, ৬৬৬, ৬৯৫)। অর্থাৎ যিনি অবিনাশী, তাঁরই আশ্রয় গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

(২) স্মার্ত্ত-ধৃত বিষ্ণুর বচন :—

"যে সমর্থা জগত্যস্মিন্ সৃষ্টিসংহারকারিণঃ।
তেঽপি কালে প্রলীয়ন্তে কালোহি বলবত্তরঃ॥"

রামমোহন-কৃত অর্থ—"এই জগতের যাঁহারা সৃষ্টিসংহারের কর্ত্তা এবং সমর্থ হয়েন, তাঁহারাও কালে লীন হয়েন; অতএব কাল বড় বলবান্।" (গ্র, ১৪৮, ৬৬৬)

(৩) যাজ্ঞবল্ক্যের বচন :—

"গঙ্গী বসুমতী নাশমুদধির্দৈবতানি চ।

ফেণপ্রখ্যঃ কথং নাশং মর্ত্ত্যলোকো ন যাস্যতি ॥"

রামমোহন-কৃত অর্থ—"পৃথিবী এবং সমুদ্র এবং দেবতারা, সকলেই নাশকে পাইবেন ; অতএব ফেণার ন্যায় অচিরস্থায়ী যে মনুষ্যসকল, কেন তাহারা নাশকে না পাইবেক ?" (গ্র, ১৪৮, ৬৬৬)

শিব-পত্নী সতীর মৃত্যু-বিবরণ পুরাণে বর্ণিত আছে। সকল দেবতাই অসুরদের সহিত যুদ্ধকালে সময় সময় মৃত্যুভয়ে পলায়ন কর্‌তেন, ইহাও প্রসিদ্ধ আছে। সুতরাং দেবতারা মৃত্যুর অধীন, তাতে আর সন্দেহ কি ?

দেবতাদের উদ্দেশে অনুষ্ঠিত যজ্ঞাদি ক্রিয়া এবং তার ফলও বিনাশ-শীল। এ বিষয়ে রামমোহন এই বচন উদ্ধৃত করেছেন :—

"ক্ষরন্তি সর্ব্বা বৈদিক্যা জুহোতি যজতি ক্রিয়াঃ।

অক্ষরস্ত্বক্ষয়ং জ্ঞেয়ং ব্রহ্ম চৈব প্রজাপতিঃ ॥"—মনু, ২।৮২

রামমোহন-কৃত অর্থ—"তাবৎ বৈদিক কর্ম্ম, কি হবন, কি যজন, স্বভাবত এবং ফলত নাশকে পায় ; কিন্তু প্রজাদের পতি যে পরব্রহ্ম, তাঁহার প্রতিপাদক যে প্রণব, ইহার কি স্বভাবত, কি ফলত, ক্ষয় হয় না।" (গ্র, ৩৮৭)

(গ) দেবতারা মনুষ্যের ন্যায় ব্রহ্মজ্ঞানের প্রার্থী।

দেবতারা কেবল উৎপত্তি ও বিনাশের অধীন, তা নয় ; তাঁরা মনুষ্যের ন্যায় ব্রহ্মজ্ঞানের প্রার্থী এবং মুক্তির ভিখারী। এ বিষয়ে রামমোহন রায় বলেচেন (গ্র, ৭০৮) :—"যেমন আমারদিগের প্রতি ব্রহ্মজ্ঞান সাধনের

অধিকার আছে, সেইরূপ দেবতাদিগের প্রতিও অধিকার আছে। 'তদুপর্য্যপি বাদরায়ণঃ সম্ভবাৎ'—বেদান্ত সূত্রং [১।৩।২৬]—মনুষ্যের উপর এবং দেবতাদিগের উপর ব্রহ্মবিদ্যার অধিকার আছে, বাদরায়ণ কহিতেছেন; যেহেতু বৈরাগ্যের এবং মোক্ষাকাঙ্ক্ষার সম্ভাবনা যেমন মনুষ্যের আছে, সেইরূপ সম্ভাবনা দেবতাতেও হয়।"

রামমোহন আরও বল্‌চেন—মহাভারতাদি গ্রন্থে দেখা যায় যে, সকল দেবতাই ব্রহ্মের ধ্যান কর্‌তেন (গ্র, ৭০০)। ছান্দোগ্য উপনিষদে উক্ত হয়েছে যে, আঙ্গিরস বংশজাত ঘোর নামক এক ঋষি দেবকীপুত্র কৃষ্ণকে 'পুরুষ-যজ্ঞ' বিদ্যার উপদেশ করেছিলেন, এবং কৃষ্ণ ঐ বিদ্যা লাভ করে' অন্য বিদ্যায় নিঃস্পৃহ হয়েছিলেন। শ্রীমদ্‌ভাগবতেও (১০।৬৯।১৯) আছে যে, নারদ দেখ্‌লেন, কৃষ্ণ কোথাও সন্ধ্যা কর্‌চেন, কোনও স্থানে মৌন হয়ে ব্রহ্মমন্ত্র জপ কর্‌চেন, কোথাও বা প্রকৃতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যে ব্যাপক এক পরমাত্মা, তাঁর ধ্যান কর্‌চেন (গ্র, ৬৩৫-৩৬)।

(খ) পুরাণাদি অনুসারে দেবতারা কল্পিত।

কিন্তু বেদান্তসূত্র ও অপর কোনও কোনও শাস্ত্র যেমন দেবদেবীর অস্তিত্ব স্বীকার করে', তাঁদের সৃষ্ট, নশ্বর ও মানুষের ন্যায় মুক্তির প্রার্থী বলেছেন, তেমনি পুরাণাদি অনেক শাস্ত্র আবার তাঁদিগকে মনের কল্পনাও বলেছেন। ইতিপূর্ব্বে (৮৭পৃঃ) আপনারা এর প্রমাণ পেয়েছেন; যথা—"কল্পিতানি হিতার্থায় ভক্তানামল্পমেধসাং"। অন্যান্য নানা বচনেও স্পষ্ট বলা হয়েছে যে দেবতারা কল্পনা; যথা—

(১) স্মার্ত্ত-ধৃত যমদগ্নির বচন :—

"চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ।
উপাসকানাং কার্য্যার্থং ব্রহ্মণোরূপকল্পনা।
রূপস্থানাং দেবতানাং পুংস্ত্র্যংশাদিককল্পনা॥"

রামমোহন-কৃত অর্থ—"জ্ঞানস্বরূপ, অদ্বিতীয়, উপাধিশূন্য, শরীর-রহিত যে পরমেশ্বর, তাঁহার রূপের কল্পনা সাধকের [কার্য্যের] নিমিত্তে করিয়াছেন। রূপকল্পনার স্বীকার করিলে, পুরুষের অবয়ব, স্ত্রীর অবয়ব, ইত্যাদি অবয়বের সুতরাং কল্পনা করিতে হয়।" (গ্র, ১৪৬, ৪৭০, ৬৪৯, ৬৬৪)

(২) "সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা।"

অর্থ—সাধকদের হিতের জন্য ব্রহ্মের রূপ কল্পনা করা হয়েছে।

দেবতারা যদি রূপবিবর্জ্জিত ব্রহ্মের রূপকল্পনাই হলেন, তবে ত স্পষ্টই বোঝা গেল, তাঁদের সত্য অস্তিত্ব নেই।

(ঙ) দুই মতের সামঞ্জস্য।

এ বড়ই আশ্চর্য্য যে, বেদান্তসূত্র ব্রহ্মপ্রতিপাদক শাস্ত্র হয়েও দেবতাদের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন (যদিও তাঁদিগকে উপাস্য বলেন নি); আর পুরাণাদি দেবদেবীর উপাখ্যানে পূর্ণ হয়েও বলেছেন, দেবতারা মনের কল্পনা! যা হোক্, শাস্ত্রে দুই প্রকার মত থাকাতে লোকের মনে সংশয় আস্‌তে পারে। বাস্তবিক, এই সংশয় চিরদিনই আছে। দার্শনিক পণ্ডিতেরা চিরদিন দেবতাদিগকে রূপক বা কল্পনাই মনে করে' আস্‌চেন। আর, বর্ত্তমান যুগের ইংরাজী-শিক্ষিত সম্প্রদায়ও তাঁদের পৃথক্ পৃথক্ অস্তিত্বে অবিশ্বাসী। দেবপূজার সমর্থনে তাঁরা যে সকল

যুক্তি উপস্থিত করেন, তাতে তাঁদের সেই অবিশ্বাস ধরা পড়ে। শঙ্কর শাস্ত্রীর ন্যায় (৪২ ও ৫৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য) তাঁরাও অনেক সময় বলেন, দেবতারা ঈশ্বরের বিভিন্ন স্বরূপের প্রকাশক। তাঁদের অন্যান্য যুক্তিও একেশ্বরবাদের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

কিন্তু শাস্ত্রের পূর্ব্বোক্ত দুই মতের সামঞ্জস্য কি? একমাত্র সামঞ্জস্য এই হতে পারে যে, মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ গুণ ও শ্রেষ্ঠ শক্তি-সম্পন্ন জীব-সকলকে যদি 'দেবতা' নাম দেওয়া যায়, তবে তদ্রূপ দেবতার অস্তিত্ব মেনে নিতে বাধা নেই। কারণ, ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র পৃথিবীর অধিবাসী মানুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জীব অপার বিশ্বসংসারের মধ্যে কোথাও নেই, এ কথা আমরা কোন্ সাহসে বল্‌তে পারি? কিন্তু সে সকল জীব সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না; তাঁরা আমাদের উপাস্যও নন। একেশ্বরবাদী বেদান্তসূত্র এরূপ অজ্ঞাত অনির্দ্দিষ্ট দেবতাদেরই অস্তিত্ব স্বীকার করে' থাক্‌বেন। কিন্তু পুরাণাদিতে যে সকল দেবতার উপাখ্যান বর্ণিত আছে, তাঁরা কল্পিত; কেন না, পুরাণাদি স্বয়ংই সে কথা বলেছেন। আর, এক এক পুরাণ যে এক এক দেবতাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলে' প্রতিপন্ন কর্‌বার জন্য অন্য দেবতাদের দ্বারা তাঁর স্তুতি করিয়েছেন এবং নানা ঘটনার অবতারণা করে' তাঁদিগকে দুর্ব্বল ও হীনচরিত্র বলে' দেখিয়েছেন, এতেও বোঝা যায়, এ সব কাহিনী অলীক।

জগতের মূলে একের অধিক শক্তি নেই। যে শক্তি সৃষ্টি করেন, সেই শক্তিই পালন করেন ও বিনাশ করেন। সুতরাং ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, এই তিন দেবতার পৃথক্ পৃথক্ অস্তিত্বের সম্ভাবনা কি? যে শক্তি সূর্য্যের আলোক ও উত্তাপের মূলে, সেই শক্তিই অগ্নি, বায়ু, জল প্রভৃতিরও সকল ক্রিয়ার মূলে। সুতরাং সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি, ইন্দ্র, বরুণ নামে পৃথক পৃথক্ দেবতা থাকিবেন কিরূপে? যে নিয়মে মানুষের জীবন রক্ষা,

স্বাস্থ্যোন্নতি ও বিদ্যাসম্পদ লাভ হয়, সেই নিয়মেই জীবননাশ, রোগোৎপত্তি ও বিপৎপাত হয়। সুতরাং লক্ষ্মী, সরস্বতী, যম, শনি, মনসা, শীতলাদেবী ও ওলাদেবীর অস্তিত্বের যুক্তি কোথায় ?

সুতরাং আমাদের দেশে সচরাচর যে সকল দেবতার পূজা করা হয়, শাস্ত্রানুসারে ও যুক্তি অনুসারে তাঁদের অস্তিত্ব নেই। তবে, সুদূর গ্রহতারায় মানুষের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নানা প্রকার জীব থাক্‌তে পারেন ; কিন্তু তাঁদের সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না ; এবং তাঁরা আমাদের উপাস্যও নন।

(চ) দেবতাদের পূজা কল্পনাময়।

পূর্ব্বে বলেছি (১২০ পৃঃ) রামমোহন রায় বিচারকালে সময় সময় বেদান্ত অনুসারে দেবতাদের অস্তিত্ব স্বীকার কর্‌তেন, কিন্তু বল্‌তেন, তাঁদের পূজার অনুমতি কেবল অজ্ঞানদের জন্য। নিজের মত মুক্তভাবে প্রকাশ কর্‌বার সময় তিনি আবার দেবতাদিগকে 'কল্পনা'ও বল্‌তেন। বেদান্তগ্রন্থের ভূমিকাতে 'সকল বেদের প্রতিপাদ্য সৎস্বরূপ পরব্রহ্ম' এই কথা বুঝিয়ে, তিনি পরে বলেছিলেন (গ্র, ২)—"তবে অনেকেই **কখন পশুপক্ষীকে, কখন মৃত্তিকা পাষাণ ইত্যাদিকে উপাস্য কল্পনা করিয়া, ইহাতে মনকে কি বুদ্ধির দ্বারা বদ্ধ করেন, বোধগম্য করা যায় না।**"

বিচারকালেও রামমোহন রায় দেবতাদিগকে ও তাঁদের পূজাকে 'কল্পনা' না বলেছেন, এমন নয়। ভট্টাচার্য্য যখন বলেছিলেন, উপাসনা মাত্রই ভ্রমাত্মক জ্ঞান ; ব্রহ্মের সাক্ষাৎ উপাসনা হতেই পারে না, কেবল সাকার দেবতারই উপাসনা পরম্পরা রূপে হতে পারে (৩০—৩৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য), তখন রামমোহন ব্রহ্মোপাসনা যে সম্ভব ও কর্ত্তব্য, শাস্ত্রোক্তির

দ্বারা তা প্রমাণ করে', তৎপরে বল্লেন (গ্র, ৬৯১)—"কিন্তু ভট্টাচার্য্য ও তাঁহার অনুচরেরা যাহাকে উপাসনা কহেন, সেরূপ উপাসনা সুতরাং পরমাত্মার হইতে পারে না, যে কাল্পনিক উপাসনাতে উপাসকের কখন মনেতে কখন হস্তেতে উপাস্যকে নির্ম্মাণপূর্ব্বক সেই উপাস্যের ভোজন-শয়নাদির উদ্‌যোগ করিতে, এবং তাঁহার জন্মাদি তিথিতে ও বিবাহ-দিবসে উৎসব করিতে, এবং তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি কল্পনা করিয়া সম্মুখে নৃত্য করাইতে হয়।"

ভট্টাচার্য্য অন্যত্র তিরস্কারপূর্ব্বক বলেছিলেন—'তোমরা কেবল সচেতন পিণ্ডই মান, অচেতন পিণ্ড মান না'; অর্থাৎ, কেবল নিজ নিজ দেহকেই স্বীকার কর, দেবমূর্ত্তি অগ্রাহ্য কর। এর উত্তরে রামমোহন রসিকতা করে' বল্লেন (গ্র, ৭০০)—"উপাধি অবস্থাতে সচেতন এবং অচেতন উভয় বস্তুরই পৃথক্ পৃথক্ রূপে প্রতীতি হয়; সুতরাং উভয়কেই মানি। আর তন্মধ্যে যে বস্তু যদর্থে নিয়মিত হইয়াছে, তাহাকে তদনুরূপে ব্যবহার করি। সচেতনের মধ্যে গুরু প্রভৃতিকে মান্য করিতে হয়, ও ভৃত্যাদির দ্বারা গৃহকর্ম্ম লওয়া যায়; আর অচেতন পিণ্ডের মধ্যে ইষ্টকাদি দ্বারা গৃহাদি, পাষাণাদি দ্বারা পুত্তলিকাদি নির্ম্মাণ করা যায়। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, অনেক সচেতন পিণ্ড অচেতন পিণ্ডকে সচেতন অভিপ্রায় করিয়া, আহার, শয্যা, সুগন্ধি দ্রব্য এবং বিবাহাদি দেন।"

রামমোহন রায় মূর্ত্তিপূজাকে কেবল 'কল্পনা' নয়, কখন কখন 'খেলা'ও বলেছেন। ভট্টাচার্য্য পূর্ব্বোক্ত প্রসঙ্গে বলেছিলেন—তোমরা মাংসপিণ্ড মাত্র মান, মৃৎপাষাণাদি-নির্ম্মিত কৃত্রিম পিণ্ড মান না। এ কথার উত্তরে

রামমোহন বল্লেন (গ্র, ৬৯৯)—আমরা দুই-ই মানি; তবে "লৌকিক ব্যবহারে ঐ দুইয়ের প্রথম যে মাংসপিণ্ড, সে পশ্বাদির ভোজনে আইসে; আর দ্বিতীয় যে মৃত্তিকাপাষাণাদি পিণ্ড, সে খেলা আর অন্য অন্য আমোদের কারণ হয়।"

রামমোহন ভট্টাচার্য্যকে অন্য প্রসঙ্গে বলেছিলেন (গ্র, ৬৯৩)—"যাঁহারা সুবোধ হয়েন, তাঁহারা ঈশ্বরের উপাসনা, আর কেবল খেলা, এ দুইয়ের প্রভেদ অবশ্যই করিয়া লয়েন।"

গোস্বামী মহাশয়ের সহিত বিচারের উপসংহারেও তিনি বলেছিলেন (গ্র,৬৪৪)—"মহাশয় বিজ্ঞ এবং পণ্ডিত; অতএব, কোন্ ধর্ম্ম পরমার্থ-সাধন হয়, আর কোন্ ব্যাপার কেবল মনোরঞ্জন লৌকিক ক্রীড়া-স্বরূপ হয়, ইহা পক্ষপাত পরিত্যাগ করিয়া অবশ্য বিবেচনা করিবেন।"

(ছ) মূর্ত্তিতে 'প্রাণ-প্রতিষ্ঠা' করা কল্পনা।

মন্ত্রবিশেষ উচ্চারণ দ্বারা স্বহস্তনির্ম্মিত মূর্ত্তিকে জগতের স্রষ্টাপাতা রূপে পরিণত করবার প্রথা যাঁরা বাল্যাবধি দেখে' আস্‌চেন, তাঁদের মনে এই ব্যাপারটি বিশেষ কোনও চিন্তার উদ্রেক করে না। কিন্তু যাঁরা অনভ্যস্ত ও নির্লিপ্ত, অথবা যাঁরা বাল্যসংস্কারের প্রভাব অতিক্রম করেছেন, তাঁদের কাছে উহা বড়ই অদ্ভুত মনে হয়। রামমোহন রায় শঙ্কর শাস্ত্রীর সহিত বিচারে বলেছিলেন (W.'94)—মূর্ত্তিপূজকদের অদ্ভুত বিশ্বাস এই যে, মন্ত্র উচ্চারণের দ্বারা স্বহস্তনির্ম্মিত মূর্ত্তিসকলকে বিশ্বের নির্ম্মাতারূপে পরিণত করা যায়।

'প্রাণ-প্রতিষ্ঠা'র মন্ত্রটির মধ্যে কি এমন কোনও আশ্চর্য্য শক্তি আছে যদ্দারা জড়ীয় মূর্ত্তি সচেতন হয়ে উঠ্‌তে পারে? আছে কি না আপনারা

নিজেই বিচার করুন। মন্ত্রটি ত এই—"ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ ; ইহ তিষ্ঠ, ইহ তিষ্ঠ ; মম পূজাং গৃহাণ ; অত্রাধিষ্ঠানং কুরু কুরু।" ইহার ভাষা এত সরল যে, স্কুলের বালকও বুঝ্‌তে পারে—'এখানে এস, এখানে এস ; এখানে থাক, এখানে থাক ; আমার পূজা গ্রহণ কর ; এখানে অধিষ্ঠান কর, কর'। পূজারম্ভে এই মন্ত্রের উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে হস্তদ্বয়ের দ্বারা আহ্বান ও অভ্যর্থনার ভাব প্রকাশ করা হয় ; এবং ধরে' নেওয়া হয় যে, আহূত দেবতা তৎক্ষণাৎ এসে মূর্ত্তিতে অধিষ্ঠিত হলেন। কথাগুলি বাংলায় বল্লে, দেবতার আগমন সম্বন্ধে বোধ হয় এতটা নিঃসংশয় হওয়া সম্ভব হত না ; কিন্তু উপাসকেরা শাস্ত্রবিহিত সংস্কৃত মন্ত্রের গাম্ভীর্য্যে ও অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাস করেন [১৩(ম) দ্রষ্টব্য]।

এই 'প্রাণ-প্রতিষ্ঠা'র ভ্রান্তিকে লক্ষ্য করে' রামমোহন রায় একটি সঙ্গীত রচনা করেছিলেন (গ্র, ৪৯৭)। তা এই—

"মন, এ কি ভ্রান্তি তোমার !
আবাহন বিসর্জ্জন বল কর কার ?
যে বিভু সর্ব্বত্র থাকে, 'ইহাগচ্ছ' বল তাকে ;
তুমি কেবা, আন কাকে, এ কি চমৎকার !
অনন্ত জগদাধারে, আসন প্রদান করে,
'ইহ তিষ্ঠ' বল তারে ; এ কি অবিচার !
এ কি দেখি অসম্ভব ! বিবিধ নৈবেদ্য সব
তারে দিয়া কর স্তব, এ বিশ্ব যাহার !" *

* মূর্ত্তিপূজার ভ্রম উপলব্ধি করে' অনেক সাধক সময় সময় এরূপ সঙ্গীত রচনা করেছিলেন। যেমন, একজন গেয়েছিলেন—'আমার মাকে এমন সঙ্‌ সাজালে কে ?' কিন্তু তাঁরা প্রায় সকলেই সেই সঙ্গীতের সাহায্যে কেবল ভাব সম্ভোগ কর্‌তেন। রামমোহন ভাবসম্ভোগে তৃপ্ত না থেকে, সবলে ভ্রম হতে মুক্ত হয়েছিলেন।

এই কল্পনামূলক প্রাণ-প্রতিষ্ঠারই উল্লেখ করে' অনেক দেবোপাসক বলে' থাকেন—আমরা ত জড়ের পূজা করি না ; চেতনেরই পূজা করি। চেতনের পূজা করেন এই হেতুতে তাঁরা তাঁদের পূজাকে পৌত্তলিকতা বলে' স্বীকার করেন না। তাঁদের মতে কেবল জড় পুত্তলিকার পূজাই পৌত্তলিকতা। কিন্তু কেবল জড় পুত্তলিকার পূজা কোন্ দেশে কে-ই বা করে' থাকে ? সকল দেশেই যারা মূর্ত্তিপূজা করে, তারা মূর্ত্তিতে চেতনার আরোপ করে'ই করে। প্রকৃত পক্ষে সম্পূর্ণ জড়পূজক কেহই নেই। সকলেই চেতনের উদ্দেশে পূজা করে ; কিন্তু কল্পিত চেতনের উদ্দেশে। অনন্ত পরমেশ্বর ভিন্ন অন্য যে-কোনও ক্ষুদ্র চেতনের পূজা মূর্ত্তিতে বা জড় পদার্থে করাকেই 'idolatry' বা 'পৌত্তলিকতা' বলা হয়।

সে যা হোক্, জড়ীয় মূর্ত্তিতে চেতনার আরোপ বা 'প্রাণ-প্রতিষ্ঠা' করা যে কল্পনা, তা অস্বীকার কর্‌বার উপায় নেই।

(জ) সাধকেরা দেবতাদের দর্শন পান, এ কথা সত্য কি না ?

এখন প্রশ্ন এই, দেবতারা যদি কল্পিত হন, তবে অনেক সৌভাগ্যবান্ সাধক যে তাঁদের দর্শন পেয়েছিলেন শোনা যায়, সে সব বিবরণ কি মিথ্যা ? রামমোহন রায়ের মতে, অবশ্যই মিথ্যা। দেবতারাই যখন কল্পনা, তখন তাঁদের দর্শন পাওয়াও কল্পনা। দেবতাদের দর্শন পাওয়ার সকল বিবরণের মূল হচ্চে পুরাণাদি। পুরাণাদি-বর্ণিত উপাখ্যানসমূহের অনুকরণে পরেও অনেক উপাখ্যান রচিত হয়েছে। কিন্তু পুরাণাদি স্বয়ংই যখন বল্‌চেন যে, দেবোপাখ্যানসকল অজ্ঞ লোকদের হিতের নিমিত্ত 'কল্পিত', তখন আর দেবতাদের দর্শন পাওয়া কিরূপে সম্ভব হতে পারে ?

তবে, যাঁরা দেবতাতে বিশ্বাস করেন, তাঁরা দীর্ঘকাল কোনও দেবমূর্ত্তি চিন্তা কর্‌লে স্বপ্নে বা জাগ্রৎ-স্বপ্নে সেই মূর্ত্তির দর্শন পেতে পারেন, এতে কিছুই আশ্চর্য্য নেই। বৈষ্ণবেরা কৃষ্ণমূর্ত্তির দর্শন পান; শাক্তেরা দুর্গামূর্ত্তির বা কালীমূর্ত্তির দর্শন পান; খ্রীষ্টভক্তেরা যিশু খ্রীষ্টের দর্শন পান। কিন্তু এরূপ কখনও শোনা যায় না যে, এক দেবতার উপাসক অন্য দেবতার দর্শন পেয়েছেন।

যাঁরা এরূপ দর্শন পান, তাঁরা অনেক সময় যথাযথভাবে সেই দর্শনের বিবরণ বর্ণনা কর্‌তে পারেন না। সূক্ষ্ম বিষয়ের বর্ণনায় নানা স্থূল পদার্থের তুলনা বা রূপক ভাষা এসে পড়ে। তখন লোকে সাধারণতঃ তার স্থূল দিক্‌টাই গ্রহণ করে ও প্রচার করে। তাতে ঘটনাটি বিকৃত আকার ধারণ করে। দ্রষ্টার নিজের বর্ণনা অল্পই পাওয়া যায়। সুতরাং এ সকল শোনা কাহিনী দ্বারা দেবতাদের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় না।

অনেক আধুনিক কাহিনী স্বার্থপর পুরোহিত ও পাণ্ডাদের রচিত হওয়াও অসম্ভব নয়। (এ বিষয়ে রামমোহনের উক্তি পরপৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)।

১২। মূর্ত্তিপূজা দীর্ঘকাল প্রচলিত থাকিবার কারণ।

(ক) প্রথম তিন কারণ।

এক্ষণে স্বভাবতঃ এই প্রশ্ন উপস্থিত হচ্চে যে, এমন যে কল্পনাময় পূজা, তা দীর্ঘকাল সমাজে প্রচলিত থাক্‌বার কারণ কি? মূলে কিছু সত্য না থাক্‌লে কি কোনও প্রথা জনসমাজে অধিক কাল স্থায়ী হয়?

রামমোহন রায় বিভিন্ন প্রসঙ্গে এর পাঁচটি কারণ ইঙ্গিত করেছেন। বেদান্ত-স্থত্রের ভূমিকায় (গ্র, ২) তিনি বলেছেন—"লোকেতে বেদান্তশাস্ত্রের অপ্রাচুর্য্য নিমিত্ত, স্বার্থপর পণ্ডিতসকলের বাক্যপ্রবন্ধে এবং পূর্ব্বশিক্ষা ও সংস্কারের বলেতে, অনেক অনেক স্থবোধ লোক এই কল্পনাতে মগ্ন আছেন।" এই উক্তিতে তিনটি কারণ পাওয়া গেল:—(১) দেশে ব্রহ্মপ্রতিপাদক শাস্ত্রের প্রচার অল্প; (২) স্বার্থপর পুরোহিতেরা পুষ্পিত বাক্য দ্বারা (৯০ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত ভগবদ্‌গীতার বচনগুলি দ্রষ্টব্য) সাকারোপাসনা প্রচার করেন; (৩) বাল্যাবধি মূর্ত্তিপূজা দেখে' ও সে সম্বন্ধে শিক্ষা পেয়ে অন্তঃকরণে যে সংস্কার বদ্ধমূল হয়, তাই আজীবন বর্ত্তমান থাকে।

উক্ত তিন কারণের মধ্যে পুরোহিতদের স্বার্থপরতা সম্বন্ধে অনেক কথা রামমোহন রায় দুঃখের সহিত উল্লেখ করেছেন। তীর্থস্থানের পাণ্ডাগণ কিরূপে মূর্ত্তিপূজাকে প্রতিষ্ঠিত রাখেন—সে বিষয়ে রামমোহন ইংরাজীতে যা বলেছেন (W. 118), তার মর্ম্ম এই:—মূর্ত্তিপূজার প্রচারকারীরা দেবতাদের কল্পিত ঐশ্বরিক শক্তি সম্বন্ধে নানা উপাখ্যান বর্ণনা করে' লোকের মনে অনুরাগ উদ্দীপন কর্‌বার চেষ্টা করেন। বিশেষতঃ, তাঁরা ঐরূপে তীর্থযাত্রীদের অনুরাগ এমন ভাবে বর্দ্ধিত করেন যে, উক্ত যাত্রীগণ অন্ধবিশ্বাসের বশবর্ত্তী হয়ে দেবতাদের তুষ্ট কর্‌বার জন্য রাশি রাশি অর্থ দান করে, এবং কখন কখন নিজেদের জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করে।

শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা মূর্ত্তিপূজার প্রচারকল্পে কি করেন, সে বিষয়ে রামমোহন রায় বলেছেন (গ্র, ১৫১)—"পণ্ডিতসকল যাঁহারা শাস্ত্রার্থের প্রেরক হইয়াছেন, তাঁহাদের অনেকেই বিশেষ

মতে আত্মনিষ্ঠ [অর্থাৎ পরমেশ্বরের উপাসক] হওয়াকে প্রধান ধর্ম্ম করিয়া জানিয়া থাকেন। কিন্তু সাকার উপাসনায় যথেষ্ট নৈমিত্তিক কর্ম্ম এবং ব্রত যাত্রা মহোৎসব আছে; সুতরাং ইহার বৃদ্ধিতে লাভের বৃদ্ধি। অতএব, তাঁহারা কেহ কেহ সাকার উপাসনার প্রেরণ সর্ব্বদা বাহুল্য মতে করিয়া আসিতেছেন।"

ভট্টাচার্য্য, কি কারণে জানি না, রামমোহন ও তাঁর সঙ্গীদের 'স্বার্থপর' বলেছিলেন। তদুত্তরে রামমোহন বল্লেন (গ্র, ৭১৫)— "এক ব্যক্তি লোকের যাবৎ শাস্ত্র গোপন করিয়া লোককে শিক্ষা দেয় যে—'যাহা আমি বলি, এই শাস্ত্র; ইহাই নিশ্চয় কর। তোমার বুদ্ধিকে এবং বিবেচনাকে দূরে রাখ। আমাকে ঈশ্বর করিয়া জান। আমার তুষ্টির জন্যে সর্ব্বস্ব দিতে পার, ভালই; নিদান তোমার ধনের অর্দ্ধেক আমাকে দেও। আমি তুষ্ট হইলে সকল পাপ হইতে তুমি মুক্ত এবং স্বর্গ প্রাপ্ত হইবে।' আর এক জন শাস্ত্র, এবং লোকের বোধের নিমিত্ত যথাসাধ্য তাহার ভাষা বিবরণ করিয়া, লোকের সম্মুখে রাখে, এবং নিবেদন করে যে—'আপনার অনুভবের দ্বারা এবং বেদসম্মত যুক্তির দ্বারা ইহাকে বুঝ; আর যাহা ইহাতে প্রতিপন্ন হয়, তাহা যথাসাধ্য অনুষ্ঠান কর। আর অন্তঃকরণের সহিত ঈশ্বরকে ভয় এবং সম্মান কর।' এ দুইয়ের মধ্যে কোন ব্যক্তি স্বার্থপর বুঝায়?"

মূর্ত্তিপূজার বহু-বিস্তৃত প্রথাকে রামমোহন রায় এক স্থলে (W. 108) পুরোহিতদের লাভজনক জমিদারী ('fertile estate') বলেছিলেন।

তিনি তাঁদের এই সুনিয়ন্ত্রিত স্বার্থপরতাকে 'প্রতারণা' পর্য্যন্ত বলতে কুণ্ঠিত হন নি। পূর্ব্বে (৬ পৃঃ) উল্লেখ করেছি যে, ভট্টাচার্য্য প্রশ্ন করেছিলেন—অন্যে নিজ ব্যয়ে ও নিজ পরিশ্রমে মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করে' পূজা করে; তাতে তোমরা কেন মর্ম্মান্তিক ব্যথা পাও? এর ইংরাজী উত্তরে রামমোহন কি বলেছিলেন তাও বলেছি। তদ্ভিন্ন, বাংলা উত্তরে বলেছিলেন (গ্র, ৭০১)—"যে ব্যক্তি কেবল স্বার্থপর না হয়, সে অন্য ব্যক্তিকে দুঃখি অথবা প্রতারণাগ্রস্ত দেখিলে অবশ্যই মর্ম্মান্তিক ব্যথা পায়; এবং ঐ দুঃখ ও প্রতারণা হইতে মুক্ত করিবার চেষ্টা করে। কিন্তু যাহার প্রতারণার উপরে কেবল জীবিকা এবং সম্মান, সে অবশ্যই প্রতারণার যে ভঞ্জক তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিবেক।"

'স্বার্থপরতা' ও 'প্রতারণা' বিষয়ে বক্তব্য এই যে,' যে সকল পুরোহিত মূর্ত্তিপূজাতে আপনি বিশ্বাস করেন, তাঁরা যদি ধর্ম্মবুদ্ধির উদ্দেশ্যে অপরকে এ বিষয়ে প্রেরণা দেন, তা হলে তাঁদের স্বার্থপর বা প্রতারক বলা যায় না। কারণ, অন্তরে দুরভিসন্ধি না থাকলে মানুষ দোষী হয় না। যখন কোনও অসত্য বা অন্যায় প্রথা দীর্ঘকাল সমাজে চলতে থাকে, তখন তৎসংসৃষ্ট প্রত্যেক ব্যক্তি তাকে অসত্য বা অন্যায় বলে' বুঝতে পারে না। যতক্ষণ না বোঝে, ততক্ষণ এক হিসাবে তার কোনও দোষ হয় না। কিন্তু, অপর দিকে এ কথাও বিবেচ্য যে, বুঝতে পারুক বা না পারুক, ঐ প্রথার স্থায়িত্বের জন্য প্রত্যেকেই দায়ী এবং উহার অনিষ্ট-ফলের জন্য প্রত্যেকেই অংশতঃ অপরাধী। এ জন্য সংস্কারকেরা প্রত্যেককে তার অপরাধ তীব্র ভাষায় বুঝিয়ে দেন, যেন সে অপর সকলের জন্য অপেক্ষা না করে', স্বয়ং অবিলম্বে সেই অসত্য বা

অন্যায় কার্য্য পরিত্যাগ করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখুন, আমেরিকার যুক্তরাজ্যে দাসত্ব-প্রথা প্রচলিত থাকাতে যে সব ব্যবসায়ীর প্রচুর অর্থাগম হত, তাঁরা সেই প্রথার ঘোর নিষ্ঠুরতা ও অশেষ অনিষ্টকারিতা উপলব্ধি কর্‌তে পার্‌তেন না; কারণ, স্বার্থসংশ্রব লোকের হৃদয়কে কঠিন ও বিবেককে ম্লান করে' রাখে। কতিপয় মহাপ্রাণ ব্যক্তি যখন গ্রন্থে, পত্রিকায় ও বক্তৃতাদিতে উক্ত প্রথার দোষসকল বুঝিয়ে দিতে লাগ্‌লেন, এবং বল্লেন যে, স্বার্থচিন্তাই ব্যবসায়ীদের মনকে অন্ধ করে' রেখেছে, তখন ক্রমে তাঁদের চৈতন্যোদয় হতে লাগ্‌ল। রামমোহন রায়ও আমাদের চৈতন্যোদয়ের জন্যই পূর্ব্বোক্ত কঠিন বাক্যসকল ব্যবহার করেছিলেন, সন্দেহ নেই।

তীর্থস্থানের পাণ্ডারা কিরূপে সাকারোপাসনার মাহাত্ম্য প্রচার করে' লোকের অর্থ শোষণ করেন, এ সম্বন্ধে রামমোহন রায়ের উক্তির মর্ম্ম পূর্ব্বে (১৩৩ পৃঃ) উদ্ধৃত করেছি। বর্ত্তমানে আর এক শ্রেণীর পাণ্ডার উদ্ভব হয়েছে। রামমোহন রায় নানা বিষয়ে ভবিষ্যদ্দর্শী হয়েও, তখন স্বপ্নেও কল্পনা কর্‌তে পারেন নি যে, শত বৎসর পরে এই হতভাগ্য দেশে মূর্ত্তিপূজা বিস্তারের সহায়তার জন্য নূতন এক শ্রেণীর পাণ্ডার আবির্ভাব হবে। এই নূতন পাণ্ডারাও তীর্থস্থানের ও দেবতাদের এবং পুণ্যতিথি-সকলের মাহাত্ম্য বর্ণনা করে' লোককে তীর্থযাত্রায় প্রলুব্ধ কর্‌তে আরম্ভ করেছে। তারা কে জানেন? তারা হল রেল ও জাহাজ-কোম্পানী সকলের খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী অধ্যক্ষগণ! তারা কাশীধাম, জগন্নাথ-ক্ষেত্র, মথুরা, বৃন্দাবন প্রভৃতি তীর্থস্থানের নানাবর্ণরঞ্জিত বৃহৎ বৃহৎ চিত্র, এবং রথযাত্রা, শিবরাত্রি, সূর্য্যগ্রহণ, অর্দ্ধোদয় প্রভৃতি 'শুভদিনের' বড় বড় অক্ষরে মুদ্রিত বিজ্ঞাপন ষ্টেশনসকলের প্রাচীরে লাগায়, এবং তীর্থস্থানসমূহের ও দেবমন্দিরসমূহের নানাপ্রকার চিত্তাকর্ষক বর্ণনা

রেলওয়ে গাইড্ বুকে মুদ্রিত করে' অল্পমূল্যে বিক্রয় করে। ধন্য রে স্বার্থবুদ্ধি! তোর প্ররোচনায় লোকে কি না করতে পারে! আপনি মূর্ত্তিপূজায় বিশ্বাসী না হয়েও, অজ্ঞান নরনারীকে তীর্থে তীর্থে ঘুরিয়ে তাদের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করবার জন্য নানা কৌশলজাল বিস্তার করতে কুণ্ঠিত হয় না! রামমোহন! আজ তুমি কোথায়? তুমি ত এদের সম্বন্ধে একটি কথাও বলে' যাও নি! কে এদের স্বার্থান্ধ চিত্তে ধর্ম্মবুদ্ধি জাগ্রত করে' দেবে?

(খ) চতুর্থ ও পঞ্চম কারণ।

পূর্ব্বোক্ত তিন কারণ ভিন্ন, সাকার উপাসনা দেশে প্রচলিত থাকবার আরও দুটি কারণ রামমোহন রায় দিয়েছিলেন। পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহ কেহ ব্রহ্মোপাসনাকে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম জেনেও লাভের জন্য "সাকার উপাসনার প্রেরণ সর্ব্বদা বাহুল্য মতে করিয়া আসিতেছেন" (১৩৪ পৃঃ), এই কথার সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলেছিলেন (ঐ, ১৫১—৫২)—"এবং যাঁহারা প্রেরিত, অর্থাৎ শূদ্রাদি এবং বিষয়কর্ম্মান্বিত ব্রাহ্মণ, তাঁহাদের মনের রঞ্জনা সাকার উপাসনায় হয়, অর্থাৎ আপনার উপমায় ঈশ্বর, আর আত্মবৎ সেবার বিধি পাইলে, ইহা হইতে অধিক কি তাঁহাদের আহ্লাদ হইতে পারে? আর, ব্রহ্মোপাসনাতে কার্য্য দেখিয়া কারণে বিশ্বাস করা, এবং নানাপ্রকার নিয়ম দেখিয়া নিয়মকর্ত্তাকে নিশ্চয় করিতে হয়। তাহা মন এবং বুদ্ধির চালনের অপেক্ষা রাখে; সুতরাং তাহাতে কিঞ্চিৎ শ্রম বোধ হয়। অতএব, প্রেরকেরা আপন

লাভের কারণ এবং প্রেরিতেরা আপনাদের মনোরঞ্জনের নিমিত্ত এইরূপ নানাপ্রকার উপাসনার বাহুল্য করিয়াছেন।"

এখানে চতুর্থ ও পঞ্চম কারণ পাওয়া গেল:—(৪) সাকার-উপাসনায় জনসাধারণের মনোরঞ্জন হয়; আর, (৫) তাতে ব্রহ্মোপাসনা অপেক্ষা মনবুদ্ধির চালনা অল্প আবশ্যক হয়। দেবতাতে মানবিক ভাবের আরোপ, আপনার তুলনায় দেবমূর্ত্তিকে আহার-পান করান, ইত্যাদি যে সাধারণের মনকে মুগ্ধ করে' রাখে (১০৮—১২ পৃঃ) তাতে আর সন্দেহ কি? এক বার এ সকলে অভ্যস্ত হ'য়ে গেলে, বিশেষ চিন্তা ও মানসিক বল ভিন্ন তা হ'তে মুক্তি লাভ করা যায় না। আর, সাকার-উপাসনায় যে মনবুদ্ধির চালনা অল্প আবশ্যক হয়, তাতেও সন্দেহ নেই। এই কারণেই উহা অজ্ঞ জনসাধারণের অধিক প্রিয় হয়।

(গ) ষষ্ঠ ও সপ্তম কারণ।

মূর্ত্তিপূজা দীর্ঘকাল যাবৎ প্রচলিত থাক্‌বার যে পাঁচটি কারণ রামমোহন রায় ইঙ্গিত করেছেন তার উল্লেখ করা হল। তদ্ভিন্ন আরও দুটি কারণ নির্দ্দেশ করা যেতে পারে।

ষষ্ঠ কারণ—জনসাধারণের অজ্ঞানতা। রামমোহন রায় ত একটি কারণ দিয়েছেন—"স্বার্থপর পণ্ডিতসকলের বাক্যপ্রবন্ধ"; কিন্তু তাঁদের "বাক্যপ্রবন্ধ" কার্য্যকর হয় কেন? জনসাধারণের অজ্ঞানতাই কি তার কারণ নয়? অজ্ঞানতাই 'বিশ্বাসপ্রবণতা' ও 'কুসংস্কার' নামক দুই ভাইভগিনীর জননী—"Ignorance is the mother of credulity and superstition". দ্বিতীয়তঃ, সাকারোপাসনায় যে 'মনোরঞ্জন' হয়, তা কাদের অধিক হয়? অজ্ঞান লোকেরাই দেবতাতে মানবীয় ভাবের আরোপ দেখে' অধিক মুগ্ধ হয়, এবং তাদেরই অসার আমোদ-

প্রমোদে জীবন ক্ষয় কর্‌তে বেশী ভালবাসে। তৃতীয়তঃ, সত্য ঈশ্বরের অনুসন্ধানে মনবুদ্ধির চালনা কর্‌তে অধিক অনিচ্ছুক কারা? অজ্ঞান ও ধর্ম্মে উদাসীন ব্যক্তিরা। সুতরাং রামমোহন রায় যে কয়টি কারণ দিয়েছেন, তার অধিকাংশের মূলে সহায়রূপে বর্ত্তমান—জনসাধারণের অজ্ঞানতা। 'মূর্ত্তিপূজা নিম্নাধিকারীর জন্য', শাস্ত্রের এই উক্তিতেও প্রকারান্তরে বলা হয়েছে যে, অজ্ঞান নিম্নাধিকারীরাই মূর্ত্তিপূজার আশ্রয়দাতা ও প্রতিপালক। অতএব, এই প্রথা যখন একবার দেশময় প্রচারিত হয়ে গিয়েছে; তখন উহাকে সমূলে অপসারিত করা অশেষ যত্নসাপেক্ষ। যত দিন জনসাধারণের মধ্যে সুশিক্ষার প্রভূত বিস্তার না হয়েছে, *এবং তৎসঙ্গে ঈশ্বরবিষয়ক জ্ঞানের বহুল প্রচার না হয়েছে, তত দিন এ দেশ হতে মূর্ত্তিপূজার উচ্ছেদ নেই। 'সুশিক্ষা' বল্‌চি এই জন্য যে, যে শিক্ষায় চিন্তার স্বাধীনতা জন্মে না, মনের মুক্তি হয় না, যে শিক্ষায় চরিত্রের উন্নতি হয় না, সৎসাহস জাগে না, যে শিক্ষায় ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষার উদয় হয় না, ঈশ্বরানুরাগ বর্দ্ধিত হয় না, তার দ্বারা মূর্ত্তিপূজা অপসারিত হবার সম্ভাবনা অল্প।

সপ্তম কারণ—মোক্ষাকাঙ্ক্ষার অভাব। মোক্ষাকাঙ্ক্ষা না থাক্‌লে ধর্ম্মবিষয়ে সত্যাসত্য নির্ণয়ের জন্য আগ্রহই জন্মে না। এমন লক্ষ লক্ষ লোক আছেন, যাঁরা অজ্ঞান নন, ইচ্ছা কর্‌লে সত্যাসত্য নির্ণয় কর্‌তে পারেন। কিন্তু তাঁরা ধর্ম্মবিষয়ে 'মাথা ঘামাবার' কোনও প্রয়োজন বোধ করেন না। আজকাল স্কুল-কলেজের অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি অপর সকল বিষয়ে বিচারক্ষম হয়েও ধর্ম্মবিষয়ে বুদ্ধিশক্তির প্রয়োগ করেন না; কারণ, ধর্ম্ম তাঁদের কাছে একটা অনাবশ্যক বিষয়। পরিজনবর্গ যে কোনও প্রকার ধর্ম্মানুষ্ঠান নিয়ে থাক্, তাঁরা সে সম্বন্ধে উদাসীন। নিজেরাও যখন যেমন সুবিধা সেই ভাবে ধর্ম্মের বাহ্যক্রিয়া-

সকল করেন। বিশ্বাস থাক্ বা না থাক্, সমাজের প্রচলিত রীতি মান্য করে' বিবাহ-শ্রাদ্ধাদি ধর্ম্মানুষ্ঠান সম্পন্ন করতে তাঁরা কুণ্ঠিত নন। তাঁদের মতে এ সব ব্যাপারে কোনও নৈতিক প্রশ্ন নেই। এরূপ লোকেরাই আবার অনেক সময় আপনাদের ধর্ম্মহীনতা ও মানসিক দুর্ব্বলতাকে ঢাকবার জন্য প্রচলিত প্রথার সমর্থনে বক্তৃতামঞ্চে দণ্ডায়মান হন; নিজেদের যাতে আন্তরিক আস্থা নেই, তাও উচ্চকণ্ঠে প্রচার করেন! অনেকে আবার জাতীয়তা রক্ষার ভাণ করে' সর্ব্বপ্রকার কুসংস্কারের সমর্থন করেন। মোক্ষাকাঙ্ক্ষার অভাবই এ সকলের কারণ। অতএব, যত দিন মোক্ষাকাঙ্ক্ষা বর্দ্ধিত না হয়, ততদিন মূর্ত্তিপূজা ও তৎসংসৃষ্ট অন্যান্য কুসংস্কার দূর হওয়া কঠিন।

১৩। দেবপূজা ও ব্রহ্মোপাসনার সাধন-পদ্ধতি পরস্পরের বিপরীত।

(ক) অপরিচ্ছিন্নকে পরিচ্ছিন্ন কল্পনা করা দেবপূজার ভিত্তি।

পূর্ব্বে (১০৫—৭ পৃঃ) বলা হয়েছে, ঐশ্বরিক ও মানবিক উভয় ভাবের মিশ্রণে দেবতাদের সৃষ্টি। এক্ষণে দেখা যাক্, মানবিক ভাব আরোপের ফলে দেবপূজার সাধন-পদ্ধতি ব্রহ্মোপাসনার সাধন-পদ্ধতি হতে কেমন সর্ব্বপ্রকারে বিপরীত হয়েছে।

পরমেশ্বর অপরিচ্ছিন্ন; তাঁকে পরিচ্ছিন্ন কল্পনা না কর্‌লে দেবতা হয় না। সুতরাং অপরিচ্ছিন্নকে পরিচ্ছিন্ন কল্পনা করাই দেবপূজার ভিত্তি। এরূপ কল্পনাতে সত্যের অপলাপ হয় এবং ঈশ্বরলাভে বিঘ্ন ঘটে। যিনি সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্, অভাবরহিত, তাঁকে স্থানে কালে আবদ্ধ, অল্পজ্ঞান, অল্পশক্তি ও অভাবগ্রস্ত বলে' পুনঃপুনঃ ভাবাতে ও বলাতে অধ্যাত্মরাজ্যে অগ্রসর হওয়া কঠিন, এমন কি অসম্ভব, হয়ে পড়ে (১০৭—৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। দেবপূজায় এই বিঘ্ন অবশ্যম্ভাবী। পক্ষান্তরে, ব্রহ্মোপাসনায় তাঁকে যথার্থরূপে ভাব্‌তে হয়; সুতরাং তা ধর্ম্মোন্নতির সহায়। এ বিষয়ে দেবপূজা ও ব্রহ্মোপাসনা পরস্পরের বিপরীত। উত্তরাভিমুখে যাবার সঙ্কল্প করে', যে ব্যক্তি বারংবার দক্ষিণে পদক্ষেপ করে, তার পক্ষে গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হওয়া যেমন অসম্ভব, দেবপূজা দ্বারা ব্রহ্মলাভও তেমনি অসম্ভব। কোনও কোনও প্রতিভাশালী সাধক যে দেবপূজার মধ্য দিয়ে গিয়েও ব্রহ্মজ্ঞানে পৌঁছেচেন দেখা যায়, তার কারণ পূর্ব্বে (১০৮ পৃঃ) বলা হয়েছে।

এতদ্ভিন্ন, আর কোন্ কোন্ বিষয়ে দেবপূজা ব্রহ্মোপাসনার বিপরীত, তা একে একে বল্‌চি।

(খ) দ্রব্যাদি দান দেবপূজার প্রথম অঙ্গ।

প্রথমতঃ, পাদ্য-অর্ঘ্য, আচমনীয়-স্নানীয়, গন্ধ-পুষ্প, ধূপ-দীপ, নৈবেদ্য ইত্যাদি দান করা দেবপূজার মুখ্য অঙ্গ। ঘৃতাদি আহুতি দিয়ে, পশ্বাদি বলি দিয়ে, যে বস্তু যে দেবতার প্রিয় তাঁকে তাই দান করে' তুষ্ট করা দেবোপাসকের প্রধান লক্ষ্য হয়। এটিও অবশ্যম্ভাবী; কারণ, দেবতারা মানব-ভাবাপন্ন ও অভাবগ্রস্ত।

ব্রহ্মের কোনও অভাব নেই; তিনি মানুষের কাছে নিজের জন্য কিছু চান না। রামমোহন রায় বল্‌চেন (গ্র, ৫২৬)—"ধনাদি যে তাঁহার সামগ্রী, সুতরাং তাহার আকাঙ্ক্ষিত তেঁহো নহেন"। ধনাদি তিনি চান না; তিনি চান, মানুষ পরস্পর প্রীতি-সম্বন্ধে আবদ্ধ হয়ে সুখে বাস করুক্; ধনাদি যাদের আছে, তারা দীনদুঃখীর সহিত ভাগ করে' তা উপভোগ করুক্।

(গ) জীবনগঠন ব্রহ্মোপাসনার অত্যাবশ্যক সাধন।

দ্রব্যাদি দানের পরিবর্ত্তে ব্রহ্মোপাসনার আনুষঙ্গিক সাধন এই—(১) আত্মজ্ঞান উপার্জ্জনের চেষ্টা, (২) ইন্দ্রিয়দমন, (৩) অন্তঃকরণের পবিত্রতা লাভের জন্য যত্ন, (৪) সত্যকথন, (৫) লোকশ্রেয়ঃ সাধনে নিযুক্ত থাকা ইত্যাদি। রামমোহন রায় এই সকল সাধনের শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় বচনসকল পুনঃপুনঃ উদ্ধৃত করেছেন। তার কয়েকটি এই :—

(১) "যথোক্তান্যপি কর্ম্মাণি পরিহায় দ্বিজোত্তমঃ।
আত্মজ্ঞানে শমে চ স্যাদ্ বেদাভ্যাসে চ যত্নবান্॥"

মনু বল্‌চেন—পূর্ব্বোক্ত [যজ্ঞাদি] কর্ম্মসকলকে পরিত্যাগ করে'ও উত্তম ব্রাহ্মণ পরমাত্মার চিন্তনে, ইন্দ্রিয়দমনে ও বেদাভ্যাসে যত্নবান্ হবেন। (গ্র, ২৫৪, ৩৮৬ ও অন্যত্র)

(২) "যেনোপায়েন দেবেশি লোকঃ শ্রেয়ঃ সমশ্নুতে।
তদেব কার্য্যং ব্রহ্মজ্ঞৈরেষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ॥"

মহানির্ব্বাণ তন্ত্র বল্‌চেন—যে যে উপায় দ্বারা লোকের কল্যাণ লাভ হয়, তাই ব্রহ্মনিষ্ঠের কর্ত্তব্য; এইটিই সনাতন ধর্ম্ম। (গ্র, ২৩৭, ২৭৫)

(৩) "পরিনির্ম্মথ্য বাগ্‌জালং নির্ণীতমিদমেব হি।
নোপকারাৎ পরো ধর্ম্মো নাপকারাদঘং পরং॥"

অর্থ—শাস্ত্রসমূহের সকল বাগ্‌জাল বিশেষরূপে মন্থন করে' কেবল এইটিই নির্ণীত হয়েছে যে, পরোপকার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম নেই; আর, পরের অপকার অপেক্ষা অধিক পাপ নেই। (গ্র, ৫২৬)

সত্যকথন বিষয়ে রামমোহন রায় বল্‌ছেন (গ্র, ৪১৮)—"ব্রহ্মবিদ্যার **আধার সত্যকথন, ইহা পুনঃপুনঃ বেদে কহিয়াছেন। অতএব সত্যের অবলম্বন করিবেন, যাহাতে সত্য যে পরব্রহ্ম তাঁহার উপাসনায় সমর্থ হন।"**

অতএব, কিছু 'দিয়ে' উপাস্যকে তুষ্ট করা দেবোপাসকের লক্ষ্য; আর, কিছু 'হয়ে' তুষ্ট করা ব্রহ্মোপাসকের লক্ষ্য। হওয়ার প্রতি দেবোপাসকের দৃষ্টি মোটেই থাকে না, এমন বল্‌চি না; কিন্তু তাঁর পূজাপদ্ধতিতে দেওয়ারই প্রাধান্য। দেবপূজা এ বিষয়ে সাধকের দৃষ্টিকে ভ্রান্তপথে নিয়ে যায়। সুতরাং তদ্দ্বারা জীবনের যথোচিত উন্নতি হওয়ার পক্ষে ব্যাঘাত ঘটে।

(ঘ) বাহ্যিক শুচিতা ও জাতবিচার দেবপূজার দ্বিতীয় অঙ্গ।

দ্বিতীয়তঃ, দেবপূজায় দেবতাকে শুচি রাখা, তাঁকে সর্ব্বপ্রকার মলিন স্পর্শ হতে বাঁচান উপাসকের আর এক প্রধান কার্য্য হয়ে দাঁড়ায়। নারী, শূদ্র, অন্ত্যজ ও ম্লেচ্ছ, সকলেই দেবতার কাছে অস্পৃশ্য; তাদের স্পর্শ হতে তাঁকে বাঁচান চাই। আর, দেবতাকে বাঁচাতে হলে নিজেকেও বাঁচান আবশ্যক। এই ভাব হতে বাহ্যিক শুচিতার সহস্র নিয়ম-প্রণালী ও আহারাদির অসংখ্য বিধিনিষেধের সৃষ্টি হয় এবং ঐ সকলকে ধর্ম্মরাজ্যে অযথা মূল্য দেওয়া হয়।

(৬) ইহাতে চরিত্রের বিশুদ্ধতা হইতে সাধকের দৃষ্টিকে সরাইয়া লয়।

বাহ্যিক শুচিতা ও আচার-বিচারকে অতিরিক্ত মূল্য দেওয়ার ফলে নীতিপালন ও জীবনগঠনের প্রতি সাধকের মনোযোগ হ্রাস হয়ে যায়। অন্তঃকরণের শুদ্ধতাই যে 'শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ' পরমেশ্বরের প্রিয় হওয়ার জন্য সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন, দেবপূজার বিবিধ আচার-নিয়ম এই জ্ঞানটিকে আচ্ছন্ন করে' ফেলে। চরিত্রের নির্ম্মলতা ও মহত্ত্ব লাভ অপেক্ষা ঐ সকল আচার-নিয়ম পালন ধর্ম্মোন্নতির শ্রেষ্ঠ লক্ষণ বলে' গণ্য হয়। 'শুদ্ধতা', 'পবিত্রতা' প্রভৃতি শব্দের অর্থ ই হয়ে দাঁড়ায়—কল্পিত শুচিতা, উচ্ছিষ্ট জ্ঞান ও জাতবিচার—সকল মানুষের 'মলিন' স্পর্শ হতে সন্তর্পণে আপনাকে বাঁচান।

এইরূপে সমাজে নীতির যে হীনতা ঘটেছে, রামমোহন রায় গভীর দুঃখের সহিত তার বর্ণনা করেছেন। ঈশোপনিষদের ইংরাজী অনুবাদের ভূমিকায় তিনি বলেছেন (W. 73-74)—প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মে আহারবিষয়ক বিচারই প্রধান স্থান অধিকার করেছে। এ সম্পর্কে তিলমাত্র নিয়মভঙ্গ হলে, ভঙ্গকারীর চরিত্র অন্যান্য দিকে যতই পবিত্র ও নির্দ্দোষ হউক, তাকে তীব্রতম নিন্দার ভাজন হতে হয়। কেবল তা নয়, তাকে আপন পরিবার ও আত্মীয়বন্ধুদের সংসর্গ হতে বিচ্ছিন্ন হতে হয়; এক কথায়, তাকে 'জাতিচ্যুত' হতে হয়। পক্ষান্তরে, হিন্দুধর্ম্মের আহারসম্বন্ধীয় এই সর্ব্বপ্রধান বিধি সযত্নে পালন করলে, সকল প্রকার নীতিহীনতা ক্ষমার যোগ্য হয়ে যায়। নিতান্ত গর্হিত পাপসকলও এই আহারবিষয়ক নিয়ম লঙ্ঘনের তুলনায় অতি সামান্য বলে' গণ্য হয়।

রামমোহন আরও বলেছেন (W.74) যে, নরহত্যা, চুরি, মিথ্যা-সাক্ষ্য দান প্রভৃতি গুরুতর অপরাধ যদি বিচারালয়ে প্রমাণিতও হয়, তথাপি, তাতে জাতিচ্যুত হওয়া দূরে থাক্, অপরাধীকে সমাজে বিশেষ কোনো নিন্দা বা অপমানের ভাজনও হতে হয় না। 'প্রায়শ্চিত্ত' নামক কতগুলি অর্থহীন ক্রিয়া করে' ব্রাহ্মণকে কিছু দান করলেই এ সকল পাপ ক্ষয় হয়ে যায়; এবং দোষী ব্যক্তি সামাজিক সকল অসুবিধা হতেও রক্ষা পায়, আর তার পরলোকেও শাস্তি পাবার কোনো আশঙ্কা থাকে না।

(চ) পৌত্তলিকতা সমাজের স্বাভাবিক গঠনকে ধ্বংস করে।

রামমোহন কঠোপনিষদের ইংরাজী অনুবাদের ভূমিকায় (W. 45) পৌত্তলিকতা সম্বন্ধে বলেছেন যে, উহা এমন একটি প্রথা, যা সমাজের স্বাভাবিক গঠনকে সমূলে ধ্বংস করে। আর, উহা এমন সকল গুরুতর পাপকার্য্যের বিধি দেয়, যে সব কার্য্য নিতান্ত অসভ্যজাতীয় লোকেরাও, বিশেষ প্রয়োজনে বাধ্য না হলে, করতে লজ্জা অনুভব করে।

বেদান্তসারের ইংরাজী অনুবাদের ভূমিকাতেও (W. 5) তিনি বলেছেন—হিন্দু পৌত্তলিকতা অন্যান্য দেশের পৌত্তলিকতা অপেক্ষা সমধিকরূপে সমাজের গঠনকে ধ্বংস করে।

(ছ) প্রাচীন গ্রীস ও রোমের পৌত্তলিকতা অপেক্ষা হিন্দু পৌত্তলিকতা অধিক অনিষ্টকর।

হিন্দু পৌত্তলিকতা অন্যান্য দেশের পৌত্তলিকতা অপেক্ষা অধিক অনিষ্টকর হল কিসে?—এই প্রশ্নের উত্তর রামমোহন রায় ভট্টাচার্য্যের

সহিত বিচারে দিয়েছিলেন। ভট্টাচার্য্য তাঁর প্রতিবাদ-পুস্তিকায় প্রাচীন গ্রীসের পৌত্তলিকতার উল্লেখ করেছিলেন। সেই প্রসঙ্গে রামমোহন বলেছিলেন্ (W. 119)—যদিও গ্রীক্ ও রোমান্‌দের পৌত্তলিকতা বর্ত্তমান হিন্দুজাতির পৌত্তলিকতার ন্যায়ই অপবিত্র, যুক্তিহীন ও বালকোচিত ছিল, তথাপি সেগুলি কখনও জীবনের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের এমন বিরোধী বা সমাজের স্বাভাবিক গঠনের এমন ধ্বংসকারী ছিল না। বর্ত্তমান হিন্দু পৌত্তলিকতা আহারসম্বন্ধীয় নানাপ্রকার বিধিনিষেধের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকাতে, তার দুর্ভাগ্য আশ্রিতদিগকে সমগ্র পৃথিবীর লোকদের থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে, এবং পরস্পর হতেও পৃথক্ রেখেছে। তাতে তাদের অনবরত নানাপ্রকার অসুবিধায় ও ক্লেশে পড়্‌তে হচ্চে।

এখানে রামমোহন স্পষ্টভাবে বল্লেন যে, জাতিভেদ হিন্দু পৌত্তলিকতার বিশেষত্ব; এবং জাতিভেদের জন্যই হিন্দু পৌত্তলিকতা জগতের অপর সকল দেশের পৌত্তলিকতা অপেক্ষা অধিক অনিষ্টকর।

(জ) পৌত্তলিকতা ও জাতিভেদ পরস্পর সংযুক্ত ও পরস্পরের সহকারী।

রামমোহন জাতিভেদকে পৌত্তলিকতার সহিত অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত দেখ্‌তেন। তিনি যে আহারসম্বন্ধীয় বিধিনিষেধকে পৌত্তলিকতার অন্তর্ভুক্ত বলে' গণ্য কর্‌তেন, তার প্রমাণ পূর্ব্বোদ্ধৃত উক্তিসকলের মধ্যে পাওয়া গেল। বস্তুতঃ, হিন্দুগণের নিকট জাতিভেদ একটি মনুষ্যরচিত সামাজিক প্রথা মাত্র নয়। প্রত্যেক খাঁটি হিন্দু বিশ্বাস করেন যে, স্বয়ং ঈশ্বর পৃথক্ পৃথক্ জাতি সৃষ্টি করেছেন; এবং তিনিই তাদের পরস্পর হতে পৃথক্ থাক্‌বার নিয়মসকল প্রবর্ত্তন

করেছেন। সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার মুখ হতে ব্রাহ্মণ, বাহুদ্বয় হতে ক্ষত্রিয়, উরুদ্বয় হতে বৈশ্য ও পদযুগল হতে শূদ্র উৎপন্ন হয়েছে। প্রত্যেক জাতির সুনির্দ্দিষ্ট পৃথক্ পৃথক্ অধিকার ও পৃথক্ পৃথক্ কর্ত্তব্য আছে; তৎসম্পর্কীয় শাস্ত্রবিধি বা চিরাগত প্রথা যদি কেহ লঙ্ঘন করে, তবে তার সেই অপরাধ কেবল সামাজিক অপরাধ বলে' গণ্য হয় না; সে ধর্ম্মে 'পতিত' হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, ব্রাহ্মণকুলে জাত কোনো ব্যক্তির পক্ষে অন্য জাতির অন্ন ভক্ষণ করা, অন্য জাতীয়া কন্যা বিবাহ করা বা উপবীত পরিত্যাগ করা, ধর্ম্মসম্বন্ধীয় অপরাধ। এতে তাঁর 'জাতি যায়', 'ধর্ম্ম যায়'। 'জাতি যাওয়া' ও 'ধর্ম্ম যাওয়া' একার্থবাচক শব্দ। সেই জাতিভ্রষ্ট ব্রাহ্মণ আর দেবপূজার অধিকারী থাকেন না। ফলতঃ, বিশ্বাসী হিন্দুগণ 'জাতি যাওয়া'কে বা 'জাত দেওয়া'কে যেরূপ ধর্ম্মনাশকর মহা অপরাধ মনে করেন, সেরূপ আর কিছুকেই মনে করেন না। জাতিভ্রষ্ট ব্যক্তি পিতৃমাতৃকুল হতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়; সে আর পিতৃপুরুষদের শ্রাদ্ধতর্পণাদিরও অধিকারী থাকে না। দেবগণ পিতৃগণ, সকলেই তাকে পরিত্যাগ করেন। অতএব, জাতিভেদ প্রচলিত ধর্ম্মবিশ্বাসের সহিত এমন ভাবে যুক্ত যে, দুইকে পৃথক্ করে' দেখা সম্ভব নয়।

আরও দেখুন, যে ব্রাহ্মণগণ সাকার উপাসনার বিচিত্র পদ্ধতিসমূহের প্রবর্ত্তক ও প্রচারক, তাঁরাই জাতিভেদেরও জটিল নিয়মসকলের রচয়িতা ও সংরক্ষক; পৌত্তলিকতার বিধি-ব্যবস্থায় যাঁরা যাগযজ্ঞ ও পূজা-অর্চ্চনার বিশিষ্ট অধিকারী, তাঁরাই জাতিভেদের সোপানশ্রেণীতেও শীর্ষস্থানে। পৌত্তলিকতায় যাঁদের আর্থিক লাভ, জাতিভেদ প্রথানুসারেও তাঁদেরই সর্ব্বোচ্চ সম্মান-প্রতিপত্তি। এই দুই প্রথার উৎপত্তিও যেমন একই গৃহে, বৃদ্ধিও তেমনি একই হাতের পরিচর্য্যায়। এদের কার্য্য-

প্রণালী এবং কার্য্যের ফলাফলও এক সঙ্গে জড়িত। এ সকল দেখে' শুনে'ই রামমোহন জাতিভেদকে অতি সহজ ও স্বাভাবিক ভাবে 'পৌত্তলিকতা' বলেছিলেন। এ বিষয়ে তাঁর গূঢ় দৃষ্টি চিন্তা কর্‌লে আশ্চর্য্য হতে হয়। বাস্তবিক, 'পৌত্তলিকতা' বড় ব্যাপক শব্দ।

পৌত্তলিকতা ও জাতিভেদ, এ দুয়ের একটির বলে অপরটির বল; একটি অপরটির সহকারী। পৌত্তলিকতাই জাতিভেদ-রূপ অধর্ম্মকে ধর্ম্মের পোষাক দিয়ে স্থায়ী কর্‌চে; এবং জাতিভেদই সমাজ-চ্যুতি ইত্যাদির ভয় দেখিয়ে পৌত্তলিকতাকে প্রতিষ্ঠিত রাখ্‌চে। যেমন অনিষ্টকারী রাজা পরাক্রমশালী সেনাপতি নিযুক্ত করে' রাজ্য মধ্যে আপনার প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত রাখে, পৌত্তলিকতা সেইরূপ জাতিভেদ প্রথার সাহায্যে আপনার অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখ্‌চে। আবার, যেমন অত্যাচারী সেনাপতি রাজার অনুমোদন পেয়ে ও রাজার বলে বলী হয়ে প্রজাদের উপর যথেচ্ছ ব্যবহার কর্‌তে থাকে, জাতিভেদ তেমনি পৌত্তলিকতার অনুমোদন পেয়ে ও তারই বলে বলী হয়ে আপনার অন্যায় কার্য্যসকল শতাব্দীর পর শতাব্দী চালাচ্চে। এ দুই বন্ধু চিরদিন নানাভাবে পরস্পরের বল বৃদ্ধি কর্‌চে।

বর্ত্তমানে এক শ্রেণীর সংস্কারক দেবপূজাকে বজায় রেখে হিন্দুসমাজ হতে অস্পৃশ্যতা (ও ক্রমে জাতিভেদ) দূর কর্‌তে চান। রামমোহন রায়ের পূর্ব্বোক্ত ইঙ্গিত তাঁদের বিবেচনা করা উচিত। দেবপূজাকে রেখে অস্পৃশ্যতা বা জাতিভেদ সমূলে দূর করা কি সম্ভব? যাঁরা সর্ব্বজাতীয় লোকের ঈশ্বরকে পূজা না করে', নিজেদের পৃথক্ দেবতা কল্পনা করেন, তাঁদের পক্ষে কি মানব-সাধারণকে ভাই বলে' আলিঙ্গন করা সহজ ও স্বাভাবিক? উপাস্য পৃথক্ হলে জাতিও পৃথক্ হয়; জাতিভেদ আপনি আসে। এক উপাস্য—এক জাতি; ভিন্ন উপাস্য—

ভিন্ন জাতি। বর্ত্তমানে শূদ্রের দেবতা ব্রাহ্মণের নমস্য নন; হিন্দুস্থানীর দেবতা বাঙ্গালীর ভক্তি পান না; এক প্রদেশের পূজাপার্ব্বণ অন্য প্রদেশের লোকের মনে শ্রদ্ধা উৎপন্ন করে না। যতদিন সর্ব্বল প্রদেশের ও সকল জাতির হিন্দুগণ এক ঈশ্বরের উপাসনা অবলম্বন না কর্‌বেন, ততদিন তাঁরা এক জাতিতে পরিণত হতে পার্‌বেন না। আর, ততদিন অন্যান্য দেশের লোকদের সহিতও তাঁদের মিলন সম্ভব হবে না।

অতএব, যদি জাতিভেদকে অপসারিত কর্‌তে হয়, তবে বহুদেবতার পূজাকেও অপসারিত কর্‌তে হবে। সেনাপতির বল খর্ব্ব কর্‌তে হলে, তার চির-পৃষ্ঠপোষক রাজাকেও সিংহাসন-চ্যুত করা আবশ্যক। সূক্ষ্মদর্শী সংস্কারককে রামমোহন রায়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করে' দেবপূজা ও জাতিভেদ উভয়ের সহিত এক সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হতে হবে।

(ঝ) জাতবিচার মানুষকে মানুষ হইতে বিচ্ছিন্ন করে।

রামমোহন রায় বল্‌চেন (W. 119) যে, মহাভারতাদি গ্রন্থে দেখা যায়, আহার সম্পর্কে জাতবিচার আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা কর্‌তেন না। বর্ত্তমানে ইহা কিরূপে মানুষকে মানুষ হতে বিচ্ছিন্ন করে, তিনি তার দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। বল্‌চেন (W. 120)—'যে হিন্দু বিশেষ ধর্ম্মনিষ্ঠা দেখাতে চান, তিনি 'স্বয়ম্পাক' হন; তিনি আপন ভ্রাতার রন্ধনেও আহার করেন না। আহারকালে দৈবাৎ ভ্রাতার স্পর্শ ঘট্‌লে তাঁকে ভুক্তাবশিষ্ট অন্ন পরিত্যাগ করে' উঠ্‌তে হয়। শাস্ত্রের উপদেশের বিরুদ্ধে এমন অদ্ভুত পৌত্তলিকতার অনুষ্ঠান করে' হিন্দুগণ 'সামাজিক জীব' নামের অযোগ্য হয়ে পড়েছেন।'

'স্বয়ম্পাক হওয়া' বা 'স্বপাকে আহার করা' বাহ্যিক শুচিতার পরাকাষ্ঠা। উহা অল্পসংখ্যক পবিত্রতাভিমানী লোকের মধ্যেই দেখা যায়। কিন্তু ব্রাহ্মণদের মধ্যে সকলকেই আহারকালে অন্য ব্রাহ্মণের, এমন কি নিজ ভ্রাতারও, স্পর্শ ঘট্‌লে আহার্য্য পরিত্যাগ কর্‌তে হয়। পংক্তিভোজনের সময় ব্রাহ্মণেরা পরস্পর হ'তে কিঞ্চিৎ দূরে উপবেশন করেন, যেন কারো শরীরে কারো স্পর্শ না লাগে। অন্য জাতীয় লোকের স্পর্শ সম্বন্ধে ত কথাই নেই; তাতে প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন হয়।

ভিন্নবংশীয় লোকের রন্ধনে আহার না করাকে ব্রাহ্মণেরা নিজ বংশের মর্য্যাদা রক্ষার উপায় মনে করেন। কোনও বৃহৎ ব্যাপারে নিমন্ত্রিত হ'লে, বিভিন্ন বংশের ব্রাহ্মণেরা বিভিন্ন স্থানে রন্ধন করেন এবং পৃথক্ পৃথক্ ভোজন করেন। মেলা প্রভৃতি স্থানেও এরূপ দেখা যায়। এই কারণে এই প্রবাদ বাক্য প্রচলিত হয়েছে—'বারো বামুনের তেরো হাঁড়ি'। আপনার কৌলীন্য রক্ষা কর্‌বার এই পদ্ধতি অন্য জাতীয় লোকেরাও যথাসাধ্য অনুকরণ করেন। শত শত উপজাতির মধ্যে এক উপজাতি অন্য উপজাতির অন্ন গ্রহণ না ক'রে' নিজের স্বাতন্ত্র্য ও প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত রাখ্‌বার চেষ্টা করেন। ভিন্ন প্রদেশের লোক সমজাতীয় হলেও, তাদের সঙ্গে আহারাদি করা হয় না।

এইরূপে কল্পিত শুচিজ্ঞান, কৌলীন্যাভিমান ও জাতবিচার হিন্দু-জাতিকে লক্ষ লক্ষ ভাগে বিভক্ত করে' রেখেছে।

(এঙ) জাতিভেদ অনৈক্যের হেতু ও রাজনৈতিক উন্নতির অন্তরায়।

জাতিভেদ কিরূপে এ দেশের লোকের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি করে' রাজনৈতিক উন্নতিতে বাধা জন্মাচ্চে, রামমোহন রায় সে কথা তাঁর কোনও

ইংরাজ বন্ধুর নিকট এক চিঠিতে ব্যক্ত করেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন (W. 929)—'আমি দুঃখের সহিত বল্‌চি যে, বর্ত্তমানে হিন্দুগণ যে ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তা তাঁদের রাজনৈতিক স্বার্থলাভের অনুকূল নয়। জাতিভেদ তাঁদের মধ্যে অগণ্য বিভাগ ও উপবিভাগের সৃষ্টি করে', তাঁদের অন্তরের দেশাত্মবোধকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করে' দিয়েছে। ধর্ম্ম-সংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপের ও প্রায়শ্চিত্ত-বিধির বাহুল্য তাঁদিগকে সর্ব্বপ্রকার সাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হবার অযোগ্য করে' ফেলেছে। * * * আমার মনে হয়, অন্ততঃ রাজনৈতিক উন্নতি ও সামাজিক সুখসুবিধা বৃদ্ধির জন্যও তাঁদের ধর্ম্মে কিছু পরিবর্ত্তন আসা প্রয়োজন।'

'ব্রাহ্মণ সেবধি' নামক পত্রিকার প্রথম সংখ্যার ভূমিকাতেও (গ্র, ৪৫৬) রামমোহন রায় জাতিভেদকে **"সর্ব্বপ্রকারে অনৈক্যতার মূল"** বলেছিলেন। এই জাতিভেদ দূর কর্‌বার জন্যই তিনি 'বজ্রসূচী' নামক একখানা সংস্কৃত গ্রন্থের একটি অধ্যায় বঙ্গানুবাদ সহ প্রকাশ করেছিলেন (গ্র, ৩৯৩—৯৮)। ঐ গ্রন্থখানা মৃত্যুঞ্জয়াচার্য্য-বিরচিত; উহাতে জাতিভেদের অযৌক্তিকতা ও অসারতা প্রতিপন্ন করা হয়েছে।

(ট) দেবতাদের চরিতাখ্যান পাঠ ও শ্রবণাদি দেবপূজার তৃতীয় অঙ্গ।

তৃতীয়তঃ, দেবতাদের চরিতাখ্যান পাঠ, শ্রবণ, কীর্ত্তন ও অভিনয় দেবোপাসকদের আর এক সাধন। প্রত্যেক দেবতার চরিতাখ্যান শ্রবণ দ্বারাই তাঁর পরিচয় লাভ হয়। সে পরিচয় ভিন্ন পূজা সম্ভব নয়। এই কারণে সর্ব্বদা নানাস্থানে ব্রাহ্মণপণ্ডিত ও গোস্বামী মহাশয়গণ পুরাণাদি পাঠ করে' থাকেন। বহুসংখ্যক পুরুষনারী, বালকবালিকা পুণ্যকার্য্য বোধে ভক্তির সহিত সে সকল শ্রবণ করেন। একাদশী প্রভৃতি তিথিতে

এবং বিশেষ বিশেষ মাসে,দেবালয়ের নাটমন্দিরে ও গৃহস্থদের গৃহে, নিয়মপূর্ব্বক পুরাণাদি পাঠ হয়ে থাকে। যাত্রা, নাটক প্রভৃতি অভিনয়ের দ্বারাও অনেক সময় দেবতাদের উপাখ্যান জনসমাজে অধিকতর ব্যাপক ভাবে প্রচারিত হয়। এ সকল সাকার উপাসনা প্রচারের চিরাগত প্রণালী। এতদ্ভিন্ন, গৃহে গৃহে প্রত্যেক পিতামাতা সন্তানদিগকে বাল্যকাল হতে আরাধ্য দেবতাদের কাহিনী মুখে মুখে শিক্ষা দেন।

(ঠ) পুরাণাদিতে দেবচরিত্রের বর্ণনা কালিমাময়।

পুরাণাদি পাঠ ও শ্রবণ এবং যাত্রা-নাটকাদি অভিনয় দ্বারা দেবোপাখ্যান শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের নীতি ও সদাচার শিক্ষাও হয়, সন্দেহ নেই। কিন্তু এ সকলের দ্বারা নীতিশিক্ষা বিষয়ে অনেক অধিক উপকার হতে পারৃত, যদি পুরাণাদিবর্ণিত দেবচরিত্র নির্দ্দোষ ও মহৎ হত। বড়ই দুঃখের বিষয়, ঐ সকল গ্রন্থে দেবতাদের চরিত্র অনেক স্থলে অতি কুৎসিত ভাবে চিত্রিত হয়েছে। প্রধান প্রধান দেবতাদেরই চরিত্রে এমন সকল কলঙ্ক আরোপিত হয়েছে, যা মনুষ্যজীবনে দেখ্‌লে লোকে ঘৃণায় মুখ ফেরায়। আজকালকার ইংরাজী-শিক্ষিতদের মধ্যে যাঁরা মূর্ত্তিপূজার সমর্থন করেন, তাঁদের অনেকে হয়ত সে সকল অখ্যায়িকা জানেন না। রামমোহন রায় শঙ্কর শাস্ত্রীর সহিত বিচারে (W. 97-99) সে সকলের কিঞ্চিৎ উল্লেখ করেছিলেন এবং দেখিয়েছিলেন যে, কেবল চরিত্রগত কারণেই দেবতাদিগকে 'ঈশ্বরের স্বরূপ' বলা চল্‌ল না"। এই প্রসঙ্গে রামমোহন দেবচরিত্রের যে সব দৃষ্টান্ত দিয়েছিলেন, তা স্মরণ করিয়ে আমি আপনাদের মনকে অপবিত্র বা ক্লিষ্ট কর্‌তে ইচ্ছা করি না।

ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচারের ইংরাজী অংশে রামমোহন দেবতাদের চরিত্রের হীনতা বিষয়ে আরও অনেক দৃষ্টান্ত দিয়েছিলেন (W. 124—26)। মহাভারতের আদি পর্ব্ব, সভা পর্ব্ব, দ্রোণ পর্ব্ব, সৌপ্তিক পর্ব্ব প্রভৃতি হতে তিনি তাঁর বক্তব্য বিষয়ের প্রমাণ দিয়েছিলেন এবং পাঠককে ইচ্ছা হলে ভাগবতের দশম স্কন্ধ, হরিবংশ এবং নিগম ও আগমসমূহ পড়ে' দেখ্‌তে বলেছিলেন।

বস্তুতঃ, আপনারা অপক্ষপাতে বিচার কর্‌লে, বোধ করি দেখ্‌তে পাবেন যে, পুরাণরচয়িতারা যে ভাবে দেবতাদের ও অসুরদের চরিত্র অঙ্কিত করেছেন, তাতে অনেক স্থলে অনিচ্ছা সত্ত্বেও অসুরদের চরিত্রই মহত্তর হয়ে উঠেছে। অসুরেরা প্রায় সকল স্থলেই বলিষ্ঠ, সাহসী, সরল ও কর্ম্মদক্ষ; কিন্তু দেবতারা দুর্ব্বল, ভীরু, কুটিলপথাবলম্বী ও অপটু। অবশ্য সকল উপাখ্যানেই পরিণামে দেবতাদের জয় দেখান হয়েছে; কিন্তু সেই জয়ের উদ্দেশ্যে তাঁরা যে সব উপায় অবলম্বন করেছিলেন, তার অধিকাংশের সমর্থন বোধ হয় আজকাল কোনও নীতিমান্ ব্যক্তি কর্‌তে পার্‌বেন না। এটিও লক্ষ্য কর্‌বার বিষয় যে, দেবতাদের সেই জয় অনেক স্থলেই সাংসারিক রাজ্যসম্পদ লাভের জয়; চরিত্রের বা ধর্ম্মের জয় নয়। অতএব, এ কথা স্বীকার কর্‌তেই হবে যে, পুরাণকারগণ যাঁদিগকে (নিম্নাধিকারীদের জন্যই হোক্) উপাস্যরূপে স্থাপন করেছেন, তাঁদেরই চরিত্র এইরূপে চিত্রিত করে' তাঁরা হিন্দুজাতির ঘোর অনিষ্ট করে' গিয়েছেন।

(ঙ) তাহার ফলে উপাসকদের নীতির হীনতা ঘটে।

ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচারের ইংরাজী অংশে রামমোহন রায় বল্‌চেন (W. 112)—মূর্ত্তিপূজা যে ভাবে দেশবাসিগণকর্তৃক অনুষ্ঠিত হচ্চে, তাকে

ভট্টাচার্য্য নীতির পোষক বলে' উৎসাহের সহিত সমর্থন করেছেন। কিন্তু এই প্রথা একে ত সর্ব্বশাস্ত্র-বিরুদ্ধ ; তা ছাড়া, সাধারণ বুদ্ধিতেও উহা ভয়াবহ বলেই প্রতীয়মান হয়। কারণ, উহা লোককে সোজাসুজি দুর্নীতির মধ্যে নিয়ে যায় ; আর উহা সামাজিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যকেও বিনাশ করে।

কিরূপে দুর্নীতির মধ্যে নিয়ে যায়, রামমোহন তার বর্ণনা করেছেন এবং সেই প্রসঙ্গে দেবতাদের পুরাণবর্ণিত হীন চরিত্রের উল্লেখ পুনরায় করেছেন। এ বিষয়ে অনেক দৃষ্টান্ত দিয়ে তিনি বল্‌চেন (W. 112)—এই সকল দেবতার প্রতি ভক্তিভাব পোষণ কর্‌তে যাঁরা বাল্যাবধি শিক্ষা পান, যাঁরা প্রায় প্রতিদিন এই সকল দেবতার চরিত্র চিন্তা করে' স্মৃতিকে উজ্জ্বল করেন, এবং যাঁদের মনে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়ে আছে যে, এঁদের মধ্যে কোনো একটির 'পবিত্র' নাম জপ কর্‌লে, অথবা তাঁর মূর্ত্তিকে (অর্থাৎ সেই মূর্ত্তির পূজককে) সামান্য কিছু উপহার প্রদান কর্‌লেই সর্ব্বপ্রকার পাপ হ'তে মুক্ত হওয়া যায়, অধিকন্তু পরলোকেও মোক্ষ লাভ হয়, তাঁদের থেকে কিরূপ নৈতিক আচরণ প্রত্যাশা করা যেতে পারে, তা সুস্পষ্ট ; সে সম্বন্ধে দুই মত হওয়া সম্ভব নয়।

রামমোহন রায়ের স্থির সিদ্ধান্ত এই ছিল যে, সর্ব্বগুণাধার জগৎ-পতিকে সম্মান কর্‌বার ভাণ করে' যে সকল ধর্ম্মানুষ্ঠান এ দেশে প্রবর্ত্তিত হয়েছে, তার ফলে নীতির প্রত্যেক মূল-সূত্র সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক (W. 94)।

মুণ্ডকোপনিষদের ইংরাজী অনুবাদের ভূমিকায় রামমোহন বল্‌চেন (W. 21)—মূর্ত্তিপূজা অজ্ঞানতা ও কুসংস্কারের মূল এবং নীতির সম্পূর্ণ ধ্বংসকারী ; যেহেতু ইহা ব্যভিচার, আত্মহত্যা, নারীহত্যা ও নরবলিকে সমর্থন করে।

তিনি এর প্রত্যেকটির সুস্পষ্ট উদাহরণ দিয়েছেন। সুখের বিষয়, প্রয়াগে, গঙ্গাসাগরে ও জগন্নাথের রথের তলায় আত্মহত্যা, এবং সতীদাহ, নরবলি, সাগরসঙ্গমে পুত্রনিক্ষেপ ও অন্যান্য নৃশংস অনুষ্ঠান আজকাল আর চলিত নেই; প্রবল বিদেশীয় গবর্ণমেণ্টের শাসনভয়ে এ সকল নিরস্ত হয়েছে। কিন্তু পুরাণ-বর্ণিত দেবচরিত্রের শ্রবণ-মনন এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নানাপ্রকার কুৎসিত সাধনপ্রণালী লোকচক্ষুর অগোচরে নিত্য যে কুফল প্রসব করূচে, তা হতে সমাজকে কে রক্ষা করবে?

পণ্ডিতপ্রবর অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের "ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়" যাঁরা পাঠ করেছেন, তাঁরা জানেন, কত প্রকার অদ্ভুত ও বিভৎস প্রণালীতে এ দেশে শত শত সম্প্রদায় আপন আপন উপাস্য দেবতার অর্চ্চনা করেন। কত শতাব্দী ধরে' এ সকল রহস্যাবৃত সাধনপ্রণালী অনুসৃত হয়ে আসূচে এবং ধর্ম্মের নামে মানুষকে অমানুষিক কার্য্যে প্রবৃত্ত করূচে, কে বল্‌তে পারে? রামমোহন রায় যৌবনের প্রারম্ভে উত্তর-ভারতের নানা প্রদেশ ভ্রমণ করে' এ সকল স্বচক্ষে দেখেছিলেন; এ জন্যই অন্ধ-বিশ্বাস ও পৌত্তলিকতার প্রতি তাঁর মনে এমন অবিমিশ্র ঘৃণা জন্মেছিল।

(চ) দেবপূজার সমর্থনকারীদের উচিত দেবচরিত্রকে কলঙ্কমুক্ত করা।

বর্ত্তমানে যে সকল উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তি নীতি ও জনসেবামূলক উন্নত ধর্ম্মের আদর্শ প্রাণে পেয়েছেন, অথচ দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক নানা যুক্তি দ্বারা দেবপূজার সমর্থন করেন, তাঁদের চিন্তা করা উচিত, কি উপায়ে উহার পূর্ব্বোক্ত কুফলরাশি নিবারণ করা যায়। এক উপায়—দেশহিতৈষী বঙ্কিমচন্দ্র যেমন শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রের কলঙ্কসমূহকে

মিথ্যা প্রতিপন্ন কর্‌বার জন্য গ্রন্থাদি লিখেছিলেন, তেমনি সকল দেবতাকেই কলঙ্কমুক্ত কর্‌বার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হওয়া। দ্বিতীয় উপায়—জনসমাজে যাতে পুরাণাদির কলুষিত অংশসকল পাঠ, ব্যাখ্যা বা অভিনয় না হয়, তার ব্যবস্থা করা। দেবপূজাকে যাঁরা উন্নত আকারে রাখ্‌তে চান, এ দুই বিষয়ে চেষ্টা করা তাঁদের একান্ত কর্ত্তব্য। চেষ্টা কর্‌লে প্রমাণিত হবে যে, তাঁরা সত্যই উহাতে বিশ্বাস করেন এবং দেশের নৈতিক উন্নতির প্রতিও তাঁদের দৃষ্টি আছে। অবশ্য, এ দুই কার্য্যে তাঁরা সফলকাম হবেন বলে' আমি মনে করি না। বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণচরিত্রের নির্ম্মলতাসম্পাদনে কৃতকার্য্য হন নি; দেশ তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ সিদ্ধান্তসকল গ্রহণ করে নি। সুতরাং তৎসদৃশ অন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর্‌বে বলে' আশা কি? আর, পুরাণাদির প্রতি লোকের অন্ধবিশ্বাস বজায় থাক্‌বে, অথচ তারা তার কোনো কোনো অংশ বর্জ্জন কর্‌বে, এমন আশাই বা কিরূপে করা যায়? তবু, এ দুই অসাধ্য-সাধনে ব্রতী হতে দেবপূজা-রক্ষণেচ্ছু সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণ ন্যায়তঃ ও ধর্ম্মতঃ বাধ্য।

(ণ) কলঙ্কমুক্ত না হইলে দেবতারা উপাস্য হইতে পারেন না।

দেবতাদের চরিত্র কলঙ্কমুক্ত না হলে, তাঁরা প্রকৃত পক্ষে মানুষের অভ্যন্তরস্থ শুদ্ধ আত্মার উপাস্য হতে পারেন না। চরিত্রের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধারই নাম ভক্তি; আর সেই ভক্তিই প্রকৃত উপাসনার প্রাণ। অতএব, অন্তরাত্মার শ্রদ্ধা যাঁরা পাচ্চেন না, অন্তরাত্মা যাঁদের চরিত্রগুণে মুগ্ধ হচ্চে না, তাঁরা বাহিরের আড়ম্বরে পূজিত হলেও, বস্তুতঃ উপাস্য-পদ হতে চ্যুত হয়ে আছেন। তবে যে তাঁরা বর্ত্তমানে এক

প্রকার ভক্তি পাচ্ছেন, তা উপাসকদের বাল্যসংস্কারের ফল এবং তার অনেকাংশ ভাবমুগ্ধতা মাত্র (১১২-১৪ পৃঃ)। বাল্যাবধি যাঁদের পূজা করা যায়, তাঁদের প্রতি অনুরাগ অন্তরের সংস্কাররূপে পরিণত হয়; বড় হয়ে তাঁদের চরিত্র-বিষয়ক মলিন আখ্যায়িকাসকল শ্রবণ করলেও সে অনুরাগ সাধারণতঃ লোপ পায় না। শুদ্ধচিত্ত উপাসকেরা সে সকল আখ্যায়িকাকে যত দূর সম্ভব চিন্তার বাহিরে রাখেন। উপাস্য দেবতার চরিত্রে মন্দ কিছু আছে, এ কথা ভাব্‌তে তাঁদের ভাল লাগে না। কোনো রূপ ব্যাখ্যা দিয়ে হোক্ বা চিন্তা-চক্ষু মুদ্রিত করে' হোক্, সে সকলকে আড়ালে রাখ্‌তেই তাঁদের ইচ্ছা হয়। এ ইচ্ছা স্বাভাবিক ও হিতকর, সন্দেহ নেই। কিন্তু সকল উপাসক এরূপ শুদ্ধচিত্ত নন; অধিকাংশ লোক দেবতাদের ঐ সকল আখ্যায়িকা শুন্‌তে, বল্‌তে ও অভিনয় কর্‌তে সুখ পান। তাতেই নানাপ্রকার নীতিবিরুদ্ধ উপাসনাপ্রণালী জন-সমাজে প্রচলিত হয়েছে। অতএব, দেবপূজার কুফলরাশি হতে সর্ব্বসাধারণকে বাঁচাতে হলে, হয় দেবচরিত্রকে যেমন করে' হোক্ কলঙ্কমুক্ত কর্‌তে ও পুরাণাদির অনিষ্টকর অংশসকলের পাঠ, শ্রবণ প্রভৃতি বন্ধ রাখ্‌তে হবে, না হয় দেবপূজা সম্পূর্ণ পরিত্যাগ কর্‌তে হবে।

(ত) শিক্ষিত ব্যক্তিরা দেবচরিত্রকে আলোচনার বাহিরে রাখেন।

যে সকল উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তি নানাপ্রকার সূক্ষ্ম যুক্তির দ্বারা দেবপূজার সমর্থন করেন, দেখা যায় তাঁরা সর্ব্বদাই উক্ত চরিত্রবিষয়ক গুরুতর প্রশ্নটিকে আলোচনার বাহিরে রাখেন। মনে করুন, এক ব্যক্তি যুক্তি দিলেন যে, যেমন জ্যামিতি শাস্ত্রের বিন্দু ও রেখা বস্তুতঃ নিরাকার,

কিন্তু শিক্ষাদান-কালে বোর্ডে এ দুইকে আকার দিয়েই দেখাতে হয়, না হলে কাজ চলে না, সাকারোপাসনা তদ্রূপ। অর্থাৎ, তিনি বল্‌তে চান—"উপাসকানাং কার্য্যার্থং ব্রহ্মণো রূপকল্পনা"। কিন্তু এই যুক্তি দেবার সময় তিনি ভুলে' যান, বা ইচ্ছা করেই ভুলে' থাকেন যে, যে রূপটি দেখান হল, তা নিষ্পাপ ব্রহ্মের রূপ নয়; মানবীয় ত্রুটিদুর্ব্বলতাবিশিষ্ট দেবতার রূপ—নিরাকারের রূপ নয়; সাকারেরই রূপ।

জ্যামিতির বিন্দু ও রেখার দৃষ্টান্তটি যে আমি নিজে কল্পনা করে' বল্‌চি, তা নয়। একখানা গীতাগ্রন্থের ভূমিকায় উহা বাস্তবিকই লিখিত হয়েছে। লেখক যে আধুনিক ইংরাজী-শিক্ষিত ব্যক্তি, তা স্পষ্টই বোঝা যাচ্চে; কারণ, প্রাচীন তন্ত্রের বিশ্বাসীরা সরলভাবে দেবতাকে দেবতা বলে'ই জানেন; তাঁদের ঐরূপ ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় না। যা হোক্, এও এক শুভ লক্ষণ যে, গীতার একটি সংস্করণ প্রকাশ কর্‌তে গিয়ে, তার ভূমিকায় অযাচিতভাবে সাকারোপাসনার সমর্থন জন্য ব্যাখ্যা দিতে হল। এতে বোঝা যাচ্চে, ইংরাজী-শিক্ষিতদের দেবপূজায় বিশ্বাস রক্ষা করা কত কঠিন হয়ে পড়েছে।

আর, তাঁরা যে সাকারোপাসনা-বিষয়ক আলোচনা কালে সকলেই দেবচরিত্রকে আড়ালে রাখেন, এও আর একটি শুভ লক্ষণ। এতে বোঝা যাচ্চে, তাঁরা অন্ততঃ নীতির দিক্ দিয়ে ভিতরে ভিতরে 'উচ্চাধিকারী' হয়ে উঠেছেন। তাই যদি হয়, তবে, হয় তাঁরা দেবচরিত্রকে কলঙ্কমুক্ত করুন, না হয় অন্য এক শ্রেণীর উন্নততর ও বিশুদ্ধতর দেবতা আবিষ্কার করুন *। তা না হলে, তাঁদের আত্মার গোপন নীতিনিষ্ঠা ও ভক্তিপিপাসা চরিতার্থ হবার সম্ভাবনা নেই।

* শুদ্ধচরিত্র মহাপুরুষদের (যেমন, পরমহংস রামকৃষ্ণ, মহাত্মা গান্ধী প্রভৃতির) মূর্ত্তি বা ছবির পূজা আজকাল আরম্ভ হয়েছে। এও মন্দের ভাল।

(খ) ব্রহ্মোপাসনায় নীতিকে উন্নত করে।

পুরাণকর্ত্তারা দেবোপাসকদের পথে এই যে মহা বিঘ্ন রেখে গিয়েছেন, ব্রহ্মোপাসকদের পথে তা নেই। ব্রহ্মকে কেহ কখনও মলিন বর্ণে চিত্রিত করে নি; করা অসম্ভব। মানবাত্মার যা-কিছু পবিত্রতম, উন্নততম আকাঙ্ক্ষা, ব্রহ্মেতে তাঁর চরিতার্থতা। শাস্ত্রানুসারে ব্রহ্ম 'শুভ্র', 'জ্যোতির জ্যোতি'; মানবাত্মার শুদ্ধতার মধ্যে তিনি প্রকাশিত। মুণ্ডক উপনিষৎ বল্‌চেন—

(১) "হিরণ্ময়ে পরে কোষে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলং।

তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ্ যদাত্মবিদো বিদুঃ॥"—২।২।৯

অর্থ—আত্মরূপ উজ্জ্বল ও শ্রেষ্ঠ কোষ মধ্যে সেই নির্ম্মল, নিরবয়ব ব্রহ্ম বর্ত্তমান। তিনি শুভ্র (অর্থাৎ শুদ্ধ) এবং জ্যোতির জ্যোতি। তিনি সেই, যাঁকে আত্মবিদেরা জানেন।

(২) "অন্তঃশরীরে জ্যোতির্ম্ময়ো হি শুভ্রো

যং পশ্যন্তি যতয়ঃ ক্ষীণদোষাঃ।" —ঁ

অর্থ—শরীরের অভ্যন্তরে সেই জ্যোতির্ম্ময় শুদ্ধ পরমাত্মা বর্ত্তমান, যাঁকে নিষ্পাপ যতিগণ দর্শন করেন।

সাধকের আত্মা যত নির্ম্মল হয়; ততই সেই নির্ম্মল আত্মার জ্যোতির মধ্যে তিনি পরমাত্মা পরব্রহ্মের জ্যোতি দর্শন করেন। ব্রহ্মের শুভ্রতা নৈতিক শুভ্রতা; তাঁর জ্যোতি নৈতিক জ্যোতি। নির্ম্মলচিত্ত সাধকের কাছে তিনি পরম সুন্দর; তাঁর সেই সৌন্দর্য্যও নৈতিক সৌন্দর্য্য।

ব্রহ্ম '**নিরবদ্যং নিরঞ্জনং**' (শ্বেতাশ্বতর, ৬।১৯)—অনিন্দনীয় ও মলিনতারহিত। মানব-হৃদয় তাঁর শুদ্ধতার সাক্ষী। মানব-হৃদয় চিরদিন যে শুদ্ধতার আকাঙ্ক্ষা কর্‌চে, তা তাঁরই শুদ্ধতা।

ভট্টাচার্য্য বলেছিলেন, 'পরমাত্মার দেহ আছে' (৪৬ পৃঃ); কেবল তা নয়, তিনি বলেছিলেন, মানব-শরীরের চব্বিশ প্রকার ধর্ম্মও সেই পরম পুরুষে আছে। এ কথার উত্তরে রামমোহন রায় বল্লেন (W. 114) —ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁর কল্পিত দেবতাসমূহে প্রাণিগণের (কামক্রোধাদি সহ) চব্বিশ প্রকার ধর্ম্ম সহজেই আরোপ কর্‌তে পারেন; কিন্তু পৌত্তলিক চিন্তাপ্রণালীর দ্বারা যার চিত্ত কলুষিত হয় নি, এমন কোনও ব্যক্তির পক্ষে নিজের মলিন ভাবসকল পরমেশ্বরেতে আরোপ করা কঠিন, এমন কি অসম্ভব।

ঈশোপনিষৎ বল্‌চেন— "স পর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণমস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্"—সেই পরমাত্মা সর্ব্বব্যাপী, জ্যোতির্ম্ময়; তাঁর শরীর নেই, (সুতরাং) তিনি শিরা ও ব্রণরহিত; তিনি শুদ্ধ, পাপ তাঁতে প্রবেশ কর্‌তে পারে না।

অতএব, পবিত্রস্বরূপ পরব্রহ্মের উপাসনায় উপাসকদের নীতির উন্নতি হওয়া অতিশয় স্বাভাবিক।

(দ) শাস্ত্রে অন্ধবিশ্বাস দেবপূজার চতুর্থ অঙ্গ।

দেবপূজার চতুর্থ অঙ্গ পুরাণাদি শাস্ত্রে অন্ধবিশ্বাস। দেবতাদের সকল কাহিনীর মূল পুরাণ, ইতিহাস প্রভৃতি গ্রন্থ; সুতরাং তাঁদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে হলে, ও তাঁদের পূজা কর্‌তে হলে, অগ্রে ঐ সকল গ্রন্থে অবিচলিত বিশ্বাস থাকা চাই। কোন্ দেবতার পূজা কোন্ তিথিতে, কি কি বস্তুর সাহায্যে, কি প্রণালীতে ও কোন্ কোন্ মন্ত্রে করতে হবে, তার জন্যও বিশেষ বিশেষ গ্রন্থের উপর নির্ভর কর্‌তেই হবে। এ সকল বিষয়ে গ্রন্থলিখিত উপদেশে সন্দেহ করলে বা তৎসম্বন্ধে প্রশ্ন কর্‌লে পূজা সম্ভব হয় না। স্বাধীনভাবে বুদ্ধিবৃত্তির চালনা

দ্বারা দেবতাদের আকৃতি-প্রকৃতি নির্ণয় বা পূজাপদ্ধতি আবিষ্কার সম্ভব নয়; তার জন্য একান্তভাবে শাস্ত্রের মুখাপেক্ষী হতেই হবে। সুতরাং দেবোপাসকদের পক্ষে শাস্ত্রে অন্ধবিশ্বাস অপরিহার্য্য।

এর ফল বড়ই ব্যাপক। বিনা বিচারে শাস্ত্রকে মান্য করাতে বুদ্ধি-বৃত্তির বিকাশে ব্যাঘাত ঘটে। আর, জীবনের একটি মাত্র বিভাগেও বুদ্ধিবৃত্তির চালনার পথ রোধ করে' রাখ্লে ঐ বৃত্তি স্বাধীনতা ও তেজ হারায়; এবং তার ফল শীঘ্রই অন্যান্য বিভাগে ব্যাপ্ত হয়। এই কারণে, যে দেশে ধর্ম্মবিষয়ে স্বাধীন চিন্তার পথ যত অধিক রুদ্ধ, সে দেশে বিজ্ঞানের উন্নতি তত অল্প হয়; সে দেশের লোক শিল্পবাণিজ্যের ক্ষেত্রেও নূতন নূতন আবিষ্কারের দ্বারা উন্নতি কর্‌তে তত অক্ষম হয়। এইরূপে শাস্ত্রান্ধতা দ্বারা সকল বিভাগে জাতীয় অধোগতি ঘটে।

(খ) ব্রহ্মোপাসনায় বুদ্ধিবৃত্তির চালনা অপরিহার্য্য।

পক্ষান্তরে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও স্বরূপ নির্ণয় কর্‌তে হলে শাস্ত্রান্ধতার প্রয়োজন নেই। জগৎ-কার্য্যের পর্য্যালোচনা ও আত্মতত্ত্বের অনুশীলন দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়। এ দুটিই বুদ্ধিবৃত্তির চালনা-সাপেক্ষ। ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্যও গ্রন্থাদি পাঠের প্রয়োজন হয় বটে, কিন্তু সে কেবল বুদ্ধি-বৃত্তি ও হৃদয়বৃত্তির কার্য্যের সহায়তার জন্য। পর্য্যবেক্ষণ, পরীক্ষা, চিন্তা ও ধ্যানের দ্বারা স্বয়ং সত্যনির্ণয় না কর্‌লে, ব্রহ্মজ্ঞানের পথে অগ্রসর হওয়া যায় না। এ কার্য্য কঠিন; কিন্তু এই কঠিন পথই মানবাত্মার উন্নতির জন্য বিধাতা নির্দ্দেশ করেছেন। রামমোহন রায় বলেছিলেন, কঠিন বলে'ই এতে অধিক যত্ন করা আবশ্যক (২৮ পৃঃ)।

(ন) বুদ্ধিবৃত্তিকে নিষ্কৃতি দেওয়ার ফল জীবনের অধোগতি।

পর্য্যবেক্ষণ, পরীক্ষা, চিন্তা ও ধ্যান হতে বুদ্ধিবৃত্তিকে নিষ্কৃতি দিলে জীবনের সর্ব্ববিভাগে অধোগতি হওয়া অনিবার্য্য। দেবপূজার দ্বারা এ দেশে তাই ঘটেছে। রামমোহন রায় বলেছিলেন (W. 30)—মূর্ত্তিপূজাসংসৃষ্ট অন্ধবিশ্বাসসমূহ লোকের বিচারশক্তিকে রুদ্ধ করেছে, এমন কি বিনষ্ট করে' ফেলেছে; এবং বুদ্ধিবৃত্তির প্রত্যেকটি আলোক-রেখাকে কালিমাময় করেছে।

বস্তুতঃ, সতীদাহ, গঙ্গাসাগরে সন্তান-বিসর্জ্জন, প্রয়াগে ও জগন্নাথের রথের তলায় আত্মহত্যা প্রভৃতি ঘোরতর কুপ্রথা যে এ দেশে বহুশতাব্দী ধরে' চলে' এসেছিল, ইহা কি বিচারশক্তি বিলোপের সুস্পষ্ট প্রমাণ নয়? আজও ধর্ম্মের নামে যত দুষ্ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হচ্চে ও যত সামাজিক কুপ্রথা প্রচলিত আছে, তাতে বিচারশক্তির অভাবেরই পরিচয় দিচ্চে। শাস্ত্রান্ধতাই এই অধোগতির মূল। ধর্ম্মের ন্যায় জীবনের সর্ব্বোচ্চ বিভাগে বুদ্ধিবৃত্তিকে নিষ্কৃতি দিলে এইরূপই ঘটে।

পৌত্তলিকতার কুফলসমূহ বর্ণনা করে' রামমোহন রায় এক স্থলে বলেছিলেন (W. 74)—'এই সকল গভীর বিষয়ের চিন্তায় আমি বহু বৎসর যাবৎ যার পর নেই ক্লেশ ভোগ করূচি। আমার দেশবাসীরা যে তাঁদের সর্ব্বনাশকর পৌত্তলিকতাকে দৃঢ়ভাবে আশ্রয় করে' আছেন, এ কথা চিন্তা করে' আমার দুঃখভোগের কখনো বিরাম হয় নি। এই পৌত্তলিকতার প্ররোচনায় তাঁরা তাঁদের কল্পিত দেবদেবীকে তুষ্ট করূবার উদ্দেশ্যে সর্ব্বপ্রকার দয়া ও সামাজিক ভাবকে জলাঞ্জলি দেন। এর দৃষ্টান্তের অভাব নেই। 'ধর্ম্মানুষ্ঠান করূচি' এই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী

হয়ে তাঁরা আত্মহত্যা ও স্বজনহত্যারূপ ভয়াবহ কার্য্যে পর্য্যন্ত প্রবৃত্ত হন। আমি পুনরায় বল্‌ছি, এই সকল কার্য্যের বিষয় চিন্তা করে' আমি কখনো গভীর বেদনা অনুভব না করে' পারি নি। এমন একটি জাতি, যার মধ্যে অনেক উৎকৃষ্টতর কার্য্য কর্‌বার যোগ্যতা রয়েছে, যে জাতি তার সূক্ষ্ম বুদ্ধি, কষ্টসহিষ্ণুতা ও শান্ত স্বভাবের গুণে মহত্তর অবস্থায় উঠ্‌তে পার্‌ত, হায়, ঐ সকল কার্য্য দ্বারা তার কি নৈতিক অধোগতিই ঘটেছে!'

(প) বাল্যে প্রদত্ত অন্ধশিক্ষাই সকল কুসংস্কারকে পুরুষানুক্রমে স্থায়ী করে।

বাহির হতে অন্ধভাবে গৃহীত বিশ্বাস, আর জ্ঞানচর্চ্চার ফলে অন্তরে উপজাত বিশ্বাস, এ দুয়ে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। দেবোপাসকদিগকে বাহির হতে প্রাপ্ত বিশ্বাসের উপর নির্ভর কর্‌তে হয়; সুতরাং তাঁরা পুত্রকন্যাকে বাল্যাবধি ঐ সকল বিশ্বাস সম্বন্ধে শিক্ষা দেন এবং ঐ সকলের প্রতি সন্দেহ করাকে গুরুতর অপরাধ বলে' তাঁদের মনে সংস্কার জন্মিয়ে দেন। ফলতঃ, বাল্যে প্রদত্ত অন্ধশিক্ষাই সকল প্রকার কুসংস্কারকে পুরুষানুক্রমে স্থায়ী করে। রামমোহন রায় এইরূপ অন্ধশিক্ষা দানের কুফল সম্বন্ধে নানা প্রসঙ্গে অনেক কথা বলেছিলেন। খ্রীষ্টীয় মিশনরিদিগের সহিত ত্রিত্ববাদ-বিষয়ক বিচারকালে তিনি এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছিলেন (W. 687-90)। একবার মিশনরিগণ বিদ্রূপাত্মক ভাবে বলেছিলেন যে, ত্রিত্ববাদের যে সব গূঢ়তত্ত্ব বুঝ্‌তে তাঁদের ত্রিশ-চল্লিশ বৎসরের অক্লান্ত পরিশ্রম প্রয়োজন হয়েছে, রামমোহন রায় কিনা মাত্র তিন-চার বৎসরের আলোচনাতেই তাকে ভ্রান্ত বলে' বুঝে' ফেল্লেন! রামমোহন রায় এ কথার উত্তরে বল্লেন (W. 688)—'বাল্যশিক্ষার

প্রভাব হতে মুক্ত থাক্‌লে, ইহা সম্ভব হয়। শৈশবে ও বাল্যে যখন স্বয়ং কোনও বিষয়ে বিচার কর্‌বার শক্তি জন্মে না, তখন হতে পুত্র-কন্যাকে 'একই তিন, তিনই এক' এই অযৌক্তিক মত ও তৎসংসৃষ্ট অন্যান্য মত শিক্ষা দেওয়া হয়। তাতে যে সংস্কার বালকবালিকাদের মনে বদ্ধমূল হয়ে যায়, উপযুক্ত বয়সে সুশিক্ষা লাভ কর্‌লেও তারা তা হতে মুক্ত হতে পারে না। বাইব্‌ল্‌ শাস্ত্র এক ঈশ্বরই প্রতিপন্ন করে, অথচ বাল্যের এই কুশিক্ষার ফলে তারা উহাতে ত্রিত্ববাদ দেখ্‌তে পায়। যে সকল বচন স্পষ্টই ত্রিত্ববাদের বিরোধী, সে সকলকেও তারা তখন ত্রিত্ববাদের অনুকূলে ব্যাখ্যা করে।' এ সকল কথা বলে', রামমোহন রায় এ দেশীয় মূর্ত্তিপূজার দৃষ্টান্ত দিয়ে মিশনরিদের জিজ্ঞেস্‌ কর্‌লেন—'এই মূর্ত্তিপূজা কি এক পুরুষের অধিক টিক্‌তে পার্‌ত, অথবা এক বৎসর মাত্র শ্রমপূর্ব্বক অনুসন্ধান কর্‌লে তদুপার্জ্জিত জ্ঞানের সম্মুখে কি উহা দাঁড়াতে পার্‌ত, যদি বিচারশক্তি জন্মাবার পূর্ব্বেই বালকবালিকাদের মনে এ বিশ্বাস মুদ্রিত করে' দেওয়া না হত যে, জড়ীয় মূর্ত্তিসকলকে মন্ত্রদ্বারা প্রাণবান্‌ করা যায়?'

৫

(ক) বাল্যশিক্ষা বিষয়ে পিতামাতার দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য।

তৎপরে বাল্যশিক্ষা সম্পর্কে পিতামাতার দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য বিষয়ে রামমোহন রায় বল্‌চেন (W. 689)—'বাল্যকালে পুত্রকন্যা পিতামাতার বাক্যে স্বভাবতঃ আস্থা স্থাপন করে; তারা তাঁদের কোনো কথায় সন্দেহ কর্‌তে জানে না। আমার সামান্য বুদ্ধিতে মনে হয়, এই সুযোগ গ্রহণ করে' কোনো উদারচিত্ত ও জ্ঞানসম্পন্ন পিতামাতা সন্তানদের মনে কতক-গুলি দুর্ব্বোধ্য মতের প্রতি বিশ্বাস এবং তদ্বিরোধী সকল মতের প্রতি বিদ্বেষ মুদ্রিত করে' দিতে কখনো পারেন না; যেহেতু ঐ সকল মতের

যুক্তিযুক্ততা সম্বন্ধে বিচার করতে ঐ বয়সে তারা সম্পূর্ণ অক্ষম থাকে ; যে সকল মত ধারণা করতেই তারা অসমর্থ, সেগুলিকে অন্ধভাবে বিশ্বাস না করলে ইহলোকে ও পরলোকে অনন্ত শাস্তি পেতে হবে, এই ভয় দেখা'তে জ্ঞানবিশিষ্ট পিতামাতা নিশ্চয়ই আরও অধিক সঙ্কুচিত হবেন। সন্তানগণের প্রতি পিতামাতার যে নৈতিক দায়িত্ব আছে, তদনুসারে তাঁরা তাদিগকে এমন শিক্ষা দান করতে বাধ্য, যদ্দ্বারা তারা বড় হয়ে বুদ্ধিসম্পন্ন সামাজিক জীবরূপে ধর্ম্মবিষয়ে আপনাদের বিচারশক্তিকে প্রয়োগ করতে সক্ষম হবে, এবং শাস্ত্রসকল ও বিভিন্ন মতাবলম্বী উপদেষ্টাগণ যে-কিছু যুক্তিপ্রমাণ উপস্থিত করেন, সেগুলি বিশেষভাবে পর্য্যালোচনা করে' এবং অন্তরে অন্যের প্রতি বিদ্বেষভাব না রেখে, নিজ নিজ মত গঠন করতে সমর্থ হবে।

(ব) সত্যাসত্য নির্ণয়ে অন্ধবিশ্বাসীর মতামতের মূল্য নাই।

তার পর রামমোহন রায় বলচেন (W. 689)—যাঁরা এইরূপে স্বাধীনভাবে মত গঠন করেছেন, অপরের কাছে কেবল তাঁদেরই মতের মূল্য আছে। যারা পুরুষানুক্রমে পিতামাতার মতে অন্ধভাবে বিশ্বাস করে' এসেছে, তারা যদি শত পুরুষ যাবৎও কোনো মত স্বীকার করে' থাকে, তাতে সেই মতের সত্যাসত্য বিষয়ে কিছুই প্রমাণ হয় না। যিনি সত্যনির্ণয়ের জন্য আগ্রহান্বিত হয়ে শাস্ত্রানুশীলনে প্রবৃত্ত হয়েছেন এবং এক বৎসর মাত্র অনুসন্ধান করেছেন, তাঁর পক্ষপাতশূন্য সিদ্ধান্ত, যারা নিজে চিন্তা করে নি, অথবা বাল্যসংস্কারের প্রভাবাধীন থেকে শাস্ত্রানুশীলন করেছে, এমন অগণ্য লোকের মত অপেক্ষা নিশ্চয়ই অধিক মূল্যবান্।

কি তেজের কথা! রামমোহন পরিশেষে বল্‌চেন (W. 689-90)—বস্তুতঃ; বাল্যকালে যখন মন সকল প্রকার ছাপ গ্রহণ কর্‌বার উপযোগী অবস্থায় থাকে, তখন তাতে যে সকল কুসংস্কার প্রবিষ্ট করে' দেওয়া হয়, সত্যের বিস্তারের পথে তার মত প্রবল অন্তরায় আর কিছুই নেই। কোনো ধর্ম্মের মতসকল যত অযৌক্তিক হয়, তার সমর্থনকারীরা তত অধিক শ্রমস্বীকারপূর্ব্বক সেই সকল মতকে বালকবালিকাদের গ্রহণোন্মুখ চিত্তে রোপণ করে' দেন।

(ভ) ব্রহ্মোপাসনা অন্ধবিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না।

দেবোপাসকদের এরূপ না করে' উপায় নেই; কারণ, দেবপূজা আদ্যন্ত অন্ধবিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত (১৬০-৬১পৃঃ দ্রষ্টব্য)। ব্রহ্মোপাসকদের মতবিশ্বাস যুক্তিমূলক; এ জন্য তাঁরা সন্তানগণকে স্বাধীন চিন্তায় উৎসাহ দিতে সমর্থ। স্বাধীন চিন্তা ভিন্ন, ঈশ্বরের উপাসনা দূরে থাক্, তাঁর অস্তিত্বনির্ণয়ই হয় না। দেবতাদের অস্তিত্বে যে ভাবে বিশ্বাস করা হয়, তদ্রূপ শাস্ত্রমূলক বা জনশ্রুতিমূলক বিশ্বাসের উপর ব্রহ্মোপাসনা প্রতিষ্ঠিত হওয়া অসম্ভব। যদি কোনো ব্যক্তি তদ্রূপ বিশ্বাসে ব্রহ্মোপাসনা আরম্ভ করেন, শীঘ্রই তাঁর অন্তরে সংশয় আস্‌বে। তখন যদি তিনি জ্ঞানালোচনা দ্বারা ব্রহ্মসত্তায় নিঃসংশয় হতে না পারেন, তবে আপনিই ব্রহ্মোপাসনা পরিত্যাগ কর্‌বেন।

অন্ধবিশ্বাস ও জ্ঞানমূলক বিশ্বাসে প্রকৃতিগত প্রভেদ আছে। যত দিন অন্ধবিশ্বাস মনকে অধিকার করে' থাকে, তত দিন জ্ঞানমূলক বিশ্বাসের জন্য যথোচিত যত্ন করাই সম্ভব হয় না। অন্ধবিশ্বাসে অতৃপ্তি জন্মালে, তবে জ্ঞানমূলক বিশ্বাসের আগমন-পথ পরিষ্কার হয়। অতএব, এ বিষয়েও দেবোপাসনার প্রকৃতি ও ব্রহ্মোপাসনার প্রকৃতি পরস্পরের বিপরীত।

(ম) মন্ত্রশক্তিতে বিশ্বাস দেবপূজার পঞ্চম অঙ্গ।

দেবপূজার আর একটি উপাদান—মন্ত্রশক্তিতে বিশ্বাস। যে দেবতার যে মন্ত্র, তাঁকে সেই মন্ত্রে পূজা করা চাই। তিথিবিশেষে, লগ্নবিশেষে মন্ত্রসকল পবিত্র ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক শুদ্ধভাবে উচ্চারিত হলে, তবেই পূজা সফল হয়; নতুবা হয় না।

সংস্কৃত ভাষা 'দেবভাষা'; সুতরাং সকল দেবপূজাই ঐ ভাষায় হওয়া আবশ্যক। যদিও ঐ ভাষা অধুনা মৃত, যদিও কোটি কোটি লোকের নিকট উহা সম্পূর্ণ অবোধ্য, তথাপি ঐ ভাষায় প্রাচীন কালে রচিত নির্দ্দিষ্ট মন্ত্রসকল উচ্চারণ না কর্‌লে, পূজা, বিবাহ, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি কোনো ধর্ম্মকর্ম্মই সম্পন্ন হয় না। মাতৃভাষায় সামান্য সাময়িক প্রার্থনাদি ভক্তেরা করেন বটে, কিন্তু কোনো শাস্ত্রবিহিত ক্রিয়া সংস্কৃত ভাষায় ভিন্ন হতে পারে না। সংস্কৃত মন্ত্রে না কর্‌লে অনুষ্ঠানের উপযুক্ত গাম্ভীর্য্য রক্ষা হবে বলে' উপাসকেরা মনে করেন না। কেবল তা নয়, দেবকার্য্য ও পিতৃকার্য্য দেবগণ ও পিতৃগণকর্ত্তৃক গৃহীত হবে বলে'ও তাঁরা বিশ্বাস করেন না।

মন্ত্রের অলৌকিক শক্তি সম্বন্ধে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্য্য বলেছিলেন—যেমন লোকে মন্ত্ররূপ বাণ নিক্ষেপ করে' শত্রুর প্লীহা ছেদন করে, এবং গরুড়-বিষয়ক মন্ত্র উচ্চারণ করে' সর্পদষ্ট ব্যক্তিকে সুস্থ করে, তেমনি প্রতিমাদিতে যদি শাস্ত্রবিহিত পূজাদি ব্যাপার করা যায়, তবে বৈদিক মন্ত্রের শক্তিতে কেন ফল না পাওয়া যাবে? রামমোহন রায় এর উত্তরে বল্লেন (গ্র, ৬৯৩)—মন্ত্রবলে শত্রুর প্লীহা ছেদন করা বা সর্পদষ্ট ব্যক্তিকে সুস্থ করা, এ সব জ্ঞানী লোকেরা বিশ্বাস করেন না। যারা [illegible] করে, তারা সহজেই ভট্টাচার্য্যের যুক্তিতে আস্থা স্থাপন কর্‌বে।

তাদেরই 'চিত্তের স্থিরতার জন্য' (৯৬—৯৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য) শাস্ত্রে নানাপ্রকার কাল্পনিক উপাসনা লিখেছেন। কিন্তু যাঁদের জ্ঞান আছে, তাঁরা এই উদাহরণেতে ভট্টাচার্য্যের সত্যমিথ্যা সকলই জান্‌চেন। আর, তাঁরা এই সকল প্রপঞ্চ হতে আপনাদিগকে মুক্ত কর্‌বার জন্য, প্রতিমাপূজা পরিত্যাগ করে' পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হয়েছেন।

কবিতাকার বলেছিলেন—'মন্ত্রই নিরাকার ব্রহ্ম'। রামমোহন রায় বল্লেন (গ্র, ৬৬২)—তা হতে পারে না। কারণ, ব্রহ্ম ইন্দ্রিয়ের অগোচর; আর শব্দাত্মক মন্ত্র শ্রবণেন্দ্রিয়ের গোচর।

দেবোপাসকদের নিকট মন্ত্রের শক্তি যেমন অলৌকিক, ক্রিয়ানুষ্ঠানে অঙ্গহানি হলে, তজ্জন্য প্রত্যবায়ও অনেক। ব্রহ্মোপাসনায় মন্ত্রের অলৌকিক শক্তিও নেই, অঙ্গহানির প্রত্যবায়ও নেই। ভগবদ্‌গীতাকার আত্মা ও পরমাত্মার যোগ বিষয়ক ধর্ম্ম ব্যাখ্যা কর্‌তে গিয়ে বলেছেন—

"নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।
স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ॥"—২।৪০

অর্থ—এই ধর্ম্মের আরম্ভমাত্র কর্‌লে, তার নাশ নেই; অঙ্গবৈগুণ্য হলে প্রত্যবায় নেই। এই ধর্ম্মের স্বল্পমাত্র অনুষ্ঠানও মহা ভয় (সংসার-ভয়) হতে রক্ষা করে।

(য) ইহা গুরুতা ও পৌরোহিত্য আনয়ন করে।

মন্ত্রশক্তিতে বিশ্বাস কর্‌লে এবং আপন অন্তরের জ্ঞান ও ভাব অনুযায়ী উপাসনা না করে', শাস্ত্রের বিধান অনুসারে কর্‌তে গেলে, কাজেই গুরু ও পুরোহিতের প্রয়োজন হয়। কারণ, সকলের পক্ষে শাস্ত্রীয় বিধান ও মন্ত্রাদি জানা সম্ভব নয়; আর, সে সকল ভালো করে'

না জেনে ঐ কার্য্যে প্রবৃত্ত হলে প্রত্যবায়েরও আশঙ্কা রয়েছে। এইরূপে ধর্ম্মসাধন প্রতিনিধি দ্বারা সম্পাদিত ক্রিয়ামাত্রে পরিণত হয়। তার ফল কি হয়, সমাজে তা নিত্যই দেখা যাচ্চে—গুরু ও পুরোহিত আপন লভ্যের প্রতি অধিক মনোযোগী হন; এবং শিষ্য ও যজমান কেবল পূজার দ্রব্যাদি আহরণ করে' দিয়ে, এবং কোনো কোনো অনুষ্ঠানে গুরু বা পুরোহিতের উচ্চারিত মন্ত্র শুকপক্ষীর ন্যায় পুনরাবৃত্তি করে', নিশ্চিন্ত থাকেন; আত্মোন্নতি কারোই হয় না।

বলা বাহুল্য, ব্রহ্মোপাসনার সাধনা এ বিষয়েও সম্পূর্ণ বিপরীত।

(র) দেবপূজা ও ব্রহ্মোপাসনা সর্ব্ববিষয়ে পরস্পরের বিপরীত।

অতএব, দেবপূজা ও ব্রহ্মোপাসনার সাধনপদ্ধতি সর্ব্ববিষয়েই পরস্পরের বিপরীত। এক্ষণে আপনারা বিবেচনা করে' দেখুন, 'যিনি সাকার, তিনিই নিরাকার' অথবা 'প্রথমে সাকার, পরে নিরাকার' প্রভৃতি উক্তির মধ্যে কোনো সত্য আছে কি না। যে দুই সাধনাতে সাধ্য বিপরীত, সিদ্ধির ধারণা বিপরীত, সাধন-প্রণালী বিপরীত, সাধন-সংক্রান্ত অনুষ্ঠানাদি বিপরীত, তাদের মধ্যে এইরূপে আপোস করা কি সম্ভব? আপোস করতে যাওয়া কি কেবল দুয়ের বিপরীত প্রকৃতি ও বিপরীত ফল সম্বন্ধে ইচ্ছাপূর্ব্বক অন্ধ থাকা নয়?

১৪। ব্রহ্মোপাসনা ও দেবপূজার মধ্যে সামঞ্জস্য সম্ভব কি না?

(ক) একেশ্বরবাদ দুই প্রকার—মিশ্র ও বিশুদ্ধ।

এক্ষণে ব্রহ্মোপাসনা ও দেবপূজার মধ্যে সামঞ্জস্য সম্ভব কি না, এ বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হচ্চি। এ বিষয়ে রামমোহন রায় কি মনে করতেন এবং শাস্ত্রেরই বা অভিমত কি, আপনারা পূর্ব্বে শুনেছেন (৫৯-৬২ পৃঃ)। তথাপি আরও বিবেচ্য আছে।

পৃথিবীতে দুই প্রকার একেশ্বরবাদ প্রচলিত আছে। এক প্রকার একেশ্বরবাদ বহুদেবপূজা, মূর্ত্তিপূজা ও যাগযজ্ঞাদিকে অসার বলে' জেনেও, এ সকলকে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করা প্রয়োজন মনে করে না। ইহার মতে জীবনের বহির্দ্দেশে এ সকলকে রেখেও অন্তরে আত্মজ্ঞানের অনুশীলন দ্বারা এক ঈশ্বরের উপাসনা করা যায়। এই মতে, জনসমাজ হতে বহুদেবপূজা ও মূর্ত্তিপূজা উঠিয়ে দেবার চেষ্টা করা নিষ্প্রয়োজন। জনসাধারণ আত্মজ্ঞানের পথে যেতে অক্ষম; অতএব তারা বাহ্যপূজা নিয়েই থাক্। সমাজের চির-আচরিত বিধিব্যবস্থায় নাড়া দিয়ে কাজ নেই। সমাজ-ব্যবস্থা ও গার্হস্থ্য অনুষ্ঠানাদি যদি বহুদেববাদ ও মূর্ত্তিপূজার উপর একবার প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়ে থাকে, তবে সেগুলি ঐরূপই চলতে থাক্। 'পূর্ব্বজন্মের সুকৃতির ফলে' বা ভগবৎকৃপায় যে দু'চার জনের আত্মজ্ঞানে অনুরাগ জন্মাবে, কেবল তারাই এক ঈশ্বরের উপাসনায় প্রবৃত্ত হোক্। তারা, হয় 'সন্ন্যাস গ্রহণ করে', জনসমাজ পরিত্যাগ করুক্, না হয় বাহিরে প্রচলিত ধর্ম্মানুষ্ঠান প্রতিপালন করে' অন্তরে জ্ঞানমার্গের অনুসরণ করুক্।

অন্য প্রকার একেশ্বরবাদ বহুদেবপূজা ও মূর্ত্তিপূজাকে সাধনপথের বিঘ্ন জ্ঞানে সম্পূর্ণ বর্জ্জন করে। তার মতে, একের পূজা ও বহুর পূজা দুই বিপরীত বস্তু; নিরাকারের উপাসনা ও সাকারের উপাসনা দুই বিপরীত পন্থা। 'এক' বল্লেই বোঝায়—বহু নয়; 'নিরাকার' বল্লেই বোঝায়—সাকার নয়। এই প্রকার একেশ্বরবাদের মতে, 'এক' ও 'বহু', অথবা 'নিরাকার' ও 'সাকার', উভয় এক সঙ্গে চল্‌তে পারে না। উভয়কে এক সঙ্গে অবলম্বন করে' সাধনপথে অগ্রসর হওয়া যেন একই সময়ে উত্তরে ও দক্ষিণে পথ চলার ন্যায় ব্যর্থ প্রয়াস। প্রথমে 'বহু' ধরে' ও 'সাকার' আশ্রয় করে' সাধন আরম্ভ করলে, পরে 'একের' ও 'নিরাকারের' স্ফুরণ আপনিই হবে, এ মতেও এই দ্বিতীয় প্রকার একেশ্বরবাদ বিশ্বাসী নয়। উত্তরে যাওয়াই যদি চরম লক্ষ্য হয়, তবে প্রথমে কিছু দিন দক্ষিণে পথ চলে' সময় ও শক্তির অপচয় করে' লাভ কি? (১৪১ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। অতএব, ইহা ব্যক্তিগত জীবন হতে এবং পারিবারিক ও সামাজিক অনুষ্ঠানাদি হতে বহুদেববাদ ও মূর্ত্তিপূজাকে একেবারে বিদায় করে', এক ঈশ্বরের উপাসনাকে সর্ব্বসাধারণের জন্য বাধামুক্ত করতে চায়।

এই দুই প্রকার একেশ্বরবাদের মধ্যে প্রথম প্রকারকে মিশ্র একেশ্বরবাদ ও দ্বিতীয় প্রকারকে বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদ বলা যেতে পারে। বলা বাহুল্য, এই অর্থে ভারতীয় একেশ্বরবাদ মিশ্র, ও আরবীয় একেশ্বরবাদ বিশুদ্ধ। জনসমাজে উভয়ের ফলাফল বহুশতাব্দীর পরীক্ষায় পরিস্ফুট হয়েছে। ভারতীয় একেশ্বরবাদ যে পন্থা অবলম্বন করেছিলেন, তার ফলে তিনি আর সামাজিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেন নি; তাঁকে অরণ্যে আশ্রয় নিতে হয়েছে। যে আগাছাসমূহকে তিনি এক সময়ে দয়া করে' ক্ষেত্রে স্থান দিয়েছিলেন, তারাই বেড়ে, লতিয়ে, সমুদয় ক্ষেত্রকে আচ্ছন্ন

করে' ফেলেছে। অপর দিকে আরবীয় একেশ্বরবাদ বহু দেশে সামাজিক জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিশাল মুসলমান সম্প্রদায়ে মহামহা জ্ঞানী হতে আরম্ভ করে' নিরক্ষর কৃষক পর্য্যন্ত সকলেই এক নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনা করচে। আজ দেখা যাচ্চে, একজন বর্ণজ্ঞানহীন মুসলমানকে নিরাকার ঈশ্বরের তত্ত্ব বোঝান সহজ, কিন্তু প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সকল দর্শন-বিজ্ঞানে সুপণ্ডিত হিন্দুকে তা বোঝান দুঃসাধ্য ব্যাপার (১০২—৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। অর্থাৎ, হিন্দুগণ দক্ষিণ দিকে এত অধিক দূর চলে' গিয়েছেন যে, এক্ষণে উত্তরে ফিরে' আসা তাঁদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে।

(খ) রামমোহন বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদী ছিলেন।

এ সকল দেখে'-শুনে', রামমোহন মিশ্র একেশ্বরবাদ পরিত্যাগ করে' বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদই গ্রহণ করেছিলেন। পূর্ব্বে কবিতাকারের যে উক্তির উল্লেখ করা করা হয়েছে (৪৬ পৃঃ)—'যিনি সাকার, তিনিই নিরাকার'—তার মধ্যে মিশ্র একেশ্বরবাদের ধ্বনি ; আর রামমোহন রায় ঐ উক্তির যে উত্তর দিয়েছিলেন—'আকারের ভাব ও অভাব এক কালে একই বস্তুতে সম্ভব হইতে পারে না'—এতে বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদের ধ্বনি। অনেকে বলেন, রামমোহন তরুণ বয়সে মুসলমান শাস্ত্রাদি হতে বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদের ভাবটি পেয়েছিলেন। এ কথা সত্য হতে পারে ; সত্য হলে, এতে অগৌরবের বিষয় কিছু নেই। কিন্তু তিনি হিন্দুজাতির জন্য এটি প্রতিষ্ঠিত করলেন বেদান্ত-সূত্রের উপরে। বেদান্ত-সূত্র বলেছেন—'ন স্থানতোঽপি পরস্যোভয়লিঙ্গং সর্ব্বত্র হি'—(৩।২।১১)—পরমেশ্বরের উভয় লক্ষণ, অর্থাৎ নিরাকার ও সাকার দুই প্রকার ভাব, হওয়া সম্ভব নয়। অন্যান্য শাস্ত্রেও বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদের উপদেশ

না আছে এমন নয় (৫৯-৬২ পৃঃ দ্রষ্টব্য) ; রামমোহন রায় সে সকলেরও সাহায্য নিয়েছিলেন।

(গ) তিনি বেদান্ত-সূত্রের উপর বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন।

কিন্তু, সমগ্র হিন্দুশাস্ত্রের মধ্যে বেদান্ত-সূত্রের ন্যায় অবিমিশ্র একেশ্বর-বাদাত্মক গ্রন্থ আর আছে বলে' মনে হয় না। প্রায় সকল গ্রন্থেই রূপক-ভাবে হোক্ বা 'নিম্নাধিকারীর জন্য' হোক্, দেবতাদের উপাখ্যান, স্তোত্র বা তাঁদের পূজার অনুমোদন আছে। উপনিষৎসমূহেও দেবতাদের উদ্দেশে যজ্ঞাদির উল্লেখ অনেক আছে। একমাত্র বেদান্তসূত্রই অসাধারণ অধ্যবসায়ের সহিত দ্বিতীয়রহিত পরব্রহ্মের উপাসনার আবশ্যকতা প্রতিপন্ন করেছেন। 'দেবতারাও মনুষ্যের ন্যায় ব্রহ্মজ্ঞানের ও মুক্তির প্রার্থী' (১।৩।২৬)—এই বলে' উপাস্যের পদ হতে তাঁদিগকে একেবারে অপসৃত করেছেন। বেদান্ত-সূত্র অন্য অনেক সুস্পষ্ট বাক্যের দ্বারা বহুদেবতার পূজা নিরস্ত করেছেন; যথা—(১) ব্রহ্মের উভয় লক্ষণ হতে পারে না (৩।২।১১) ; (২) তিনি রূপবিশিষ্ট কোনো প্রকারে নহেন ; যেহেতু নিরাকার-প্রতিপাদক শ্রুতিরই প্রাধান্য (৩।২।১৪) ; (৩) সৃষ্ট বস্তুতে ব্রহ্মের আরোপ হতে পারে, কিন্তু ব্রহ্মে সৃষ্টবস্তুর আরোপ হতে পারে না (৪।১।৫) ; (৪) সকল সৃষ্ট পদার্থ বিরাট্ পুরুষের অঙ্গ ; তাদিগকে অঙ্গ মনে করুতে বাধা নেই, কিন্তু কোনো পদার্থকে স্বতন্ত্ররূপে উপাসনা করবে না (৩।৩।৬২) ; (৫) এক ব্রহ্ম বিনা, অঙ্গের উপাসনা কর্‌বে না, এই বেদের মত (৩।৩।৬৭) ; ইত্যাদি।

রামমোহন রায় পাটনায় মুসলমান শাস্ত্র পাঠের পর কাশীতে দীর্ঘকাল হিন্দুশাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন। সুতরাং এরূপ মনে করা অযৌক্তিক

নয় যে, মুসলমান শাস্ত্রে বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদের যে ভাব তিনি পেয়েছিলেন, বেদান্ত-সূত্র পাঠে তা দৃঢ় হয়েছিল। কল্‌কাতায় এসে ধর্ম্ম-সংস্কার কার্য্য রীতিমত আরম্ভ কর্‌বার সময় তিনি এই বেদান্ত-সূত্রই সর্ব্বপ্রথম বঙ্গানুবাদ সহ প্রকাশ করেছিলেন। এতে মনে হয়, হিন্দুজাতির মধ্যে বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদ প্রচার বিষয়ে এই গ্রন্থের উপরেই তাঁর বিশেষ নির্ভর ছিল।

(ঘ) মিশ্র একেশ্বরবাদের বিরুদ্ধে রামমোহনের মত।

মিশ্র একেশ্বরবাদের বিরুদ্ধে রামমোহন রায়ের সুস্পষ্ট মত পূর্ব্বে অন্য প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছি ; যথা—(১) "ব্রহ্মজিজ্ঞাসা যাঁহার হইয়াছে, তেঁহ কদাপি অবয়বের উপাসনা কোন মতে করিবেন না" (৬১ পৃঃ) ; (২) প্রতিমাদিতে পরমেশ্বরের উপাসনা ব্রাহ্মেরা করিবেন না" (৬০ পৃঃ) ইত্যাদি। তদ্ভিন্ন, 'Brahmunical Magazine' নামক পত্রিকার চতুর্থ সংখ্যায় তিনি খ্রীষ্টীয় মিশনরিদের সহিত বিচার উপলক্ষ্যে নিজের ও বন্ধুমণ্ডলীর ধর্ম্মমত ব্যক্ত কর্‌তে গিয়ে (পণ্ডিত শিবপ্রসাদ শর্ম্মার নামে) বলেছিলেন (W. 198)—পৌত্তলিকতা যে কোনো আকারে বা যে কোনো কূট তর্কজালের আবরণে অনুষ্ঠিত হোক্—তা প্রাকৃতিক পদার্থের পূজাই হোক্ বা মনুষ্যহস্তনির্ম্মিত পদার্থের পূজাই হোক্, অথবা মনঃকল্পিত বস্তুর পূজাই হোক্—আমরা সকলই পরিহার করি।

পূর্ব্বে দেখিয়েছি (১১৭—১৯ পৃঃ) যে, রামমোহন রায় মনে কর্‌তেন, পরমেশ্বরের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ কর্‌লে এবং তাঁতে অভাব, অক্ষমতা ও ত্রুটি-দুর্ব্বলতা আরোপ কর্‌লে তাঁকে অপমানিত করা হয়। সুতরাং এরূপ ভাবাপন্ন ব্যক্তি যে মিশ্র একেশ্বরবাদের সম্পূর্ণ বিরোধী হবেন, তাতে আর আশ্চর্য্য কি ?

রামমোহন রায় যে প্রতিমাপূজার নিমন্ত্রণ পর্য্যন্ত রক্ষা কর্‌তেন না, সে কথা ত সকলেই জানেন। যে প্রথা দেশের পক্ষে সর্ব্বপ্রকারে অনিষ্টকর, এবং যা শীঘ্র শীঘ্র উঠে' গেলেই মঙ্গল, তার সহকারিতা করা বা তাকে কোনো প্রকারে অনুমোদন করা তাঁর অন্যায় বলে' বোধ হত।

(৬) ব্রহ্মোপাসনা ও দেবপূজার মধ্যে সামঞ্জস্য অসম্ভব।

আজকাল এক শ্রেণীর লোক বলেন যে, রামমোহন রায় ব্রহ্মোপাসনা ও দেবপূজার মধ্যে সামঞ্জস্য করতে পারেন নি; পরবর্ত্তী কোনো মহাপুরুষ করেছেন। আমি আপনাদের সবিনয়ে জিজ্ঞেস্ করি, এ দুই বিপরীত পন্থার মধ্যে সামঞ্জস্য কি সম্ভব? ব্রহ্মোপাসনা যদি হিন্দুজাতিকে নিয়ে যেতে চায় উত্তরে, হিমালয়ের অভিমুখে, দেবপূজা নিয়ে যায় দক্ষিণে ভারত মহাসাগরের দিকে। রামমোহন রায় জীবনব্যাপী আলোচনার ফলে এই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, এ দুয়ে কখনো সামঞ্জস্য হতে পারে না। তবে, 'সামঞ্জস্যের' অর্থ যদি হয় জীবনে, পরিবারে ও সমাজে উভয়কে কোনো প্রকারে এক সঙ্গে রক্ষা করা, তবে সেরূপ 'সামঞ্জস্য' হতে পারে স্বীকার করি। কিন্তু সেরূপ 'সামঞ্জস্য' ত এ দেশে চিরদিনই রয়েছে; তার জন্য নূতন কোনো মহাপুরুষের আগমনের আবশ্যকতা কোথায়? সেই 'সামঞ্জস্যের' সুস্পষ্ট ফল—দেবপূজাকেই চিরস্থায়ী করে' রাখা এবং ব্রহ্মোপাসনাকে মৌখিক সম্মান প্রদর্শন করে' বিদায় দেওয়া—যা এদেশে চিরদিন হয়ে আস্‌চে।

১৫। সত্যধর্ম্ম কি ?

(ক) রামমোহন প্রকৃত হিন্দুধর্ম্মের রক্ষক ছিলেন।

রামমোহন রায় মূর্ত্তিপূজার কুফলসমূহ কিরূপ স্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করে' দেশবাসীর চেতনার উদ্রেক করেছিলেন, তা আপনারা দেখেছেন। কিন্তু একটি আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, খ্রীষ্টীয় মিশনরিগণ যখন হিন্দুধর্ম্মের নিন্দা কর্‌তেন, সে নিন্দা তাঁর প্রাণে সহ্য হত না। তখন তিনি প্রকৃত হিন্দুধর্ম্মের রক্ষকরূপে বীরের ন্যায় দণ্ডায়মান হতেন। সে কালে এইরূপে দাঁড়িয়ে হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ দিক্‌টি দেখান অপর কারো পক্ষে সম্ভব ছিল না। তখনকার পণ্ডিতগণ প্রচলিত মূর্ত্তিপূজা ও তৎসংস্পৃষ্ট অগণ্য কুসংস্কারকেই হিন্দুধর্ম্ম মনে কর্‌তেন ; সুতরাং তাঁরা স্বদেশীয়দের মধ্যে এ সকলের শাস্ত্রীয়তা ও যৌক্তিকতা যতই ব্যাখ্যা করুন, বিদেশীয়দের সম্মুখে ধর্‌বার মত তাঁদের প্রায় কিছুই ছিল না। রামমোহন রায় স্বয়ং প্রশস্ততর ও উচ্চতর ভূমিতে দাঁড়িয়েছিলেন বলে' তাঁর পক্ষে হিন্দুধর্ম্মের জ্ঞানসম্মত উপদেশগুলি তুলে' ধরা সম্ভব হয়েছিল ; এবং সেই সঙ্গে বিদেশীয় আক্রমণকারীদের নিজ মতামতের ত্রুটিসকলও দেখিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়েছিল। মিশনরিরা প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের ত্রুটিসকল দেখিয়ে নিন্দা কর্‌লে, তিনি বল্‌তেন—'তোমাদেরও প্রচলিত ধর্ম্মে অনেক ত্রুটি আছে।' ডাক্তার টাইট্‌লারের সহিত বিচারে রামমোহন স্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন করেছিলেন যে, প্রচলিত হিন্দুধর্ম্ম ও প্রচলিত খ্রীষ্টধর্ম্ম, উভয়ই অবতারবাদ বিষয়ে সমান ভূমির উপরে প্রতিষ্ঠিত ; সুতরাং এক সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়ের নিন্দা কর্‌বার অধিকারী নয়। অথচ, তিনি মনে কর্‌তেন, উভয় ধর্ম্মেরই উৎকৃষ্টতর রূপ আছে। তিনি হিন্দুকে ও

খ্রীষ্টানকে আপন আপন ধর্ম্মের সেই উৎকৃষ্টতর রূপ গ্রহণ করাবার জন্যই শ্রম করেছিলেন।

(খ) হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ রূপ বেদান্তসম্মত ব্রহ্মোপাসনা।

ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের সঙ্গে রামমোহন রায়ের সকল তর্কবিচারের উদ্দেশ্য ছিল উচ্চতর হিন্দুধর্ম্মের পুনঃপ্রবর্ত্তন, এ কথা পূর্ব্বে (২৩-২৫ পৃঃ) বলেছি। সেই উচ্চতর হিন্দুধর্ম্ম যে বেদান্তসম্মত ব্রহ্মোপাসনা, তাও তাঁর বিচারসকলের বিবরণ হতে আপনারা দেখেছেন। বেদান্তসম্মত ধর্ম্ম কি, তা তিনি 'Brahmunical Magazine'-এর চতুর্থ সংখ্যায় (W.198) মিশনরিগণকে লক্ষ্য করে' সংক্ষেপে বলেছিলেন। 'Brahmunical Magazine' পণ্ডিত শিবপ্রসাদ শর্ম্মার নামে প্রকাশিত হত; কিন্তু রামমোহন রায়ই তার প্রকৃত লেখক বলে' স্বীকৃত। রামমোহন তাতে 'our religious creed' (আমাদের ধর্ম্মমত) বলে ঐ বিষয়ে যে বাক্যগুলি বলেছিলেন, আমি তা এখানে ইংরাজীতেই উদ্ধৃত করছি:—

"I shall now, in a few words, for the information of the Missionary Gentlemen, lay down our religious creed. In conformity with the precepts of our ancient religion, contained in the Holy Vedanta, though disregarded by the generality of moderns, we look up to ONE BEING as the animating and regulating principle of the whole collective body of the universe, and as the origin of all individual souls which, in a manner some-

what similar, vivify and govern their particular bodies; and we reject Idolatry in every form and under whatsoever veil of sophistry it may be practised, either in adoration of an artificial, a natural, or an imaginary object. The divine homage which we offer consists solely in the practice of *Daya* or benevolence towards each other, and not in a fanciful faith or in certain motions of the feet, legs, arms, head, tongue or other bodily organs, in pulpit or before a temple."

রামমোহন রায়ের মতে বেদান্তসম্মত ধর্ম্মের সার মর্ম্ম এই :—(১) বিশ্বের প্রাণ-স্বরূপ এবং সকল জীবাত্মার উৎপত্তিকারণ-স্বরূপ এক পরম সত্তাকে মান্য করা, যিনি সমগ্র বিশ্বের ও প্রত্যেক জীবাত্মার চেতয়িতা ও নিয়ন্তা; (২) সর্ব্বপ্রকার পৌত্তলিকতা বর্জ্জন—কি প্রাকৃতিক পদার্থের পূজা, কি মনুষ্যনির্ম্মিত পদার্থের পূজা, কি মনঃকল্পিত বস্তুর পূজা, সকলই পরিত্যাগ করা—কোনো প্রকার কূট তর্কের দ্বারা এ সকলের সমর্থন না করা; (৩) কোনো কল্পিত মত স্বীকার দ্বারা নয়, অথবা মন্দিরে বা বেদীতে হস্ত, পদ, মস্তক, রসনা প্রভৃতি শারীরিক অঙ্গের বিবিধ প্রকার চালনা দ্বারাও নয়, কিন্তু পরস্পরের প্রতি দয়ার অনুশীলন দ্বারা, সেই পরম সত্তার প্রতি ভক্তি প্রদর্শন।

এই উক্তিতে উন্নত ধর্ম্মের উভয় দিক্—সত্য গ্রহণ ও অসত্য বর্জ্জন, এবং আধ্যাত্মিক উপাসনার উভয় অঙ্গ—ঈশ্বরে ভক্তি ও মানবে প্রীতি, সকলই সংক্ষেপে ব্যক্ত হয়েছে।

(গ) রামমোহনের 'বেদান্ত-ধর্ম্মে' নীতির স্থান।

কিন্তু বেদান্তের ব্রহ্মোপাসনা যাঁরা সাধন করেন, তাঁদের অনেকে ত পাপপুণ্যের ভেদ ও মানুষের নৈতিক দায়িত্ব স্বীকার করেন না। রামমোহনের 'বেদান্ত-ধর্ম্ম'ও কি সেরূপ ছিল ?

ভট্টাচার্য্য ভেবেছিলেন, রামমোহন রায় সেই প্রকার বেদান্ত-ধর্ম্মই প্রচার কর্চেন ; তাই তিনি বিদ্রূপ করে' বলেছিলেন—যখন সকলই ব্রহ্ম, তখন বিহিত-অবিহিত, কর্ত্তব্য-অকর্ত্তব্য, ভক্ষ্য-অভক্ষ্য ইত্যাদি ভেদ আবার কি ? যাতে আপনার সন্তোষ হয়, তাই কর্ত্তব্য ; আর যাতে আপনার অসন্তোষ হয়, তাই অকর্ত্তব্য।

এই অভিযোগের ইংরাজী উত্তরে রামমোহন রায় বল্লেন (W. 123) —আমি বুঝ্‌তে পার্‌চি না যে, আমার সমুদয় লেখার কোন্ অংশ হতে এই সিদ্ধান্ত করা হয়েছে। কারণ, আমি কোনো দিন এরূপ মত পোষণ করি নি। কেবল তা নয়, বেদের যে বচনের * উপর এই অসত্য মত প্রতিষ্ঠিত, আমি শ্রমস্বীকারপূর্ব্বক তার ব্যাখ্যা করেছি। ঈশোপনিষদের ভূমিকায় (W. 69) আমি বলেছি যে, 'পরমাত্মা সমুদয় বস্তুতে ও সমুদয় বস্তু পরমাত্মাতে' এই উক্তির দ্বারা বেদান্ত কেবল এই বোঝাতে চেয়েছেন যে, ব্রহ্ম কোনো পদার্থ হতে দূরে নন, এবং তাঁর ইচ্ছায় ভিন্ন কোনো পদার্থের অস্তিত্ব থাক্‌তে পারে না। আর, ঐ ভূমিকায় ইহাও দেখিয়েছি যে, বেদান্ত মতের মহামান্য উপদেষ্টারা (জনক, বশিষ্ঠ, সনক, ব্যাস, শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি) ব্রহ্মকে সর্ব্বব্যাপী জেনেও প্রত্যেক পদার্থের যথাযোগ্য

* যস্তু সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে॥ ঈশোপনিষৎ, ৬।

অর্থ—যিনি পরমাত্মাতে সমুদয় বস্তুকে এবং সমুদয় বস্তুতে পরমাত্মাকে দেখেন, তিনি সেই জন্য কাহাকেও ঘৃণা করেন না।

ব্যবহার কর্‌তেন এবং প্রত্যেক জীবকে পৃথক্ পৃথক্ রূপে যথাযোগ্য সম্মান কর্‌তেন (৭৩-৭৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। অতএব, ব্রহ্মকে সর্ব্বব্যাপী বলে' স্বীকার কর্‌লে বিহিত-অবিহিত, কর্ত্তব্য-অকর্ত্তব্য, ভক্ষ্য-অভক্ষ্য, ইত্যাদি ভেদ থাকে না, এমন নয়।

উক্ত অভিযোগের বাংলা উত্তরে রামমোহন রায় বল্লেন (গ্র, ৭১৩)— **"যে ব্যক্তি এমত নিশ্চয় রাখে যে, বিধিনিষেধের কর্ত্তা যে পরমেশ্বর, তিনি সর্ব্বত্র-ব্যাপী, সর্ব্বদ্রষ্টা, সকলের শুভাশুভ কর্ম্মানুসারে সুখদুঃখরূপ ফল দেন, সে ব্যক্তি ঐ সাক্ষাৎ বিদ্যমান পরমেশ্বরের ত্রাসপ্রযুক্ত তাঁহার কৃত নিয়মের রক্ষা নিমিত্ত যথাসাধ্য যত্ন অবশ্যই করিবেক।"**

অতএব, রামমোহন রায়ের প্রচারিত বেদান্ত-ধর্ম্ম পাপপুণ্যের ভেদ ও মানুষের নৈতিক দায়িত্ব অস্বীকার করে' নীতির মূলকে ধ্বংস করে না; বরং এ দুয়ের উপর জোর দিয়ে তাকে দৃঢ় করে।

(ঘ) ধর্ম্মের সার কি?

ধর্ম্মের সার কি, এ বিষয়ে রামমোহন বল্‌চেন (গ্র, ৫২৫)—**"মনুষ্যের যাবৎ ধর্ম্ম দুই মূলকে আশ্রয় করিয়া থাকেন। এক এই যে—সকলের নিয়ন্তা পরমেশ্বরেতে নিষ্ঠা রাখা; দ্বিতীয় এই যে—পরস্পর সৌজন্যেতে এবং সাধু ব্যবহারেতে কাল হরণ করা।"**

'পরমেশ্বরে নিষ্ঠা' কি? (রামমোহন ব্যাখ্যা কর্‌চেন)—না, তাঁকে আমাদের জীবনের ও সকল সুখসৌভাগ্যের কারণ জেনে সর্ব্বান্তঃকরণে শ্রদ্ধা করা ও প্রীতিপূর্ব্বক তাঁর চিন্তা করা এবং তাঁকে ফলাফলের দাতা ও শুভাশুভের নিয়ন্তা জেনে সর্ব্বদা তাঁর সান্নিধ্য অনুভবের চেষ্টা করা।

আর, 'পরস্পর সাধু ব্যবহারে কাল হরণ' করার নিয়ম কি ? না, অপরে আমাদের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করলে আমরা তুষ্ট হই, সকলের প্রতি সেরূপ ব্যবহার করা ; আর, অপরে যেরূপ ব্যবহার করলে আমাদের অসন্তোষ জন্মে, কারো প্রতি সেরূপ ব্যবহার না করা।

এই শেষোক্ত বিষয়ে রামমোহন রায় দক্ষ সংহিতার এই বচনটি এক স্থলে (গ্র, ৪৩১) উদ্ধৃত করেছেন :—

"যথৈবাত্মা পরস্তদ্‌বৎ দ্রষ্টব্যঃ শুভমিচ্ছতা।
সুখদুঃখানি তুল্যানি যথাত্মনি তথা পরে ॥"—৩.২০

রামমোহন-কৃত অর্থ—"কল্যাণেচ্ছু ব্যক্তি যেমন আপনাকে সেইরূপ পরকেও দেখিবেন ; সুখ ও দুঃখ যেমন আপনাতে হয় সেইরূপ পরেতেও হয়, এমত জানিবেন।"

অতএব, রামমোহনের মতে ঈশ্বরে ভক্তি ও মানবে প্রেম, এই দুইটিই ধর্ম্মের সার।

পরমেশ্বরের কৃপাপাত্র আমরা কিরূপে হতে পারি, এ বিষয়ে রাম মোহন রায় বলছেন (গ্র, ৫২৬)—"পরমেশ্বরকে এক নিয়ন্তা প্রভু জ্ঞান করা, আর তাঁহার সর্ব্বসাধারণ জনেতে স্নেহ রাখা আমারদিগ্যে পরমেশ্বরের কৃপাপাত্র করিতে পারে।" এখানেও সেই কথা—ঈশ্বরে ভক্তি ও মানবে প্রীতিই ধর্ম্মের সার।

ইহাই সত্য ধর্ম্ম। রামমোহন আশা করতেন (গ্র, ৬৫২) যে, "এই সত্য ধর্ম্মের প্রচার হইলে দেশ সত্যকালের ন্যায় হইবেক" ; অর্থাৎ, সত্যযুগে যেমন সকল লোক ঈশ্বরনিষ্ঠ ও পরস্পরের প্রতি সদ্ভাবসম্পন্ন ছিলেন, বলে' বর্ণিত আছে, এবং তার ফলে তখন যেমন

মানবসমাজে সুখশান্তি বিরাজ করত, এই ধর্ম্মের প্রচার হ'লে পুনরায় সেই অবস্থা ফিরে' আসবে।

(ঙ) বিশ্বজনীন ধর্ম্ম কাহাকে বলে?

এই সরল, স্বাভাবিক ধর্ম্মই কি বিশ্বজনীন ধর্ম্ম নয়? যে ধর্ম্ম সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বনিয়ন্তা পরমপুরুষের সহিত পরিচয়ের ফলে মানব-আত্মাতে স্বাভাবিক ভাবে উপজাত হয়, যা কোনো অবতারবিশেষের, মহাপুরুষবিশেষের বা গ্রন্থবিশেষের একান্ত অপেক্ষা রাখে না, তাই ত বিশ্বজনীন ধর্ম্ম। ধর্ম্ম অগ্রে, মহাপুরুষগণ ও শাস্ত্রসকল পরে। যেমন অগ্রে বায়ু প্রবাহিত হয় বলে' তরুলতা সঞ্চালিত হয়, তেমনি ধর্ম্মের শক্তি অগ্রে রয়েছে বলে' সাধুগণ ও শাস্ত্রসকল উৎপন্ন হন এবং আপন আপন কার্য্য করেন। রামমোহন রায় এইরূপে ধর্ম্মকে সকল সাধু ও সকল শাস্ত্রের আদিতে দেখেছিলেন; কোনো এক সাধুকে বা কোনো একখানি শাস্ত্রগ্রন্থকে ধর্ম্মের আদি মনে করতেন না; তাই তাঁর প্রচারিত ধর্ম্ম বিশ্বজনীন আকার ধারণ করেছিল। তিনি এই ধর্ম্মকে 'সত্য ধর্ম্ম', 'True system of Religion', 'Universal Religion' প্রভৃতি নাম দিয়েছিলেন। তিনি হিন্দুর নিকট হিন্দুশাস্ত্রের সাহায্যে, ও খ্রীষ্টীয়ানের নিকট খ্রীষ্টীয় শাস্ত্রের সাহায্যে, এই বিশ্বজনীন ধর্ম্মই প্রচার করেছিলেন। বাস্তবিক, তাঁর পূর্ব্বোক্ত উপদেশসকল গ্রহণ করলে, হিন্দুধর্ম্ম কালে যে আকার ধারণ করবে, খ্রীষ্টধর্ম্মও সেই আকারই ধারণ করবে। পোষাক-পরিচ্ছদ, রীতিনীতি বা আচার-অনুষ্ঠানের যে প্রভেদ থাকবে, সার ধর্ম্মের কাছে তা অবান্তর।

(চ) সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয় কি?

এক নিত্য ধর্ম্মকে সকল দেশের সাধু ও শাস্ত্রসমূহের আদিতে দেখলে আর সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বিরোধ থাকতে পারে না। কোনো বিশেষ

সাধু বা শাস্ত্রকে ধর্ম্মের আদি মনে কর্‌লেই বিরোধ উপস্থিত হয়। তখন অন্যান্য সম্প্রদায়ের সাধু ও শাস্ত্রসকলকে উপযুক্ত সম্মান দেওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে। প্রত্যেক সম্প্রদায় এইরূপে আপন সাধু ও শাস্ত্রকে ধর্ম্মের আদি বলে' দাবী কর্‌লে অনিবার্য্যরূপে পরস্পরে সংঘর্ষ উপস্থিত হয়; ধর্ম্মে ধর্ম্মে অসমন্বয় ঘটে। এই দাবীর অযৌক্তিকতা রামমোহন রায় তাঁর 'তুহ্‌ফাতুল মুওয়াহিদ্দিন' নামক পার্‌সী গ্রন্থে স্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন করেছিলেন। তাঁর মতে সকল মানুষই স্বাধীনভাবে সত্যাসত্য নির্ণয়ের অধিকারী। সকলেরই প্রকৃতিতে ভাল ও মন্দের প্রভেদ কর্‌বার শক্তি আছে। এই শক্তির পরিচালনা দ্বারাই দেশে দেশে নানা ধর্ম্মপ্রণালী উদ্ভূত হয়েছে। কিন্তু মূলে ধর্ম্ম বস্তু একই, এবং তা আবিষ্কার করাই সজ্ঞানে অজ্ঞানে সকলের লক্ষ্য।

বস্তুতঃ, মানবসমাজের অপর সকল প্রতিষ্ঠানের ন্যায় বিভিন্ন ধর্ম্ম-প্রণালীও স্বাভাবিক নিয়মে গড়ে' উঠেছে। অন্তরে পরমেশ্বরের প্রেরণা আছে বটে, কিন্তু অন্য সকল বিভাগের ন্যায় ধর্ম্মের বিভাগেও, মানুষকেই পর্য্যবেক্ষণ, কারণানুসন্ধান, চিন্তা, পরীক্ষা, ও অভিজ্ঞতার সাহায্যে উন্নতির পথে অগ্রসর হতে হচ্চে। সুতরাং এই বিভাগেও মানুষকে অসংখ্য বার ভ্রমে পতিত হতে হয়েছে; এবং অসংখ্য বার সংশোধন কর্‌তে হয়েছে। এই প্রণালীতে মানবজাতির ধর্ম্মের পথে অগ্রসর হবার আজও বিরাম হয় নি। স্পষ্টই দেখা যাচ্চে, প্রত্যেক ধর্ম্মসম্প্রদায়ে আজও অনেক ভ্রান্তি বর্ত্তমান। সে সকল ক্রমে সংশোধিত হবে। কিন্তু ঐ সকল ভ্রান্তির জন্য মানুষের বহুকালের অর্জ্জিত অভিজ্ঞতার মূল্য হ্রাস হয় নি। প্রত্যেক সম্প্রদায় তত্ত্বজ্ঞানের যে অমূল্য সম্পদরাশি এবং ভক্তির যে জীবনপ্রদ অমৃত সঞ্চয় করেছেন, তা মানবজাতির সাধারণ সম্পত্তি। ধর্ম্মকে এই উদার দৃষ্টিতে দেখাই তো সকল সম্প্রদায়ের মিলনের উপায়।

মিথ্যায় মিথ্যায় সমন্বয় হয় না; কারণ, মিথ্যা মানবীয়, তার মূলই নেই। সত্যে সত্যেই সমন্বয় হয়; কারণ সত্য ঐশ্বরিক। সকল সত্যের মূল ঈশ্বরেতে, যিনি সত্যস্বরূপ। ঈশ্বরই সকল সত্যের প্রবর্ত্তক। "মহান্ প্রভুর্বৈ পুরুষঃ সত্ত্বস্যৈষঃ প্রবর্ত্তকঃ" (শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ, ৩।১২)—এই মহান্ পুরুষ সকলের প্রভু; ইনিই সত্ত্ব অর্থাৎ ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক। সুতরাং জগতের যে সম্প্রদায়ে যে সত্য আছে, সমস্তই ঈশ্বরেতে সমন্বিত হয়ে রয়েছে। ধর্ম্মকে এই ভাবে দেখাই সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়। সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয় কেহ 'করে' না; জ্ঞানীরা তা 'দেখেন'।

(ছ) রামমোহন প্রত্যেক ঐতিহাসিক ধর্ম্মের সম্প্রসারক ছিলেন।

এইরূপে সকল সম্প্রদায়ের ধর্ম্মকে সমন্বিত দর্শন করে', তাদের অর্জ্জিত সমুদয় সত্যকে আপনার বলে' গ্রহণ করা এবং যেখানে যা মিথ্যা আছে তাকে পর বলে' বর্জ্জন করা বিশ্বজনীন ধর্ম্মের সাধকের লক্ষণ। রাম-মোহন রায় ঐরূপই করেছিলেন। তিনি উপনিষদের সত্যকে যে ভাবে গ্রহণ করেছিলেন, বাইব্‌ল্ ও কোরাণের সত্যকেও সেই ভাবেই গ্রহণ করেছিলেন। আবার, খ্রীষ্টানের ত্রিত্ববাদকে যে ভাবে অপসারিত কর্‌বার চেষ্টা করেছিলেন, হিন্দুর বহুদেববাদকেও সেই ভাবেই দূর কর্‌তে প্রয়াস পেয়েছিলেন। সত্যের গ্রহণ বা অসত্যের বর্জ্জন বিষয়ে তিনি স্বদেশীয় বিদেশীয় ভেদ কর্‌তেন না। এইরূপে তিনি ঐ দুই ধর্ম্মকে সংস্কৃত ও প্রসারিত করে' বিশ্বজনীন ধর্ম্মে পরিণত কর্‌তে চেষ্টা করেছিলেন। সুযোগ হলে ও সময় পেলে, তিনি পৃথিবীর অন্যান্য ধর্ম্ম সম্বন্ধেও নিশ্চয় ঐরূপ চেষ্টাই কর্‌তেন।

রামমোহন রায় খ্রীষ্টশিষ্যদের কাছে হিন্দুধর্ম্মের সত্যসকল তুলে' ধরেছিলেন এবং হিন্দুদের কাছে খ্রীষ্টের উপদেশসকল এনে উপস্থিত করেছিলেন। সুতরাং তিনি উন্নত হিন্দুধর্ম্মের ও উন্নত খ্রীষ্টধর্ম্মের কেবল রক্ষক ছিলেন, তা নয়; এই উভয় ধর্ম্মেরই সম্প্রসারকও ছিলেন। তাঁর উদার হৃদয়ের এই আকাঙ্ক্ষা ছিল, যেন 'জগতের প্রত্যেক সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম প্রসারিত হয়ে, চরমে সকলে এক মহামিলনে মিলিত হয়। এরূপ মহামিলন তিনি সম্ভব মনে কর্‌তেন। মূল বিষয়ে একতা, অবান্তর বিষয়ে বিচিত্রতা এবং সকল বিষয়ে উদারতা—মানবজাতির মিলন সম্পর্কে এই তাঁর লক্ষ্য ছিল। সকল প্রকার মতাবলম্বী লোকের প্রতি ভ্রাতৃভাবে ব্যবহার কর্‌তে তিনি আপন অনুবর্ত্তীদিগকে 'প্রার্থনা পত্র' নামক পুস্তিকায় (গ্র, ৪৩১-৩৩) যে সকল উপদেশ দিয়েছিলেন, তা অমূল্য। বাহুল্যভয়ে সেগুলি এখানে উল্লেখ করতে পারা গেল না।

(জ) ভারতের ভাবী ধর্ম্ম।

পূর্ব্বোক্তরূপে সম্প্রসারিত হয়ে বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্ম কালে কি আকার ধারণ কর্‌বে, সে বিষয়ে ইঙ্গিত কর্‌তেও রামমোহন রায় ত্রুটি করেন নি। কঠোপনিষদের ইংরাজী অনুবাদের ভূমিকায় (W. 45-46) তিনি এই আশা ব্যক্ত করেছেন যে, ভারতবাসী হিন্দুগণ কালে মূর্ত্তিপূজা পরিত্যাগ করে', সেই সত্যধর্ম্ম আশ্রয় কর্‌বেন, যে ধর্ম্ম তার আশ্রিত জনগণের অন্তরে ঈশ্বরের জ্ঞান ও ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি সঞ্চার করে; যে ধর্ম্ম মানবমাত্রেরই প্রতি বন্ধুভাব উৎপন্ন করে; যে ধর্ম্ম চিন্তার স্বাধীনতা ও হৃদয়ের সরলতার সঙ্গে অন্তরে দীনতা ও উদারতা আনয়ন করে; এবং যে ধর্ম্ম খাদ্যাখাদ্য ও আচার-বিচারে পাপপুণ্য না দেখে', অন্তর হতে নির্গত মন্দ চিন্তাকে পাপ বলে' গণ্য করে।

এই প্রসঙ্গে রামমোহন বল্‌চেন, বিধাতার কৃপা ও মানুষের শ্রম এই উভয়ের যোগে এই সত্যধর্ম্ম ভারতে বিস্তার হবে। মানুষের শ্রম চাই, সে কথা বল্‌তে তিনি ভোলেন নি। কারণ, সত্য মানুষের সহায়তাতেই গৃহ হতে গৃহে, দেশ হতে দেশে গমন করেন। রামমোহন সত্যধর্ম্মের বিস্তারের জন্য স্বয়ং যথাসাধ্য শ্রম করেছিলেন; এবং তিনি আশা কর্‌তেন, পরে পুরুষানুক্রমে যাঁরা এর প্রতি অনুরাগী হবেন, তাঁরা সকলেই এর বিস্তারের জন্য সাধ্যানুসারে শ্রম কর্‌বেন।

বলা বাহুল্য, হিন্দুধর্ম্ম, মুসলমানধর্ম্ম ও খ্রীষ্টধর্ম্ম উক্ত প্রকারে সম্প্রসারিত হলে, পরস্পরের মধ্যে আর কোনো বিরোধ থাক্‌বে না; ভারতে জাতীয় একতা সম্পাদিত হবে। পৃথিবীর সকল দেশের মধ্যেও মৈত্রী স্থাপিত হবার উপায় হবে।

১৬। উপসংহার।

(ক) রামমোহনের সংগ্রামনিরত বীরমূর্ত্তি।

সত্যই মিলন ঘটায়; মিথ্যা বিচ্ছেদকে স্থায়ী করে। মিথ্যা সমাজ-দেহে বিষস্বরূপ। সেই বিষ মানবসমাজের যে অঙ্গে যে আকারে থাক্, তাকে অপসারিত না কর্‌লে কল্যাণ নেই। এই কারণে, পূর্ব্বোক্ত মহামিলনের আদর্শকে সম্মুখে স্থাপন করে' এবং সর্ব্বজনের প্রতি উদার প্রীতি হৃদয়ে রেখে রামমোহন রায় আজীবন মিথ্যার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলেন। তিনি কেবল কি হিন্দুধর্ম্মের ও খ্রীষ্টধর্ম্মের সংস্কারে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন? কেবল কি সতীদাহ, জাতিভেদ, বহুবিবাহ প্রভৃতি সমাজ-ব্যাধির নিরাকরণে মন দিয়েছিলেন? অথবা, কেবল কি

ভারতেরই শাসন-রীতির উন্নতির জন্য শ্রম করেছিলেন? ইংলণ্ডে গিয়ে, সেখানকার শাসন-পদ্ধতি সংস্কারেও, একজন বিদেশীর পক্ষে যতটুকু সম্ভব ততটুকু কর্‌তে তিনি বিরত হন নি—রিফর্ম্ বিলের সপক্ষে চিন্তাশীল ও ক্ষমতাবান্ লোকদের মত-গঠনে তিনি সহায়তা করেছিলেন। ফ্রান্স দেশের অধিপতি আপন রাজ্যে বিদেশীদের প্রবেশ সম্বন্ধে কঠিন নিয়ম করে' রেখেছিলেন; সে নিয়ম পৃথিবীতে জ্ঞান ও সভ্যতা বিস্তারের বিঘ্ন, এই বলে' তাঁকে উপদেশ দিতেও বাঙ্গালী রামমোহন সাহসী হয়েছিলেন।

এই সকল কারণে রামমোহন রায়ের কথা স্মরণ হলেই মনে হয়, যেন তিনি অসত্য ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে দু'হাতে দু'খানা তরবারি অনবরত ঘুরাচ্চেন। আমাদের মনে সিদ্ধপুরুষের যে আদর্শ বর্ত্তমান আছে, রামমোহনের মূর্ত্তি সেরূপ নয়। 'সিদ্ধপুরুষ' বল্লে একটি শান্ত-গম্ভীর, নিষ্ক্রিয় ধ্যান-মূর্ত্তিই আমাদের মনে পড়ে। রামমোহনের সংগ্রামনিরত বীরমূর্ত্তি তার বিপরীত।

(খ) তাঁহার কান্ত কোমল মূর্ত্তি।

কিন্তু রামমোহনের অন্য মূর্ত্তিও আছে। তিনি দীনাত্মা সেবক ছিলেন। তিনি সকল সেবাকার্য্যে আপনার গৌরবকে পশ্চাতে রাখ্‌তেন। তার দৃষ্টান্ত দেখুন। তিনি পরব্রহ্মের উপাসনার জন্য ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন কর্‌লেন। ব্রহ্মোপাসনা কি বস্তু, বিশেষতঃ, সকলে সমবেত হয়ে কি প্রণালীতে সেই উপাসনা কর্‌তে হয়, তখন কেউ তা জান্‌ত না; তাঁর অনুগামী বন্ধুগণও এ বিষয়ে অজ্ঞ ছিলেন। এ অবস্থায় তিনি স্বয়ং বেদীতে উপবেশন করে' আপনার অন্তরের আদর্শকে আকার প্রদান কর্‌লেই ত ঠিক্ হত। কিন্তু তিনি তা কর্‌লেন না।

পণ্ডিত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয়কে এ বিষয়ে শিক্ষা দান করে' আচার্য্যের আসনে বসালেন। স্বয়ং গোপনে উপদেশ রচনা করে' তাঁর দ্বারা পাঠ করালেন। দীনভাবে পদব্রজে সমাজগৃহে উপস্থিত হয়ে, এক পার্শ্বে একটি বেতের মোড়ায় বসে' তিনি উপাসনায় যোগ দিতেন ও উপদেশ শ্রবণ কর্‌তেন। তিনি কখনো 'ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক', 'উপদেষ্টা' বা 'আচার্য্যের' সম্মান কামনা করেন নি। তিনি আপনাকে স্বদেশের নগণ্য সেবকমাত্র মনে কর্‌তেন।

প্রস্তাবিত হিন্দু কলেজের প্রধান উদ্‌যোক্তা হয়েও, তিনি যখন শুনতে পেলেন যে, তাঁর মতন 'বিধর্ম্মী'কে কমিটীতে নিতে কারো কারো আপত্তি আছে, তখন তিনি অবিলম্বে আপন নাম তুলে' নিলেন, এবং অক্ষুব্ধ-চিত্তে, পশ্চাতে থেকে, কাজটি যাতে সুসম্পন্ন হয় তার জন্য চেষ্টা কর্‌তে লাগ্‌লেন। এইরূপই তাঁর জনসেবার রীতি ছিল।

আপনার কথা বল্‌বার সময় তিনি 'এই দীন অকিঞ্চন', 'the humblest of all creatures' এরূপ ভাষায় বলতেন। নিজে অমানী হয়ে অপরকে মান দান কর্‌তেন। মানুষমাত্রকেই তিনি শ্রদ্ধা কর্‌তেন। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণকে 'দেবতা' বল্‌তেন। ছোট-বড় সকল লোককেই 'ব্রাদার' বলতেন। কোনো মহিলা সম্মুখে উপস্থিত হলে দণ্ডায়মান হতেন এবং যতক্ষণ তিনি উপবেশন না করেন ততক্ষণ আসন গ্রহণ কর্‌তেন না। বালকদিগকে বাগানের দোল্‌নায় চড়িয়ে নিজ হাতে দোল দিতেন এবং কখন কখন স্বয়ং দোল্‌নায় বসে' তাদের দোল দিতে বল্‌তেন। লিচু খাবার জন্য যে-সব বালক রৌদ্রের সময় তাঁর বাগানের গাছে চড়্‌ত, তাদের ঘরে ডেকে এনে বড় বড় লিচু খাওয়াতেন। রাজপথে কোনো মুটে নিজ বোঝা মাথায় তুলতে অক্ষম হলে, তিনি

সাহায্য কর্‌তেন। ইংলণ্ডে শ্রমজীবীদের ঘর্ম্মাক্ত মলিন হস্তে তিনি আপন স্নিগ্ধ পবিত্র হস্ত স্থাপনপূর্ব্বক প্রীতি-সম্ভাষণ কর্‌তেন। সে দেশে এক ইংরাজ বন্ধুর শিশুকে আদর কর্‌বার জন্য, ঐ পরিবারের অতি আপন জনের ন্যায় একাকী তার শয়নগৃহে চলে' যেতেন; তার জননীকে ডাক্‌তেন না, পাছে তাঁর গৃহকর্ম্মে ব্যাঘাত জন্মে।

সুতরাং, এক দিকে রামমোহনের মূর্ত্তি যেমন সংগ্রামশীল বীরের মূর্ত্তি, অপর দিকে তাঁর মূর্ত্তি দীনতা, স্নেহ, প্রীতি ও শ্রদ্ধামণ্ডিত কান্ত কোমল মূর্ত্তি।

(গ) তাঁহার স্বদেশ-বৎসল প্রেমিক মূর্ত্তি।

কেবল তা নয়; ভাব-ভক্তিতেও রামমোহনের হৃদয় সিক্ত ছিল। বন্ধুদের মধ্যে বসে' তিনি যখন বিশ্বজনীন ধর্ম্মের ব্যাখ্যা কর্‌তেন, তখন তাঁর আয়ত নয়নযুগল ভাবাশ্রুতে পূর্ণ হত। ইংলণ্ডে একেশ্বরবাদীদের ভজনালয়ে বসে' যখন শত শত সুশিক্ষিত নরনারীর সহিত একত্রে উপাসনা কর্‌তেন, তখন তাঁর উদার হৃদয় স্বদেশের কুরীতি-কুসংস্কারের চিন্তায় ব্যথিত হয়ে উঠ্‌ত; এবং তিনি এই ভেবে আকুল হতেন—'হায়! কবে আমার স্বদেশীয় নরনারী এইরূপে দলে দলে মিলিত হয়ে মহান্ পরমেশ্বরের আত্মিক উপাসনা করে' ধন্য হবে!'

এই তাঁর আর এক মূর্ত্তি—বিশ্বজনীন ধর্ম্মের মহাসাধকের ও স্বদেশ-বৎসল প্রেমিকের মূর্ত্তি।

(ঘ) দেশের লোক আজও তাঁহার প্রতি উদাসীন ও বিরূপ।

কিন্তু আজও দেশের পনের আনা লোক তাঁদের এই পরম উপকারী বন্ধুর কোনো সংবাদ রাখেন না। যে এক আনা বা আধ আনা লোকের কর্ণে রামমোহন রায়ের বার্ত্তা পৌঁছেছে, তারও শিকির শিকি আজ

পর্য্যন্ত সেই বার্ত্তাকে শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করেছেন কি না সন্দেহ। তাঁর প্রচারিত বিশ্বজনীন ধর্ম্মকে প্রাণমন দিয়ে সাধন কর্‌তে এবং তাঁর উপদিষ্ট ব্রহ্মোপাসনাকে জীবনে, পরিবারে ও সমাজে প্রতিষ্ঠিত কর্‌তে অতি অল্প লোকই ব্রতী হয়েছেন।

(৬) তাঁহার পদাঙ্কানুসরণকারীদের প্রতিও বিরূপ।

আবার যে অত্যল্পসংখ্যক লোক রামমোহন রায়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করে' এই মহাসাধনায় নিযুক্ত হয়েছেন, অপরেরা তাঁদের সম্বন্ধেও উদাসীন। কেবল তা নয়; অনেকে উক্ত পদাঙ্কানুসরণকারী ব্রাহ্মদের বিরুদ্ধে নানাপ্রকার নিন্দাগ্লানি প্রচার কর্‌চেন।

দেশের বহুলোক বল্‌চেন—"ব্রাহ্মেরা মাতৃসমাজ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে";—যেহেতু তারা সত্যের অনুসরণ কালে আত্মীয়স্বজনের বা সমাজের বারণ মানে নি; এবং তার ফলে তাঁদের দ্বারা পরিত্যক্ত হয়েছে।

বল্‌চেন—"ব্রাহ্মেরা সঙ্কীর্ণ গণ্ডী রচনা করেছে";—যেহেতু দেশের সকল লোক উক্ত মহাসাধনায় যোগদান না করাতে তাদের সংখ্যা অল্প।

বল্‌চেন—"ব্রাহ্মেরা রামমোহন রায়ের বিশ্বজনীন ধর্ম্ম পরিত্যাগ করেছে";—যেহেতু তারা ব্রহ্মোপাসনাকে রামমোহন রায়ের সময়ের ন্যায় কেবল সমাজ-মন্দিরে আবদ্ধ না রেখে, তাঁরই অভিপ্রায় অনুসারে গার্হস্থ্য অনুষ্ঠানাদিতে প্রতিষ্ঠিত কর্‌বার চেষ্টা কর্‌চে এবং তজ্জন্য তাদের একটি পৃথক্ সম্প্রদায় আপনি গড়ে' উঠ্‌চে।

বল্‌চেন—"ব্রাহ্মেরা রামমোহন রায়কে নিজেদের একচেটে করে' নিয়েছে";—যেহেতু তারা তাঁকে যথোচিত সম্মান দিচ্চে, তাঁর প্রদর্শিত পথে চল্‌তে চেষ্টা কর্‌চে এবং দেশের লোককে সে পথে আহ্বান কর্‌চে।

বল্‌চেন—"ব্রাহ্মেরা ধর্ম্মধ্বজী";—যেহেতু তারা ধর্ম্মের সর্ব্বোচ্চ আদর্শ প্রাণে ধারণ করে', ঐ আদর্শের প্রতি সকলের দৃষ্টিকে সর্ব্বদা আকর্ষণ কর্‌চে।

বল্‌চেন—"ব্রাহ্মদের ধর্ম্মসাধন-প্রণালী বিজাতীয় ভাবাপন্ন";—যেহেতু তারা সমবেত উপাসনার কল্যাণকর রীতি প্রবর্ত্তন করেছে এবং সকল দেশের সাধুসাধ্বীগণ ও শাস্ত্রসমূহকে অপক্ষপাতে শ্রদ্ধা করে।

বল্‌চেন—"ব্রাহ্মেরা দেশের প্রতি বিমুখ";—যেহেতু তারা দেশের কুরীতি-কুপ্রথাকে ঘৃণা করে এবং সর্ব্বদা সে সকলের সংশ্রব হতে যথাসাধ্য দূরে থাকে।

বল্‌চেন—"ব্রাহ্মেরা রাজনৈতিক স্বাধীনতার সংগ্রামে পশ্চাৎপদ";—যেহেতু তারা সেই সংগ্রামের সকল কর্ম্মপদ্ধতি নির্ব্বিচারে গ্রহণ করে' সাধারণের সঙ্গে চল্‌তে পারে না।

বল্‌চেন—"ব্রাহ্মেরা বিলাসী";—যেহেতু তারা ঘরে ও বাহিরে নারীদের যথোচিত সম্মান দান করে।

বল্‌চেন—"ব্রাহ্মেরা ম্লেচ্ছ";—যেহেতু তারা ভিন্ন দেশে, ভিন্ন সম্প্রদায়ে বা অনুন্নত কুলে জন্মগ্রহণের জন্য কাহাকে ঘৃণাপূর্ব্বক 'অস্পৃশ্য' করে' রাখা পাপ মনে করে।

এইরূপ শতপ্রকার তিরস্কার-বাক্য রামমোহনের অনুগামীদের উপর চার দিক্ হতে নিয়ত বর্ষিত হচ্চে। এখন আর পূর্ব্বের ন্যায় কঠোর অত্যাচার নেই বটে; কিন্তু শতাধিক বৎসরেও দেশের বহু লোকের অন্তর হতে ব্রাহ্মদের প্রতি অবজ্ঞা ও বিদ্বেষের ভাব তিরোহিত হয় নি।

(চ) ইহার কারণ পৌত্তলিকতা।

আপনারা কি চিন্তা করে' দেখেছেন, এ অবজ্ঞা ও বিদ্বেষভাবের মূল কোথায়? আমি বলি, এ সকলের মূল—পৌত্তলিকতা। দেবপূজা ও

জাতিভেদকে দেশবাসীরা পরিত্যাগ করুন, ব্রাহ্মগণ আর তাঁদের কাছে অবজ্ঞা বা বিদ্বেষের পাত্র থাক্‌বে না; পরম আত্মীয় হয়ে যাবে। আপনারা কি লক্ষ্য করে' দেখেন নি, শিক্ষিত মুসলমান মাত্রই ব্রাহ্মগণকে আপন মনে করেন এবং তাদের থেকেই হিন্দু-মুসলমানের মিলন প্রত্যাশা করেন? এও কি লক্ষ্য করেন্‌ নি যে, ইউরোপ ও আমেরিকার যে সকল চিন্তাশীল লোক ভারতবর্ষের সংবাদ রাখেন, তাঁরা সকলেই ব্রাহ্ম-সমাজ হতে ভারতের বহু কল্যাণ আশা করেন? তবে, নিজ দেশে ও নিজ আত্মীয়বর্গের মধ্যে কেন ব্রাহ্মগণ এমন অবজ্ঞাত, এমন অনাদৃত, এমন পর? যে কারণে রামমোহন রায় অবজ্ঞাত, অনাদৃত ও পর হয়েছিলেন, সেই কারণেই তাঁর শিষ্যগণও অবজ্ঞাত, অনাদৃত ও পর। সেই কারণ আর কিছু নয়—তাদের দেবপূজা বর্জ্জন ও জাতিভেদ পরিত্যাগ। অপর শতদোষ ব্রাহ্মদের থাক্‌তে পারে; কিন্তু সেগুলি সকলের সঙ্গে সাধারণ। এ দুটিই তাদের বিশেষ অপরাধ।

(ছ) পৌত্তলিকতা পরিত্যাগের জন্য শ্রোতৃবর্গকে আহ্বান।

অতএব বলি, যাঁরা রামমোহন রায়ের প্রচারিত বিশ্বজনীন ধর্ম্মকে ও তাঁর উপদিষ্ট ব্রহ্মোপাসনাকে কল্যাণকর মনে করেন, তাঁরা আসুন; নিন্দিত ব্রাহ্মদের পার্শ্বে দণ্ডায়মান হয়ে, তাদের নিন্দা-অপমানের অংশ গ্রহণ করুন। এ কথা বল্‌বেন না যে, আজকাল হিন্দুসমাজই যথেষ্ট উদার হয়েছে, আর ব্রাহ্ম হবার দরকার নেই। হিন্দুসমাজ যদি 'যথেষ্ট উদার' হত, তবে ব্রাহ্মদের প্রতি এমন অবজ্ঞা-অনাদর থাকৃত না। তা হলে সকলে অগ্রগামী ভাই বলে' তাদের আলিঙ্গন করতেন; বিধর্ম্মী বলে' দূরে রাখ্‌তেন না। কেহ ব্রাহ্ম হতে চাইলে তার আত্মীয়-কুটুম্বগণ

যে দু'হাতে বারণ করেন, তাতেই বোঝা যায়, হিন্দুসমাজ 'যথেষ্ট উদার' হয় নি। উদারতা এইমাত্র দেখা যাচ্ছে যে, কেহ আহারপান বিষয়ে চির-প্রচলিত কুনিয়মসকল কিছু পরিমাণে লঙ্ঘন কর্‌লে সমাজ আজকাল সেটুকু সহ্য করে; কন্যাদের শিক্ষাদান কর্‌লে বা অধিক বয়সে বিবাহ দিলে আপত্তি করে না [১]; বিবাহ ও পিতামাতার আদ্যশ্রাদ্ধ, এ দুটি অনুষ্ঠান প্রচলিত নিয়মে করে', অপর কোনো ধর্ম্মানুষ্ঠান না কর্‌লে কিছু বলে না [২]। কিন্তু, একবার ব্রহ্মোপাসনাকে সমুদয় পারিবারিক অনুষ্ঠানে প্রতিষ্ঠিত কর্‌বার চেষ্টা করে' দেখুন, একবার জাতিভেদকে কেবল বাহির-বাড়ী হতে নয়, ভিতর-বাড়ী হতেও বিদায় কর্‌তে উদ্‌যোগী হউন, একবার সকল বিষয়ে অন্তরের বিশ্বাস অনুযায়ী কার্য্য কর্‌তে প্রবৃত্ত হউন, দেখ্‌বেন অবস্থাটা কি দাঁড়ায়; দেখ্‌বেন হিন্দুসমাজ কতটা 'উদার' হয়েছে। আপন উন্নত আদর্শকে অন্তরে গোপন রেখে সমাজ মধ্যে অপরাধীর ন্যায় বিচরণ করা, এবং মাঝে মাঝে সুযোগ বুঝে' প্রচলিত কুরীতিসমূহের মধ্যে একটি দুটি ভঙ্গ করা, এই কি যথেষ্ট? এতে কি নিজের মনুষ্যত্বের বিকাশ হয়? না, চারদিকে উন্নত আদর্শের বিস্তার হয়? সত্যের সেবকেরা কি ভয়ে ভয়ে লুকিয়ে থাক্‌বেন, আর কুসংস্কারই সমাজে চিরদিন রাজত্ব কর্‌বে?

দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় ব্রহ্মোপাসনার পক্ষপাতী প্রত্যেক ব্যক্তির সংস্কারক হওয়া প্রয়োজন। কেবল নিজে কোনো প্রকারে ব্রহ্মোপাসনাকে মনে মনে ধরে' থাকাই যথেষ্ট নয়। পরিবার-পরিজন, পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয়-কুটুম্ব, সকলকে বোঝান প্রয়োজন যে, ব্রহ্মোপাসনাই সত্য উপাসনা; দেখান প্রয়োজন যে, ব্রহ্মোপাসনা প্রবর্ত্তিত হলে

(১) সর্ব্বত্র নয়; কেবল কোনো কোনো শ্রেণীর লোকের মধ্যে।
(২) কেবল সহরের ইংরাজী-শিক্ষিতদের মধ্যে।

সমাজ বিশৃঙ্খল হয় না, বরং সংযত, পবিত্র ও সুন্দর হয়। আপন দৃষ্টান্ত দ্বারা অপরকে সাহস দেওয়া ও দুর্ব্বলদের পথ সুগম করা প্রয়োজন।

এরূপ অনেক অনুরাগী ও নিষ্ঠাবান্ ব্রহ্মোপাসক আছেন, যাঁদের মনে উক্তরূপ সংস্কার-স্পৃহা দেখা যায় না। তাঁরা স্বয়ং প্রতিদিন নিয়মিতরূপে ব্রহ্মোপাসনা করেন, কিন্তু বাড়ীর লোকে জানে না, ব্রহ্মোপাসনা কি পদার্থ। যখন তাঁরা নির্জ্জন ঘরে বসে' উপাসনা করেন, কোনো আগন্তুক এসে খোঁজ কর্‌লে বাড়ীর লোক বলে—'সন্ধ্যা কর্‌চেন'! এমনও দেখা যায়, একজন ব্রহ্মোপাসক কন্যার বিবাহ প্রচলিত পদ্ধতিতেই দিচ্চেন, কিন্তু স্বয়ং পৌত্তলিক অনুষ্ঠান হতে মুক্ত থাক্‌বার জন্য কুশণ্ডিকা ও সম্প্রদান-কার্য্য অন্যের দ্বারা করাচ্চেন। বাড়ীর লোক ও প্রতিবেশীরা ভাব্‌চে—'উনি বিধর্ম্মী ও জাতি-চ্যুত কিনা, তাই আপন কন্যার বিয়ে আপনি দিতে পেলেন না'! জিজ্ঞাসা করি, এইরূপে কি পৌত্তলিকতা দূর হয়ে দেশে ব্রহ্মোপাসনা প্রতিষ্ঠিত হবে? প্রকাশ্যভাবে ব্রহ্মোপাসনার সপক্ষে দাঁড়ান কি প্রয়োজন নয়? যদি নিজের জন্য ব্রহ্মোপাসনা কল্যাণজনক হয়, তবে কি পরিজনের জন্য, পাড়াপড়শীর জন্য ও আত্মীয়কুটুম্বের জন্য কল্যাণজনক নয়? চক্ষুলজ্জা-বশতঃ, অথবা আপাততঃ তাদের কিঞ্চিৎ অপ্রিয় হবার আশঙ্কায় ব্রহ্মো-পাসনাকে গোপন করে' রাখ্‌লে কি তাদের কল্যাণ করা হয়? একবার দৃঢ়ভাবে দাঁড়ালে যদি সকলের যথার্থ মঙ্গল হয়, যদি ভাবী বংশধরদের পথ বাধামুক্ত হয়, তবে সেটা কি একান্ত কর্ত্তব্য নয়? সন্তানগণের জন্য পার্থিব ধনসম্পদ সঞ্চয় করে' রেখে যাওয়া যদি কর্ত্তব্য হয়, যাতে তারা পুরুষানুক্রমে সুখে থাকে, তবে ব্রহ্মোপাসনা-রূপ পরম ধন পরিবারে বদ্ধমূল করে' রেখে যাওয়া কি কর্ত্তব্য নয়? অতএব বলি, 'ব্রাহ্ম হয়ে বৃথা আত্মীয়স্বজনের মনে কষ্ট দিয়ে কি প্রয়োজন?'—এ কথা কেউ

বল্‌বেন না, বল্‌বেন না। আত্মীয়স্বজনের ও দেশের যথার্থ কল্যাণের দিকে দৃষ্টি করে' প্রকাশ্যে ব্রহ্মোপাসনার পক্ষ আশ্রয় করুন।

সর্ব্বশেষে জিজ্ঞাসা করি—যে এক দল লোক এই ব্রহ্মোপাসনার সাধন ও প্রচারের জন্য নানা প্রতিকূলতার মধ্যে শতাধিক বৎসর যাবৎ শ্রম কর্‌চে, যাদের যথেষ্ট জনবল ও ধনবল (হয়ত যথেষ্ট ধর্ম্মবলও) না থাকাতে ব্রহ্মোপাসনা আজও দেশে, বল্‌তে গেলে, কিছুই প্রচারিত হয় নি, তাদের বল বৃদ্ধি করা কি আপনাদের কর্ত্তব্য নয়? সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে সাধন ও প্রচার না কর্‌লে রামমোহন রায়ের প্রদর্শিত নব আদর্শ দেশে বিস্তার হবে কিরূপে?

ব্রাহ্ম-ব্রাহ্মিকাদিগকেও জিজ্ঞাসা করি, আপনারা যে অমূল্য ব্রহ্মোপাসনা পেয়েছেন, তার কি যথোপযুক্ত সাধন কর্‌চেন? কেবল মূর্ত্তিপূজা, জাতি-ভেদ ও অন্যান্য কুসংস্কার হতে মুক্ত থাকাই কি যথেষ্ট? আপনারা কি সত্যধর্ম্মের সাধন দ্বারা ব্রাহ্মসমাজকে সুখশান্তির আলয় করেছেন? আর, দেশে যে এ ধর্ম্ম আজও কিছুই প্রচারিত হল না, তার জন্য কি আপনারা প্রত্যেকে দায়ী নন? আপনারা কি এ বিষয়ে নিজ নিজ কর্ত্তব্য পূর্ণমাত্রায় কর্‌চেন?

সভাস্থ সকলকেই করযোড়ে বলি—যদি নিজের পরিত্রাণ চান, পারিবারিক উন্নতি ও সুখশান্তি কামনা করেন, সমাজকে পবিত্র ও সুন্দর কর্‌তে ইচ্ছা করেন, দেশকে মহৎ ও গৌরবান্বিত দেখ্‌তে অভিলাষ থাকে, তবে ভারতের পরমসুহৃদ্‌ মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের উপদেশ মত দেবপূজা ও জাতিভেদকে সম্পূর্ণ বর্জ্জন করে', ব্রহ্মোপাসনাকে সমগ্র হৃদয়মনপ্রাণের সহিত গ্রহণ করুন। ইহা ভিন্ন এ জাতির উদ্ধার নেই, উদ্ধার নেই।

(সমাপ্ত)

প্রথম পরিশিষ্ট।

ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্য।

১। ঈশ্বর এক, ও চিন্ময়। তিনি নিরবয়ব, অনন্ত, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বশক্তিমান্। তিনি সৃষ্টিকর্ত্তা, পালনকর্ত্তা, নিয়ন্তা, বিধাতা। তিনি জ্ঞানময়, মঙ্গলময়, প্রেমময়, পুণ্যময়, আনন্দময়।

২। মানবাত্মা অবিনশ্বর ও অনন্ত উন্নতির অধিকারী; সে তাহার কর্ম্মের জন্য ঈশ্বরের নিকট দায়ী।

৩। পরমেশ্বরের উপাসনা মনুষ্যের অবশ্য-কর্ত্তব্য। তাহা দ্বারাই মানবের ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল হয়। উপাসনা মনের দ্বারা করিতে হয়, বাহ্য অনুষ্ঠানের দ্বারা নয়। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, ঈশ্বরে প্রীতি ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনই তাঁহার উপাসনা।

৪। কোনো পরিমিত ব্যক্তি বা বস্তু ঈশ্বররূপে, তাঁহার অবতার-রূপে, অথবা মধ্যবর্ত্তীরূপে উপাস্য নহে।

৫। জাতি ও সম্প্রদায়-নির্ব্বিশেষে সকল শাস্ত্রের ও সকল সাধুর উপদেশ হইতেই শ্রদ্ধার সহিত সত্য গ্রহণীয়। কিন্তু কোনো ব্যক্তি কিংবা কোনো শাস্ত্রগ্রন্থ সম্পূর্ণরূপে অভ্রান্ত, বা ধর্ম্মসাধনের একমাত্র উপায় নহে।

৬। ঈশ্বরের পিতৃত্ব ও মানবের ভ্রাতৃত্বই ধর্ম্মের সার কথা।

৭। ঈশ্বর পুণ্যের পুরস্কর্ত্তা ও পাপের দণ্ডদাতা। এই পুরস্কার ও দণ্ড তাঁহার করুণা-প্রণোদিত; উভয়ই মানবাত্মার কল্যাণের জন্য।

৮। পাপের জন্য অকৃত্রিম ও ব্যাকুল অনুতাপ, এবং পাপ হইতে নিবৃত্তিই পাপের প্রায়শ্চিত্ত।

৯। জ্ঞান, প্রেম ও পবিত্রতাতে ঈশ্বরের সহিত যুক্ত হইয়া নিরন্তর তাঁহার দিকে অগ্রসর হওয়াই মুক্তির অবস্থা।

দ্বিতীয় পরিশিষ্ট।

ব্রহ্মোপাসনা-প্রণালী।

(ক) ব্রহ্মোপাসনা সম্বন্ধীয় সাধারণ নিয়ম।

ব্রহ্মোপাসনার জন্য কোনো বিশেষ স্থান বা কালের নির্দ্দেশ নাই। যে স্থানে ও যে কালে চিত্তের স্থিরতা অধিক হইবার সম্ভাবনা, নিজে বিবেচনা করিয়া সেই স্থান ও সেই কালই নির্ব্বাচন করা উচিত। কোন্ দিকে মুখ করিয়া উপাসনায় বসিতে হইবে, সে বিষয়েও কোনো নির্দ্দিষ্ট নিয়ম নাই। যে দিকে বসিলে বিঘ্ন অল্প হয়, অথবা মন প্রসন্নতা লাভ করে, সে দিকেই বসা উচিত। পরমেশ্বর সকল স্থানে, সকল কালে ও সকল দিকেই আছেন।

দিবসে কত বার উপাসনা করিতে হইবে, তাহাও অপরে নির্দ্দেশ করিয়া দিতে পারে না। পরমেশ্বরের প্রতি প্রীতিভক্তির পরিমাণ অনুসারে, উপাসকেরা একবার, দু'বার, তিনবার বা ততোধিক বার উপাসনা করিয়া থাকেন।

(খ) উপাসনার প্রকার-ভেদ।

ব্রহ্মোপাসনা তিন প্রকার—ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক। একাকী নির্জ্জনে বসিয়া উপাসনা করা যেমন আবশ্যক, পরিবারস্থ ব্যক্তিগণের সহিত প্রীতিযোগে মিলিত হইয়া উপাসনা করাও তেমনি আবশ্যক। আবার, সমবিশ্বাসী বন্ধুগণের সহিত, এবং নিকটে উপাসনা-মন্দির থাকিলে তথায় সর্ব্বসাধারণের সহিত, উপাসনা করাও প্রয়োজন।

পরিবারস্থ ব্যক্তিগণের জাতকর্ম্ম, নামকরণ, বিবাহ, শ্রাদ্ধ, জন্মদিন, মৃত্যুদিন প্রভৃতি উপলক্ষ্যে নিজ গৃহে মিলিত উপাসনার ব্যবস্থা করা এবং বন্ধুদের গৃহে ঐ সকল অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রিত হইলে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক তাহাতে যোগদান করা কর্ত্তব্য। স্থানীয় উপাসকমণ্ডলীর, এবং সুযোগ হইলে অন্য উপাসক-মণ্ডলীর, উৎসবাদিতে যোগদানও আবশ্যক। সকলই আত্মার পক্ষে পরম কল্যাণকর।

(গ) উপাসনার বিবিধ অঙ্গ।

উপাসনার চারিটি অঙ্গ—উদ্বোধন, আরাধনা, ধ্যান ও প্রার্থনা। নিম্নে একে একে এই চারি অঙ্গের পরিচয় দেওয়া যাইতেছে :

উদ্বোধন—চিত্তকে বহির্ব্বিষয়ের চিন্তা হইতে ফিরাইয়া আনিয়া ব্রহ্মোপাসনায় নিবিষ্ট করিবার চেষ্টার নাম উদ্বোধন। 'উদ্বোধন' শব্দের অর্থ—জাগ্রত করা। মন যতক্ষণ পরমেশ্বরকে ভুলিয়া বাহিরের বিষয়ে নিযুক্ত থাকে, ততক্ষণ তাঁহার সম্বন্ধে বাস্তবিক নিদ্রিতই থাকে। উপাসনার আরম্ভে সেই নিদ্রিত মনকে উপযুক্তরূপে জাগ্রত করা প্রয়োজন। ব্যক্তিগত ও পারিবারিক উপাসনায় এ কার্য্য সঙ্গীত, সঙ্কীর্ত্তন, ধর্ম্মগ্রন্থ-পাঠ বা নীরব চিন্তা দ্বারা হইতে পারে। সামাজিক উপাসনায় একটি সঙ্গীত বা সঙ্কীর্ত্তনের পর আচার্য্য এমন কিছু বলেন বা পাঠ করেন, যদ্দ্বারা নিজের ও অন্য উপাসকদের মন ঈশ্বরের প্রতি উন্মুখীন হইতে পারে।

আরাধনা—পরমেশ্বরকে জগতের ও আপন জীবনের আশ্রয় জানিয়া তাঁহার সহিত সম্বন্ধ ও তাঁহার নৈকট্য বিবিধ প্রকারে অনুভব করা, তাঁহার স্বরূপ, স্বভাব, মহিমা ও কার্য্যাবলী স্মরণ করা, এবং সেই সঙ্গে তাঁহাকে হৃদয়ের প্রীতিভক্তি ও কৃতজ্ঞতা অর্পণ করার নাম আরাধনা।

আরাধনায় আত্মার জ্ঞান, ভাব ও ইচ্ছা, এই ত্রিবিধ শক্তির অনুশীলন ও বিকাশ হয়। ইহার সাহায্যে পরমেশ্বরের সহিত পরিচয় ক্রমে ঘনিষ্ঠ ও মধুর হয়; তাঁহার ধর্ম্মনিয়মসকলের জ্ঞান ও আত্মার অমরত্বের উপলব্ধি উজ্জ্বল হয়; পাপপ্রবৃত্তিসকল দমিত হয়; হৃদয় নির্ম্মল ও চরিত্র উন্নত হইতে থাকে; অপরের প্রতি ব্যবহার নিঃস্বার্থ ও প্রীতিপূর্ণ হয়; জনসেবার আকাঙ্ক্ষা ও তজ্জন্য ত্যাগের শক্তি বাড়ে। তদ্ভিন্ন, ঈশ্বরের ইচ্ছার সঙ্গে ইচ্ছা মিলিত হওয়াতে জীবনের অনিবার্য্য দুঃখসকল আনন্দমনে বহন করিবার শক্তি জন্মে। বস্তুতঃ, আরাধনার গুণ বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না। উহাকে ব্রহ্মোপাসনার সর্ব্বপ্রধান অঙ্গ বলা যাইতে পারে।

ব্রাহ্মসমাজে "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম, আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি, শান্তং শিবমদ্বৈতং, শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্" এই মন্ত্রের সাহায্যে আরাধনা করিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এই মন্ত্রে পরমেশ্বরের নয়টি স্বরূপের উল্লেখ আছে, যথা—(১) সত্য, (২) জ্ঞান, (৩) অনন্ত, (৪) আনন্দ, (৫) অমৃত, (৬) শান্ত, (৭) শিব, অর্থাৎ মঙ্গল, (৮) অদ্বৈত, (৯) শুদ্ধ। উপাসকেরা এই নয়টি স্বরূপ একে একে চিন্তা করিয়া আপন জ্ঞান ও ভাব অনুযায়ী আরাধনা করেন। এই নয়টি ভিন্ন পরমেশ্বরের অন্য স্বরূপ নাই, এমন নয়। যেমন, তিনি প্রেমস্বরূপ, তিনি ন্যায়বান্, তিনি পরম সুন্দর; অথচ এ সকল স্বরূপের স্পষ্ট উল্লেখ পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রে নাই। এ সকল ও অন্যান্য জ্ঞাত স্বরূপও সাধ্যমত চিন্তা করা বিধেয়। অনেক উপাসক শিবস্বরূপের সঙ্গে প্রেমস্বরূপের, এবং কেহ কেহ শুদ্ধস্বরূপের সঙ্গে ন্যায় ও সুন্দর স্বরূপের আরাধনা করিয়া থাকেন। পৃথক্‌ভাবে করিতেও বাধা নাই।

ধ্যান—নীরবে ঈশ্বরের সান্নিধ্য, প্রেম ও সৌন্দর্য্যের অনুভূতিতে আত্মাকে মগ্ন করিয়া রাখার নাম ধ্যান। ভগবৎকৃপায় আরাধনা

উত্তমরূপে সম্পন্ন হইলে, তাহার ফলে উপাসকের আত্মা স্বভাবতঃ এই ধ্যানের অবস্থায় উপনীত হয়। ধ্যানকালে চিত্তবিক্ষেপ নিবারণ করিবার জন্য, 'সত্যং, সত্যং', 'এই তুমি, এই তুমি', 'তুমি সর্ব্বময়, তুমি সর্ব্বময়', এরূপ কোনো সংক্ষিপ্ত বাক্য মনে মনে বার বার আবৃত্তি করা যাইতে পারে।

প্রার্থনা—আরাধনা ও ধ্যানের পর, নিজ ধর্ম্মজীবনের অভাবসকল স্মরণ করিয়া, সেই অভাব পূরণের আকাঙ্ক্ষা পরমেশ্বরের নিকটে নিবেদন করা ও তাঁহা হইতে বল ভিক্ষা করার নাম প্রার্থনা। আমরা আপন চিন্তা, বাক্য ও আচরণকে নির্দ্দোষ করিয়া তুলিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও সকল সময় পারিয়া উঠি না। ইহাতে আমাদের মনে দুঃখ হয়। সে দুঃখ পরমেশ্বরের নিকট নিবেদন করা এবং এই সংগ্রামে তাঁহার সহায়তা ভিক্ষা করা প্রয়োজন। ধর্ম্মজীবনের উন্নতির জন্য ব্যাকুলভাবে প্রার্থনা করিলে পরমেশ্বর প্রচুর সহায়তা করেন, সকল দেশের সাধকসাধিকাগণ এই সাক্ষ্য দান করিয়াছেন।

সাংসারিক অভাব বা শারীরিক ক্লেশও পরমেশ্বরের নিকট নিবেদন করিতে বাধা নাই; বরং এরূপ নিবেদন করাতে সরলতা ও আত্মীয়তা প্রকাশ পায়। কিন্তু ঐ সকল বিষয়ে আপন ইচ্ছা পূর্ণ করিয়া দিবার জন্য পরমেশ্বরের কাছে জেদ করা অসঙ্গত। কারণ, ঐ ইচ্ছা পূর্ণ হইলে আমাদের ধর্ম্মজীবনের উন্নতি হইবে কি না, তাহা আমরা জানি না। অনিবার্য্য অভাব ও দুঃখ সহ্য করিবার শক্তি চাওয়াই অধিক সঙ্গত।

সামাজিক উপাসনায়, আরাধনা ও ধ্যানের পর এইরূপে সকলে সমস্বরে প্রার্থনা করেন:—"অসত্য হইতে আমাদিগকে সত্যেতে লইয়া যাও; অন্ধকার হইতে আমাদিগকে জ্যোতিতে লইয়া যাও; মৃত্যু হইতে আমাদিগকে অমৃতেতে লইয়া যাও; হে সত্যস্বরূপ, আমাদিগের নিকট

প্রকাশিত হও; দয়াময়, তোমার যে অপার করুণা, তাহা দ্বারা আমাদিগকে সর্ব্বদা রক্ষা কর"। এ সকল মানব-আত্মার চিরন্তন প্রার্থনা। ব্যক্তিগত বা পারিবারিক উপাসনাতেও এরূপ প্রার্থনা করা যাইতে পারে। কিন্তু তৎসঙ্গে নিজেদের বিশেষ প্রার্থনাও আবশ্যক।

(ঘ) আরাধনার দৃষ্টান্ত।

"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণের পর কিরূপে এক একটি স্বরূপ চিন্তা করা হয়, তাহার একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। বলা বাহুল্য, পরমেশ্বরের প্রত্যেক স্বরূপের অসংখ্য দিক্ ও অসংখ্য ভাব আছে; তাহার কয়েকটি মাত্র এই দৃষ্টান্তে প্রকাশ পাইবে।

(সত্যং)—সত্যস্বরূপ পরমেশ্বর! বিশ্বসংসার তোমা হতে উৎপন্ন হয়ে, তোমারই আশ্রয়ে স্থিতি কর্‌চে। তোমারই শক্তিতে ও তোমারই নিয়মে জগতের সকল ব্যাপার সম্পন্ন হচ্চে। সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ তারা এবং এই পৃথিবী ও পৃথিবীস্থ সমুদয় পদার্থ তোমারই পরিচালনার অধীন। আমি যে একটি ক্ষুদ্র জীব এ সংসারে আছি, আমি আপন ইচ্ছায় এখানে আসি নি, আপন ইচ্ছায় এখান থেকে যাব না। তুমিই এই শরীরটি নির্ম্মাণ করে' আত্মাকে এর সঙ্গে যুক্ত করেছ, এবং সর্ব্বক্ষণ উভয়ের যোগ রক্ষা কর্‌চ। তাঁতেই দেহধারী হয়ে বেঁচে আছি। তোমা হতে চেতনা-ধারা এসে আমাকে চেতনাবান্ কর্‌চে; তোমা হতে শক্তি-ধারা এসে আমার সকল কার্য্যে সহায়তা কর্‌চে। যখন আমি তোমায় ভুলে' থাকি, এমন কি, যখন তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে চলি, তখনও তুমি দূরে যাও না; তখনও প্রাণের প্রাণরূপে বর্ত্তমান থেকে জ্ঞান যোগাও, শক্তি যোগাও। তোমা হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে মুহূর্ত্তকাল জীবিত থাকা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। অনুভব করি বা না করি, আমি সকল সময় তোমাতেই আছি। হে পিতা, আমি তোমারই, আমি তোমারই!

(জ্ঞানং)—তুমি জ্ঞানস্বরূপ। যে অপার জ্ঞান হতে বিশ্বসংসার উৎপন্ন হয়েছে এবং যে অপার জ্ঞান দ্বারা সমুদয় পরিচালিত হচ্চে, তাই তুমি। তুমিই জ্ঞানরূপে সর্ব্বত্র প্রকাশিত হচ্চ। এ সংসারের প্রত্যেকটি পদার্থের সঙ্গে প্রত্যেকটি পদার্থের বিচিত্র সম্বন্ধ ও যোগাযোগ তুমিই স্থাপন করেছ; এবং তুমিই সর্ব্বক্ষণ তা রক্ষা কর্‌চ। আশ্চর্য্য কৌশলে তুমি জগৎকে ও জগতের সকল পদার্থকে পরিচালিত কর্‌চ। আমাকে তুমি জেনে-বুঝে' এ সংসারে এনেছ, এবং আমার রক্ষা ও শিক্ষার বিচিত্র উপায় করেছ। তুমি যেমন বিশ্বজগতের নিয়ন্তা ও বিধাতা, তেমনি আমার জীবনেরও নিয়ন্তা ও বিধাতা। আমার এই ক্ষুদ্র জীবন-তরণীতে তুমিই কর্ণধাররূপে সর্ব্বদা বর্ত্তমান। আমার জীবনের দ্বারা তুমি কি অভিপ্রায় পূর্ণ কর্‌বে, তা তুমিই জান। সুখ-দুঃখ, সম্পদ-বিপদের মধ্য দিয়ে তুমি এমন ভাবে আমায় গড়ে' তুল্‌চ, যাতে তোমার সেই অভিপ্রায় পূর্ণ হয়। আমি তোমার জ্ঞানময় বিধাতৃত্বের অধীনে সর্ব্বদা আছি। আমার পরিবার-পরিজন, বন্ধুবান্ধব এবং পৃথিবীর সকল লোকই এ বিধাতৃত্বের অধীনে জীবন ধারণ কর্‌চে।

(অনন্তং)—অনন্ত অপার তোমার জ্ঞান, অনন্ত অপার তোমার শক্তি, অনন্ত অপার তোমার মহিমা, অনন্ত অপার তোমার কার্য্য। আমি ক্ষুদ্র জীব; আমার জ্ঞান অল্প; শক্তি অল্প; আমার জীবন-ক্ষেত্রও অতি সঙ্কীর্ণ। তা বলে', হে অনন্ত, আমি তোমা হতে দূরে পড়ি নি। এই শরীর ও আত্মা উভয়ই সকল দিকে তোমার অনন্ত জ্ঞান, শক্তি ও প্রেম দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে রক্ষা পাচ্চে ও বিকশিত হয়ে উঠ্‌চে। আমার সসীম জ্ঞানবৃত্তি তোমার জ্ঞানের অসীমতার পরিচয় পেয়ে বিস্মিত হচ্চে; আমার কণামাত্র প্রীতিবৃত্তি তোমার প্রীতির অনন্ততা উপলব্ধি করে' মুগ্ধ হচ্চে; আমার ক্ষুদ্র, মলিন ইচ্ছাবৃত্তি তোমার পূর্ণ মঙ্গল-ইচ্ছার সঙ্গে যোগ দিয়ে

পবিত্র হচ্চে ও বল লাভ করচে। তুমি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর হয়েও আমার মত ক্ষুদ্র জীবকে তুচ্ছ কর নি; দিবসে রাত্রিতে, জাগরণে নিদ্রায়, হে অসীম, তুমি আমার কাছে কাছে আছ। মা যেমন প্রাঙ্গণে শিশুকে হাত ধরে' হাঁটান, তুমি তেমনি আমাকে ও অপর সকলকে হাত ধরে' জীবন পথে চালাচ্চ। কোনো সসীম জীব তোমার সহায়তা ভিন্ন এক মুহূর্ত্তও জীবন-পথে চল্‌তে পারে না।

(আনন্দরূপম্)—তুমি আনন্দস্বরূপ। আপনার আনন্দের অংশী কর্‌বার জন্যই জীবকুলকে জীবন দান করেছ। এক একটি ইন্দ্রিয়-দ্বার খুলে' দিয়ে তুমি এক এক প্রকার আনন্দের রাজ্য আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করেছ। এই পৃথিবী তোমার আনন্দ-ধাম। আমরা যদি তোমার মঙ্গলজনক নিয়মসকল জেনে তদনুসারে চল্‌তে পারি, তবে শরীর ও আত্মা সর্ব্বপ্রকারে সুস্থ ও সুখী হয়। আমরা অজ্ঞান, অপূর্ণ ও অভাবগ্রস্ত জীব, এজন্য তোমার আনন্দময় সংসারে থেকেও অনেক সময় দুঃখ ভোগ করি। কিন্তু তুমি অনেক দুঃখেরই প্রতিকারের উপায় রেখেছ। যখন কোনো অনিবার্য্য দুঃখ উপস্থিত হয়, তখন তোমার শরণাপন্ন হ'লে সে দুঃখেও আমরা সান্ত্বনা পাই। আমাদের সকল দুঃখেরই অবসান আছে; যখন দুঃখের অবসান হয়, তখন আমরা পুনরায় তোমাকে আনন্দময় রূপেই দর্শন করি।

(অমৃতং)—এ সংসারে প্রতিদিন তোমার অজস্র-দান সম্ভোগ করচি। কিন্তু যত কিছু পার্থিব বস্তু, সকলই তুমি কিছু দিনের জন্য দিয়েছ। তোমার অনেক দান পেয়ে, আবার হারিয়েছি; যা এখনও আছে, তাও কালে হারাব; তুমিই হরণ করবে। এ সংসারের কোনো বস্তুই মরণান্তে আত্মার সঙ্গে যাবে না। কিন্তু সকল বস্তুর দাতা, সকল ঘটনার নিয়ন্তা যে তুমি, কেবল এই তুমিই আত্মার নিত্যসঙ্গী। তুমি অমৃতস্বরূপ। সংসারে কিছু

কাল জীবন যাপন করে', যে পরিমাণে তোমার জ্ঞানে জ্ঞানী হব, তোমার প্রতি ভক্তি সঞ্চয় করব এবং তোমার কার্য্য সাধন দ্বারা আত্মাকে পবিত্র ও বলিষ্ঠ করব, সেই পরিমাণেই আমার জীবন সার্থক হবে ; সেই পরিমাণে আমি অমৃতত্ব লাভ করব, এবং তোমার সন্তান নামের যোগ্য হব। তুমিই আমার চিরদিনের আপন।

(শান্তং)—তোমাকে আপনরূপে উপলব্ধি করতে পারলে আমি সংসারের নানা বিক্ষোভের মধ্যেও স্থির থাকতে পারি। তুমি শান্তস্বরূপ। তোমার বিশ্বে কত গতি, কত পরিবর্ত্তন! কিন্তু সমুদয়ের মূলে তুমি যে মহা অভিপ্রায়রূপে বর্ত্তমান রয়েছ, তোমাতে কোনো বিক্ষোভ নেই। আমি আত্মা তোমাকে আশ্রয় করে'ই আছি ; আমারই বা বিক্ষোভের হেতু কি? আমি তোমার, তুমি আমার। তোমার আশ্রয়ই অভয়ধাম, শান্তিধাম। আমি যখন আপনাকে একাকী দেখি, তখনই ভয়ভাবনা, তখনই দুঃখশোক। তুমি তোমার ভক্তজনকে আপন আশ্রয় অনুভব করিয়েই শান্তি দান করে' থাক ; তোমার এই আশ্রয় দুঃখী পাপী সকলেরই আরামের স্থল।

(শিবম্)—তোমার মঙ্গল ইচ্ছা হতে তুমি জগৎ সৃষ্টি করেছ। যত-কিছু নিয়মে জগৎ ও জীবকুলের জীবন পরিচালিত করচ, সকলই মঙ্গল-নিয়ম। কোথাও তোমার বিন্দুমাত্র অমঙ্গল ইচ্ছা থাকলে, তার ফলে জগৎ এত দিনে ধ্বংস হয়ে যেত। হে মঙ্গলস্বরূপ, তোমার মঙ্গল অভিপ্রায়ের গুণেই তোমার সৃষ্টি যুগে যুগে শৃঙ্খলা ও সৌন্দর্য্যে পূর্ণ হয়ে উঠ্‌চে। আমিও তোমার সেই মঙ্গল ইচ্ছা হতেই উৎপন্ন হয়েছি এবং তারই দ্বারা ধৃত আছি। তুমি আমার জীবনে যত ব্যবস্থা করেছ ও করচ, সকলই আমার রক্ষা, শিক্ষা, সংশোধন ও উন্নতির জন্য। আমি যখন তোমার নিয়ম লঙ্ঘন করে' শাস্তি ভোগ করি, সে শাস্তিও আমার

কল্যাণই সাধন করে; সে শান্তি তোমার দিকে আমার দৃষ্টিকে ফিরিয়ে দেয়। হে পরম মঙ্গলময় পিতা, আমি এই জেনেছি যে, তোমার বাধ্য হয়ে চলাই এ জীবনে মঙ্গল লাভের একমাত্র পথ। তোমার যে সকল সন্তান সানন্দে তোমার পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার করেছেন, তাঁরাই মঙ্গল লাভ করেছেন; এবং তাঁরাই যথার্থভাবে তোমার স্নেহপ্রীতিও অনুভব করতে সক্ষম হয়েছেন। বাধ্য সন্তানেরা পিতামাতার স্নেহ যেমন উপলব্ধি করতে পারে, অবাধ্য সন্তানেরা কখনও তেমন পারে না। তোমার সঙ্গে তোমার ভক্ত সন্তানদের কেমন প্রেমের যোগ! কিন্তু অভক্তকেও তুমি পরিত্যাগ কর না। ভক্ত-অভক্ত, জ্ঞানী-অজ্ঞান; সাধু-পাপী, সকলকেই তুমি আপনার প্রেমের আশ্রয়ে রেখেছ। আমি অভক্ত, অজ্ঞান ও পাপী হয়েও তোমার কত স্নেহ নিত্য সম্ভোগ করচি।

(অদ্বৈতং)—তুমি তোমার একই অসীম আশ্রয়ে সর্ব্বজীবকে রেখেছ, একই পূর্ণ জ্ঞানে সকলকে প্রতিপালন করচ, একই অনন্ত প্রেমে সকলের ভাবনা ভাবচ। আমরা সকল মানব তোমাতে আছি; তুমি আমাদের সকলের মধ্যে আছ। তোমার কাছে দেশের ভেদ, জাতির ভেদ বা সম্প্রদায়ের ভেদ নেই। যে-কেহ নিরহঙ্কার হয়ে, অকপট হয়ে তোমার শরণাপন্ন হয়, তাকেই তুমি আদরে গ্রহণ কর। এক তুমি সকলের হৃদয়কে আকর্ষণ করচ, সকলের অন্তরের ভাব-ভক্তি গ্রহণ করচ, সকলকে পরিত্রাণ দিবার উপায় করচ। মানব-সমাজে পরস্পরের মধ্যে গূঢ় প্রেম-যোগ স্থাপন করে' তুমি সকলকে একসূত্রে গ্রথিত করে' রেখেছ। একের মঙ্গলে অপরের মঙ্গল, একের অমঙ্গলে অপরের অমঙ্গল। হে সর্ব্ব-মানবের পিতামাতা, আমরা সকলে যে দিন নিরহঙ্কার, নিঃস্বার্থ ও পবিত্র হব, সে দিন আর পরস্পর হতে দূরে থাকতে পারব না; কেউ কারো

পর থাক্‌ব না। আমরা সকল মানুষ তোমার; তুমি আমাদের সকলের। ইহলোকবাসী, লোকলোকান্তরবাসী সকল আত্মা পরস্পরের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষার যোগে যুক্ত আছি; এবং সকলে তোমাতে গ্রথিত রয়েছি। তুমি পিতামাতা; আমরা সকলে তোমার সন্তান। তুমি সকলকে নিয়ে এক মহাপরিবার রচনা করে' রেখেছ। আমরা সকলেই একদিন তা জান্‌ব। সে দিন মানবসমাজ সুখশান্তির স্থান হবে; পৃথিবী স্বর্গে পরিণত হবে।

(শুদ্ধম্, অপাপবিদ্ধম্)—তুমি আমাদের প্রত্যেকের হৃদয়ে পুণ্যের আদর্শ রূপে বর্ত্তমান। এক সূর্য্যেরই কিরণ যেমন সকল গৃহে গমন করে, এক তোমারই পুণ্য-জ্যোতি তেমনি সকল আত্মাতে প্রবেশ কর্‌চে। তুমি সকল মানুষেরই আত্মাকে জ্ঞানে, ধর্ম্মে, প্রীতি-পবিত্রতায় আলোকিত করুচ; প্রত্যেককে তার কর্ত্তব্য জানাচ্চ। তুমি শুভ্র, জ্যোতির্ম্ময়, পরম সুন্দর। ভক্তের হৃদয়ে তুমি উজ্জ্বল; কিন্তু পাপীকেও তুমি অস্পৃশ্য বলে' ঘৃণা কর না; পাপীর হৃদয়েও বাস কর্‌চ। আমি যখন আমার জীবনের ত্রুটি-অপরাধ সকল দেখে' লজ্জায় অধোবদন হই, দুঃখে ম্রিয়মান হই, আর ভাব্‌তে থাকি, তুমি আমায় পরিত্যাগ করেছ, তখনও বাস্তবিক তুমি আমায় পরিত্যাগ কর না। মেঘাচ্ছন্ন দিনে আকাশের মেঘগুলিকে যেমন অন্তরালে স্থিত সূর্য্যেরই আলোকে দেখা যায়, তেমনি আমার পাপ-মলিনতাসকল, হে পুণ্যসূর্য্য, আমি তোমারই আলোকে দেখ্‌তে পাই। আমার মলিন হৃদয়ে, হে পুণ্যময় পরিত্রাতা, তুমি চিরদিন বর্ত্তমান রয়েছ। আমি তোমায় সরাতে চাইলে তুমি সর না; তাড়াতে চাইলে চলে' যাও না। আমায় কত ভালবাস! আমায় কত ভাল দেখ্‌তে চাও! তোমার পবিত্রতার সৌন্দর্য্য দেখিয়ে আমার মলিন হৃদয়কে নীরবে আপনার প্রতি আকৃষ্ট কর্‌চ। এই উপায়ে তুমি আমার পরিত্রাণ সাধন করুচ। আমার জীবনে পরিণামে তোমারই জয় হবে;

এ পাপী তোমার কাছে পরাজয় স্বীকার করবে। হে পুণ্যময়, তোমারই জয় হউক; তাতেই আমার কল্যাণ, তাতেই আমার জীবনের সার্থকতা।

(আরাধনা শেষ)—তুমি প্রকাশিত হও। হৃদয়ে পরিত্রাতারূপে, জীবনে মঙ্গলবিধাতারূপে, পরিবারে প্রেমময় প্রতিপালকরূপে এবং মানবসমাজে ধর্ম্মের রক্ষক ও পাপের দমনকর্ত্তারূপে প্রকাশিত হও। হে জগৎপতি, তুমি সর্ব্বময়; সর্ব্বময়রূপে আমার নিকট প্রকাশিত থাক। (তৎপরে নীরব ধ্যান)।

(ঙ) প্রার্থনার দৃষ্টান্ত।

হে প্রেমময়, আমি যতক্ষণ তোমার কাছে থাকি, ততক্ষণ ভাল থাকি। তোমার সহবাসে আত্মা শুদ্ধ হয়, শান্ত হয়, পবিত্র হয়। এই ত আত্মার স্বাভাবিক অবস্থা; এই ত সত্য জীবন। কিন্তু আমি ত অধিকক্ষণ তোমার কাছে থাকতে পারি না। মুহূর্ত্তকাল পরেই আবার আমার অহঙ্কার উদ্দীপ্ত হয়ে উঠে, আবার স্বার্থপরতা জাগ্রত হয়, সুখাসক্তি প্রবল হয়। আমি গত জীবনে যে সব মন্দ অভ্যাস গঠন করেছি, তোমায় ছেড়ে গেলে আবার সেই অনুসারে আমি চিন্তা করি, সেই অনুসারে বাক্য বলি ও কার্য্য করি। তোমা হতে দূরে গেলেই আমি বিকারগ্রস্ত হই। তুমি এই কৃপা কর, আমি যেন ঘন ঘন তোমার কাছে আসতে পারি; এসে প্রকৃতিস্থ হতে পারি। আর, কর্ম্মক্ষেত্রে সকল সময়ে যেন তোমাকে যথাসম্ভব স্মরণে রাখতে পারি এবং তোমার ধর্ম্মনিয়মসকল পালন করে' চলতে পারি। তুমি আমার সহায় হও।

আমার পরিবার-পরিজন, বন্ধুবান্ধব, মণ্ডলীস্থ ভাইবোন, সকলকে তুমি কৃপা কর। পৃথিবীর সকল মানুষ তোমারই সন্তান; আমি যেন সেই দৃষ্টিতে সকলকে দেখি। তুমি সকলের মঙ্গল কর।

(চ) একটি প্রার্থনা-সঙ্গীত।

(বিভাস, একতালা)

(আজি) প্রণমি তোমারে চলিনু নাথ সংসার-কাজে।
(তুমি) আমার নয়নে নয়ন রেখো অন্তর-মাঝে।
হৃদয়-দেবতা রয়েছ প্রাণে, মন যেন তাহা নিয়ত জানে;
পাপের চিন্তা মরে যেন দহি দুঃসহ লাজে।
সব কলরবে সারা দিনমান শুনি অনাদি সঙ্গীত গান,
সবার সঙ্গে যেন অবিরত তোমার সঙ্গ রাজে;
নিমেষে নিমেষে, নয়নে, বচনে, সকল কর্ম্মে, সকল মননে,
সকল হৃদয়-তন্ত্রে যেন মঙ্গল বাজে। —রবীন্দ্রনাথ।

(ছ) একটি ব্রহ্মস্তোত্র।

নমস্তে সতে তে জগৎকারণায়, নমস্তে চিতে সর্ব্বলোকাশ্রয়ায়।
নমোঽদ্বৈততত্ত্বায় মুক্তিপ্রদায়, নমো ব্রহ্মণে ব্যাপিনে শাশ্বতায়॥

ত্বমেকং শরণ্যং ত্বমেকং বরেণ্যং, ত্বমেকং জগৎপালকং স্বপ্রকাশম্।
ত্বমেকং জগৎকর্ত্তৃপাতৃপ্রহর্ত্তৃ, ত্বমেকং পরং নিশ্চলং নির্ব্বিকল্পম্॥

ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং, গতিঃ প্রাণিনাং পাবনং পাবনানাম্।
মহোচ্চৈঃ পদানাং নিয়ন্তৃ ত্বমেকং, পরেষাং পরং রক্ষণং রক্ষণানাম্॥

বয়স্ত্বাং স্মরামো বয়স্ত্বাং ভজামো বয়স্ত্বাং জগৎসাক্ষিরূপং নমামঃ।
সদেকং নিধানং নিরালম্বমীশং, ভবাম্ভোধিপোতং শরণ্যং ব্রজামঃ॥

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্। সত্যমেব জয়তে।
ব্রহ্মকৃপা হি কেবলম্।